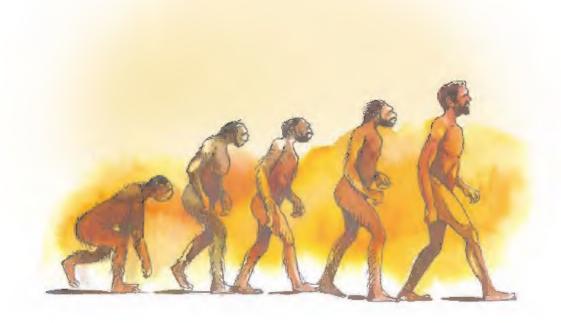
अजैज 3 अजिल

ষষ্ঠ শ্ৰেণি





পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদ

সংস্করণ

প্রথম সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৩ দ্বিতীয় সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৪ তৃতীয় সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৫ চতুর্থ সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৬

পঞ্জম সংস্করণ: ডিসেম্বর, ২০১৭

গ্রন্থসত্ত্ব

পশ্চিমবঞ্চা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রকাশক

অধ্যাপিকা নবনীতা চ্যাটার্জি সচিব, পশ্চিমবঙ্গা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬

মুদ্রক

ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সটবুক কপোরেশন (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ) কলকাতা-৭০০ ০৫৬



ভারতের সংবিধান

<u>প্রস্তাবনা</u>

আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্র রূপে গড়ে তুলতে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করছি এবং তার সকল নাগরিক যাতে : সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার; চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা; সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তি-সম্ভ্রম ও জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুনিশ্চিত করে সৌভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলতে; আমাদের গণপরিষদে, আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ করছি, বিধিবন্দ করছি এবং নিজেদের অর্পণ করছি।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens: JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity and to promote among them all — FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

ভূমিকা

'পরিবেশ ও ইতিহাস' পর্যায়ভুক্ত ষষ্ঠশ্রেণির পাঠ্যপুস্তক অতীত ও ঐতিহ্য প্রকাশিত হলো। ইতিহাস বিষয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়াবার জন্য বইটিতে ধাপে ধাপে অতীত বিষয়ক বিভিন্ন ধারণা পরিবেশন করা হয়েছে। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ — এই নথিদুটিকে নির্ভর করে এই বৈচিত্র্যময় অভিনব পরিকল্পনা করা হয়েছে। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গা সরকার কর্তৃক গঠিত একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-কে বিদ্যালয়স্তরের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলির সমীক্ষা ও পুনর্বিবেচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের ঐকান্তিক চেম্বায়, নিরলস শ্রমে পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি অনুযায়ী অতীত ও ঐতিহ্য বইটি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

এই বইটিতে নানা ধরনের প্রামাণ্য যুগোপযোগী ছবি এবং মানচিত্র প্রতিটি অধ্যায়ে সংযোজিত হলো। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী ইতিহাস বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অন্যদিকে, বইটি জুড়ে আকর্ষণীয় পশ্বতিতে নানা তালিকা ও রেখচিত্র ব্যবহার করা হয়েছে। আশা করি, নতুন পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীমহলে সমাদৃত হবে।

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বিষয় বিশেষজ্ঞ ও অলংকরণের জন্য খ্যাতনামা শিল্পীবৃন্দ—যাঁদের নিরন্তর শ্রম ও নিরলস চেষ্টার ফলে এই গুরুত্বপূর্ণ বইটির নির্মাণ সন্তব হয়েছে, তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক ও উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের সমস্ত বিষয়ের বই ছাপিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকে। এই প্রকল্প রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন নানাভাবে সহায়তা করেন এবং এঁদের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

অতীত ও ঐতিহ্য বইটির উৎকর্ষ বৃষ্ধির জন্য সকলকে মতামত ও পরামর্শ জানাতে আহ্বান করছি।

razin elserenzani

প্রশাসক পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

ডিসেম্বর, ২০১৭ ৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট কলকাতা-৭০০ ০১৬

প্রাক্কথন

পশ্চিমবংশ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই বিশেষজ্ঞ কমিটির ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয় স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, প্যঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক-এর পর্যালোচনা, পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক নির্মিত হলো। পুরো প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেই জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE Act, 2009) নথিদুটিকে আমরা অনুসরণ করেছি। পাশাপাশি সমগ্র পরিকল্পনার ভিত্তি হিসেবে আমরা গ্রহণ করেছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদর্শের রূপরেখাকে।

উচ্চ-প্রাথমিক স্তরের ইতিহাস বইয়ের নাম অতীত ও ঐতিহ্য। নতুন পাঠ্যসূচি অনুসারে বইগুলি 'পরিবেশ ও ইতিহাস' পর্যায়ভুক্ত। ষষ্ঠ শ্রেণিতে আলাদা বিষয় হিসেবে ইতিহাস-এর সঙ্গো শিক্ষার্থীদের পরিচয় হবে। এই বইতে আখ্যানমূলক বিবরণের মাধ্যমে গল্পছলে এক একটি বিশেষ সময়ের ঘটনাবলিকে শিক্ষার্থীর সামনে পরিবেশন করা হয়েছে। একদিকে নজর দেওয়া হয়েছে যাতে তথ্যভার অতিরিক্ত আকারে শিক্ষার্থীকে বিভৃত্বিত না করে, আবার অত্যধিক সরল করতে গিয়ে ইতিহাসের প্রয়োজনীয় যোগসূত্রগুলি যেন তার কাছে অস্পষ্ট না হয়ে যায়। সেই অতীতের বিশেষ স্থান-কালের সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, জীবনচর্যার যথাযথ মূর্ত অবয়ব যেন তার সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইতিহাসের মৌল ধারণা নির্মাণের ক্ষেত্রে এই পাঠ্যপুস্তকে বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়েছে। প্রাসন্ধিক বিষয়-ঘটনা পর্যালোচনার মাধ্যমে এইভাবে শিক্ষার্থী ইতিহাসকে জীবন্ত এবং অর্থবাহী একটি প্রবাহ হিসেবে বিচার করতে শিখবে। বেশ কিছু প্রামাণ্য ছবি এবং মানচিত্র সেকারণেই বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষেই সংযোজিত আছে নমুনা অনুশীলনী— 'ভেবে দেখো খুঁজে দেখো'। সেগুলির মাধ্যমে হাতে-কলমে এবং স্ব-স্থ অভিজ্ঞতার নিরিখে শিক্ষার্থীরা ইতিহাস বিষয়টি নিয়ে নানা ধরনের চর্চা করতে পারবে। বইয়ের শেষে 'শিখন পরামর্শ' অংশে শ্রেণিকক্ষে বইটি ব্যবহার প্রসঞ্চো কয়েকটি মূল্যবান প্রস্তাব মুক্রিত হলো। দক্ষ যশস্বী শিল্পীরা বইগুলিকে রঙে রেখায় আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। আশা করি, নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে নির্মিত এই পাঠ্যপুস্তকটি ইতিহাস শিখনের ক্ষেত্রে গুরুপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষার সারস্বত নিয়ামক পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদ পাঠ্যপুস্তকটিকে অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভূত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী প্রয়োজনীয় মতামত এবং পরামর্শ দিয়ে আমাদের বাধিত করেছেন। তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটির উৎকর্যবৃন্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করবো।

ডিসেম্বর, ২০১৭ নিবেদিতা ভবন পঞ্চমতল

বিধাননগর, কলকাতা : ৭০০ ০৯১

ত্রভীক কর্মুমার্ন 💆

চেয়ারম্যান 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

अफ़्स्र 📄

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি) রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্য-সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা তত্ত্বাবধান

শিরীণ মাসুদ (অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

পাণ্ডুলিপি নির্মাণ এবং পরিকল্পনা ও সম্পাদনা-সহায়তা

অনির্বাণ মণ্ডল কৌশিক সাহা প্রদীপ কুমার বসাক সত্যসৌরভ জানা সঞ্জয় বডুয়া সুগত মিত্র

গ্রন্থসজ্জা

প্রচ্ছদ : সুব্রত মাজি

অলংকরণ : প্রণবেশ মাইতি ও সুব্রত মাজি

মানচিত্র নির্মাণ : হিরাব্রত ঘোষ

মুদ্রণ সহায়তা : অনুপম দত্ত ও বিপ্লব মণ্ডল

ज्रुह्शिष

	<u> विषय</u>	পৃষ্ঠা
١.	ইতিহাসের ধারণা	2
₹.	ভারতীয় উপমহাদেশে আদিম মানুষ:	১৬
	যাযাবর জীবন থেকে স্থায়ী বসতি স্থাপন	
9 .	ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের ধারা :	২৮
	প্রথম পর্যায় : আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৭০০০-১৫০০ অব্দ	
8.	ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের ধারা :	88
	দ্বিতীয় পর্যায় : আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০-৬০০ অব্দ	
Œ.	খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের ভারতীয় উপমহাদেশ :	68
	রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং ধর্মের বির্বতন - উত্তর ভারত	
b .	সাম্রাজ্য বিস্তার ও শাসন :	95
	আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম	
	শতকের প্রথম ভাগ	
٩.	অর্থনীতি ও জীবনযাত্রা :	94
	আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম	
	শতকের প্রথম ভাগ	
ъ.	প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কৃতিচর্চার নানাদিক :	220
	শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্প	
۵.	ভারত ও সমকালীন বহির্বিশ্ব :	205
	খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত	-
0	তোমার পাতা	This .
1	শিখন পরামর্শ	1
	/	

ইতিহাসের ধারণা

হরের শুরুতে একটা নতুন বই। ইতিহাসের বই। অনেকেই হয়তো ভাবছ যে ইতিহাস খুব পড়তে হবে। মুখস্থ করতে হবে। মনে রাখতে হবে অনেক নাম, সাল-তারিখ। অথচ, যদি গল্পের মতো সহজে পড়া যায় ইতিহাস বইটা? যদি থাকে অনেক ছবি, মজার কথা, অজানা কথা। তাহলে আনন্দ করে পড়া যায় ইতিহাস বই। ইতিহাস শব্দের একটা মানে পুরোনো দিনের কথা। আর পুরোনো দিনের কথা শূনতে নিশ্চয়ই তোমরা ভালোবাসো। চলো দেখা যাক, গল্পের মতো মজা পাওয়া যায় কিনা ইতিহাস পড়ে।

ক্লাস ফাইভের আমাদের পরিবেশ বইতে রুবির দাদুর কথা সবার মনে আছে নিশ্চয়। দাদু একদিন রুবির বন্ধুদের বাড়িতে ডাকলেন। বিকালে দলবেঁধে গেল সবাই দাদুর কাছে। গল্পের মাঝখানে দাদু উঠে গিয়ে তিনটে জিনিস নিয়ে এলেন। একটা পাথরের শিলনোড়া। একটা লোহার হামানদিস্তা। আর একটা মেশিন। পলাশ জানতে চাইল, মেশিনটা কী কাজে লাগে? দাদু বললেন, এটা দিয়েও মশলাপাতি বাটা যায়। এটা বিদ্যুতে চলে। একে মিকসার মেশিন বলে। রিয়া বলল, এটা তো আগে কখনও দেখিনি। দাদু বললেন, আমাদের ছোটোবেলায়ও এই মেশিন দেখিনি। শুধু শিলনোড়া আর হামানদিস্তাও ছিল।



১.১ কবে, কেন, কীভাবে, কোথায়?

স্কুলে একদিন পাথর আর ধাতুর ব্যবহার নিয়ে কথা হচ্ছিল সালাম তখন বুবির দাদুর গল্পটা দিদিমণিকে বলল। পুনে দিদিমণি বোর্ডে শিলনোড়া, হামানদিস্তা আর মিকসাব মেশিনেব ছবি আঁকতে বললেন। পৃথা আঁকল দিদিমণি বোর্ডে গলকেন জানতে চাইলেন, বলোতো এই তিনটের মধ্যে কোনটির ব্যবহার মানুষ আগে শিখেছে গল্পয় বলল, শিলনোড়াব ব্যবহাব। কাবণ পাথবেব ব্যবহাব মানুষ আগে শিখেছে। দিদিমণি বললেন, তাবপবে কোনটা ? সালাম বলল, ধাতুব হামানদিস্তা। পাথরেব পবে মানুষ ধাতুব ব্যবহাব শিখেছে। তবে দাদু বলেছেন, আগে পাথবের হামানদিস্তাও ব্যবহাব হতো। দিদিমণি বললেন, উনি ঠিকই বলেছেন অনেক পুরোনো দিনেও মানুষ পাথবেব হামানদিস্তাও ব্যবহাব জানত। আজও কিন্তু পাথবেব হামানদিস্তা ব্যবহাব কানত। আজও কিন্তু পাথবেব হামানদিস্তা ব্যবহাব কানত। আজও কিন্তু পাথবেব হামানদিস্তা ব্যবহাব কানত। আজও কিন্তু পাথবেব হামানদিস্তা ব্যবহাব মানুষ অনেক পরে শিখেছে। দিদিমণি বললেন, এটাই ইতিহাসেব গল্পেব গোডার কথা। কোনটা আগে, কোনটা পবে। মানে সময়ের হিসাবে কবে কোনটা এসেছে সেটা প্রশ্ন কবা। মানুষ, ঘটনা বা জিনিস — সেটা কবে এল ? এর সঙ্গো তোমবা আরেকটা কাজ করলে। কেন এই তিনটে জিনিস আগে-পরে এসেছে তার কাবণটাও বললে। আগে পবে হওয়াব কাবণ, মানে কেন আগে ও পরে সেটা জানতে হবে। ইতিহাসেব গল্পেব পরেব ধাপ এটাই। অবুণ বলল, তাবপরের ধাপ কী ? দিদিমণি বললেন, এবাবে প্রশ্ন কবতে হবে, ক্ষীভাবে ? মানে, কীভাবে মানুষ পাথবেব শিলনোড়াব ব্যবহাব শিখল ? আবাব কীভাবে ধাতুব হামানদিস্তা বানাতে পারলু? সেইসঙ্গো জানতে হবে এসব কাজ কোথায় হলো। কাবণ, এক জাযগায় কিছু মানুষ একটা





অনেক অনেক দিন আগের কথা

শ্যামল একটা গল্পের বইতে পড়েছিল, *অনেক অনেক দিন আগে ওখানে জঙ্গল* ছিল না। সুন্দর একটা বাড়ি ছিল। শ্যামলেব মনে হযেছিল, অনেক অনেক দিন আগের কথা জানা যায় কীভাবে? ইতিহাস ক্লাসে ও দিদিমণিকে সেটাই জানতে চাইল। দিদিমণি বললেন, অনেক অনেক দিন আগেব কথা সবটা জানা যায় না। পুরোনো দিনের লেখা পড়ে, ছবি দেখে জানা যায় কিছু কথা। বয়স্ক মানুষদেব কথা শুনে কিছুটা জানা যায় তবে যদি খুব পুবোনো দিন হয়? যে সময়ের ছবি নেই, লেখা নেই? যে সময়ের কোনো মানুষ আজ বেঁচেও নেই ? সেইসৰ দিনেৰ অনেক কথাই ইতিহাসেৰ বই পডে জানা যায়। আবাব গল্পেও অনেক পুরোনো দিনের কথা লেখা থাকে। তবে মনে রেখো, গল্পের বইতে লেখা পুবোনো দিনের সব কথাই ইতিহাস নয় ধবো, রূপকথাব গল্পে তোমরা ডানাওলা পক্ষীবাজ ঘোড়ার কথা পড়ো তেমন ঘোড়া কিন্তু অনেক দিন আগে ছিল না। সেটা মানুষেব মনেব কল্পনা। ইতিহাসেব কথা তেমন মনগড়া নয়। তাই পুবোনো দিনের যেসব কথা গল্পে থাকে, তা সবসময় ইতিহাস নয়। ধবো, আদিম মানুষ ডানাওলা ঘোডায় চডে উড়ে বেড়াত। এমন কথা কোনো ইতিহাস বইতে লেখা থাকবে না তাই ইতিহাসেব কথা গল্পেব মতো হলেও, সত্যি।

১.২ ইতিহাসের কথা, মানুষের কথা

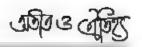
আবার একদিন বিকালে সবাই মিলে গেল বুবিব দাদুর কাছে। দাদুকে বলল দিদিমণি গল্প আর ইতিহাস নিযে কী বলেছেন। দাদু বললেন, তাইতো গল্পের বইতে শুধু বলা থাকে *অনেক অনেক দিন আগেব কথা*। কবেকাব কথা সেটা ঠিকমতো বলা থাকে না। কিন্তু ইতিহাস বইতে কোনো না কোনো সময়ের হিসাব থাকে।

অরুণ বলল, আচ্ছা, দাদু ইতিহাসে খালি মানুষের কথাই বলা থাকে কেন গ দাদু বললেন, মানুষ ছাড়া আর কেউ যে পুরোনো দিনের কথা জানতে চায় না বাঘ সিংহ, গোরু ছাগলদেব তো বাবার নাম, মায়ের নাম, ঠাকুরদার নাম এইসব জানতেও চায় না কেউ। মানুষেব সেসব জানাব দরকাব হয় তাই মানুষকে পুরোনো দিনেব কথা জানতে হয়। পুরোনো দিনের কথাই ইতিহাসের কথা। তাই ইতিহাসে বেশিবভাগ মানুষেব কথাই থাকে তবে তার সঙ্গো থাকে

টুকান্ত্রো কথা

নদীমাতৃক সভ্যতা সেই করে থেকেই মানুষ নদীব ধাবে থাকতে শুব করেছিল। নদীকে ঘিরেই <u>রোজকার</u> -ভাদের বেশিবভাগ কাজ চলত পুরোনো দিনের অনেক পভাতা (সভাতা কাকে বলে তা জানবে ৩তীয অধ্যাযে) নদীর উপব নির্ভর করেই তৈরি হয়েছিল। সেইসব সভ্যতার কাছেনদী ছিল মায়েব মতো। তাই সেগুলিকে নদীমাতৃক সভ্যতা বলা হয় মাতৃক মানে মায়ের মতো সেখানকাব লোকজনেব কাজকর্মে নদীব গুবুত্ব ছিল সবথেকে বেশি

পবিবেশের কথা। মানুষ কীভাবে এই পরিবেশের সঞ্চো মানিয়ে চলল সেসব কথা। সেই সঙ্গে থাকে মানুষের নানা কাজকর্মের খোঁজখবব। কীভাবে মানুষ আগুন জ্বালাতে শিখল। কীভাবে পোশাক পবতে শিখল। কীভাবে ছবি আঁকতে, পডতে লিখতে শিখল। একজোট হয়ে থাকতে শিখল কীভাবে কীভাবে বান্না করতে শিখল, বাড়ি বানাল, প্রাম-শহর তৈরি করল। নদীতে বাঁধ দিল। চাষ-আবাদ কবল। গান গাইল, বাজনা বাজাল। বকেট তৈরি করল সেই কবেকার আদিম মানুষ ইশকুলে যেত না। আজ তোমবা কত শক্ত অঙ্ক করো। কম্পিউটারে কাজ কবো। এই এত সব কবে? কেন? কীভাবে? কোথায হলো?— সেসব কথাই ইতিহাসের কথা



১.৩ ইতিহাস আর ভূগোল

প্রদিন ক্লাসে দিদিমণি বললেন, ইতিহাস বুঝতে হলে ভূগোল জানতে হয়। একথায় সবাই তো অবাক। ওদেব ভূগোল বই আব ইতিহাস বই আলাদা। আলাদা ক্লাস হয় তাহলে দিদিমণি এমনটা কেন বললেন? পুথা সেটাই জানতে চাইল। দিদিমণি বললেন, আসলে মানুষেব কাজকর্মই তো ইতিহাসেব বিষয়। আব মানুষেব অনেক কাজই তার পবিবেশ ও ভূগোল দিয়ে ঠিক হয়। ধবো, নদীব পাশে যাবা থাকেন তাঁবা একভাবে বাঁচেন। তাঁদেব রোজকাব কাজকর্মে নদীর অনেক গুরুত্ব। আবাব অনেকে মবুভূমি অঞ্চলে থাকেন। তাঁদেব জীবনযাপনেব ক্ষেত্রে নদীব গুবুত্ব কম। দেখবে মবুভূমিব লোকেরা অনেকেই উটে চড়ে যাতায়াত কবেন। আর নদীব কাছে যাঁবা থাকেন তাঁবা অনেকেই নৌকায় যাতায়াত কবেন। এবাবে দেখো, আমরা অনেকে নদী পেরোতে নৌকায় চড়ি। আবাব বাজস্থানে উট আছে। সেখানে লোকে মবুভূমি পেবোতে উটে চডেন। এটা অনেকদিন থেকেই হয়ে আসছে। তাহলে পশ্চিমবঙ্গোৰ যানবাহনেৰ ইতিহাসে জানা যাবে নৌকাৰ কথা। অন্যদিকে বাজস্থানের যানবাহনেব ইতিহাসে থাকবে উটেব কথা। এখন একেকটা জায়গায় যানবাহনেব ইতিহাস আলাদা হলো কেন? কাবণ, পবিবেশ ও ভূগোল আলাদা। আর তাই এক এক পবিবেশে, অঞ্চলে ইতিহাস এক এক রকম। খাবাব, পোশাক, যানবাহন, ব্যবসাবাণিজ্য, কাজকর্মের নানান তফাত। খুব ছোটো জায়গা থেকে খুব বড়ো জায়গা সবখানেই এটা ঘটবে। ধবো, সমতল অঞ্চলেব লোকেবা ভাত বেশি খান কেন? রাহুল বলল, সমতলে ধান চাষ বেশি হয়, তাই। দিদিমণি বললেন, ঠিক পলাশ বলল, কিন্ত আমাব কাকা রাজস্থানে থাকে ওখানে ধান চাষ বেশি হয় না। কাকাব বাডিতে বুর্টিই বেশি খাওয়া হয়। দিদিমণি বললেন, এভাবেই মানুষেব বেশিরভাগ কাজকর্ম তাব পরিবেশ আব ভূগোলমাফিক চলে। তাই ইতিহাস বুঝতে গেলে সবসময় ভূগোলটাও জানা দক্কাব।মনে আছে ইতিহাসেব গল্পেব দুটো কথা ছিল কেন এবং কোথায় ? সেঁই কেন এবং কোথায় জানাব জন্যই পবিবেশ আর ভূগোল জানা দরকার।





ভারতীয় উপমহাদেশের ভূগোল-ইতিহাস

দিদিমণি বললেন, তোমরা সবাই এখনকাব ভাবতের মানচিত্র দেখেছো। তবে এই মানচিত্রটা সবসময়ে এমন ছিল না। অনেক অনেক দিন আগে ভাবতের মানচিত্র অন্যবকম ছিল। বিরাট সেই অঞ্চলকে একসঙ্গে বলা হতো ভাবতীয় উপমহাদেশ। উপমহাদেশ মানে প্রায় একটা মহাদেশের মতোই বড়ো অঞ্চল। সেখানে নানাবকম পরিবেশ ও মানুষ পাহাড়, নদী, সমুদ্র, মরুভূমি সবমিলিয়ে উপমহাদেশের পবিবেশ। মানুষের খাবার, পোশাক, ঘববাডিও নানা রকম। এই হবেকবকম মিলেমিশে বিরাট এলাকা নিয়ে ছিল ভাবতীয় উপমহাদেশ। তাব উত্তরদিকে ছিল পাহাড়ি অঞ্চল। সিন্মু ও গঙ্গা নদীর দু-পাশের বিরাট সমভূমি অঞ্চল বিন্যু পর্বতের দক্ষিণদিকের তিনকোণা অঞ্চল। এই নিয়ে তৈরি হয়েছিল ভারতীয় উপমহাদেশের ভূগোল।

ভাবতীয় উপমহাদেশকে একসময় *ভাবতবর্ষ* বলা হতো। ভবত ছিল পুরোনো একটা জনগোষ্ঠী। ঐ জনগোষ্ঠী যে অঞ্চলে থাকত তাকে বলা হতো ভাবতবর্ষ। ভারত শব্দের একটি অর্থ ভবতের বংশধব। তবে ভারতবর্ষ বলতে সবসময়পুরো ভাবতীয় উপমহাদেশকে বোঝাত না





प्रेकखा कथा

আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য

ভারতবর্ষের উত্তর ও দক্ষিণ অংশকে ভাগ করেছে বিশ্য পর্বত সাধারণভাবে আর্যরা উত্তব অংশে বাস কবত राल ये अश्वनारक আর্যাবর্ত বলা হতো আর্যাবর্তের সীমানা নানা সময়ে বদলেছে একসময়ে আর্যাবর্ত বলতে প্রায় প্রো উত্তর ভারতকেই বোঝানো হতো , বিস্থা পর্বতেব দক্ষিণ দিকে আর্যদের বিশেষ কোনো প্রভাব ছিল না এই দক্ষিণভাগকেই বলা হতো দাক্ষিণাত্য বিন্ধা পর্বত থেকে কন্যাকুমারিকা ছিল দাক্ষিণাত্য অঞ্জ দ্রাবিড জাতির বাস ছিল দাকিণাতো কাবেবী নদীব দক্ষিণ অংশকে তাই দ্রাবিড দেশও বলা হতো দাক্ষিণাতা অঞ্জলের ভাষাগুলিকে দ্রাবিড় ভাষা বলা হতো।

১.৪ পুরোনো দিনেব হিসেব-নিকেশ

একদিন দিদিমণি বললেন, আজ আমবা পুবোনো দিনেব হিসাব কবা শিখব। তোমাদের মনে আছে ইতিহাস শেখার প্রথম ধাপ কী ? সবাই বলল, কবে - এই প্রশ্ন কবা। দিদিমণি বললেন, বলোতো, ভাবতে প্রথম যাত্রী নিয়ে ট্রেন কবে চলে ? সবাই বলল, ১৮৫৩ সালের ১৬ এপ্রিল। দিদিমণি বললেন, বাঃ। বেশ মনে আছে তো! এবাবে বলোতো, মানুষ কবে চাকা আবিষ্কাব কবেছে, কবে আগ্ন জ্বালাতে শিখেছে? এই প্রশ্ন দুটোব উত্তর ওবা জানে না দিদিমণি বললেন, উত্তরগুলো তোমাদেব খুঁজে বার করতে হবে। পারবে তো? স্বাই বাজি। দিদিমণি বললেন, একটা সময় ছিল যখন ঘডি ছিল না। ক্যালেন্ডাব ছিল না। মানুষ লিখতে পারত না। তাই কেউ সাল-তাবিখ দিয়ে লিখে বাখেনি কবে মানুষ প্রথম আগুন জ্বালাতে শিখেছিল। অনেক অনেক পুরোনো দিনেব হিসাব নিয়ে সেই জন্যই মুশকিল হয়। তবে কাজের সুবিধার জন্য নানা ভাগে ভাগ করতে হয় পুবোনো সময়কে। এই ভাগগুলোব হিসাব আলাদা আলাদা। ধরো, হাজার হাজাব বছর মানুষ শুধু পাথরের ব্যবহার জানত। কিন্তু, ঠিক কবে পাথরেব ব্যবহাব শুবু হয়, সে কথা কোথাও লেখা নেই। তাই ঐ হাজাব হাজার বছরকে বোঝাতে একটা শব্দ ব্যবহার করা হয়। সেটা হলো যুগ। মোটামূটিভাবে অনেক লম্বা একটা সময় বোঝাতে যুগ কথাটা বলা হয়। আবাব ধরো, হাজাব-হাজার বছব এই পৃথিবীতে বরফ জমে ছিল সেই লম্বা সমযকে বোঝাতে *তুষার* (বরফ) *যুগ* কথাটা বলা হয় একসময়ে মানুষ তামা, ব্রোঞ্জ, লোহা এইসব ধাতুর ব্যবহাব শিখল। সেই সময়টাকে বোঝাতে *ধাতুর যুগ* বলা হয়। কিন্তু ধাতুর যুগের মধ্যেও ভাগ আছে যখন শুধু তামার ব্যবহার জানত, সেটা তামার যুগ। তেমনি পরে যখন লোহার ব্যবহার শিখল, তখন শুবু হলো *লোহার* যুগ তবে লোহার যুগেও পাথর, তামা এসবের ব্যবহার বন্ধ হয়ে গেল না। কিন্তু, লোহাই তখন সবচেয়ে বেশি কাজে লাগল লোহাব যন্ত্ৰপাতি ব্যবহাব কবেই মানুষ সহজে কাজ সারতে পারল। ৩াই ঐ সময়টার নাম হলো লোহার যুগ।

কিন্তু, ঠিক কবে কোন যুগ শেষ হলো? এইসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও সহজ নয়। তাই সেসবেব উত্তব দিতে গিয়ে একটা কথা জুড়ে দেওয়া হয় — আনুমানিক তার মানে অনুমান বা আন্দাজ করে নেওয়া হয়েছে এমন। অনেক সময পুবোনো দিনের সাল-তাবিখ আন্দাজ করে নিতে হয়। সময়ের হিসাবের সঞ্চো আনুমানিক কথাটা ব্যবহার কবতে হয়।

ুথৈন্ত্রে কথা প্রাক-ইতিহাস, প্রায়-ইতিহাস, ইতিহাস

ইতিহাস কত পুবোনো দিনের কথা বলে? একসময় মানুষ লিখতে পারত না। সেই সময়ের কথা আমাদের অনুমান করে নিতে হয়। এই সময়কে অনেকে প্রাক-ঐতিহাসিক যুগ বলেন প্রাক মানে আগেব তাহলে প্রাক-ইতিহাস মানে ইতিহাসের আগেব সময় আবাব একসময়ে মানুষ লিখতে শিখল। কিন্তু, সেই সময়ের পাওয়া সব লেখা আজও পড়া যায়নি। অর্থাৎ, পুরোনো সময়ের লেখা পাওয়া যায়, কিন্তু পড়া যায় না। সেই পুরোনো সময়টাকে বলা হয় প্রায় ঐতিহাসিক যুগ। যে সময়ের লেখা পাওয়া যায় ও পড়া যায় তা হলো ঐতিহাসিক যুগ। তবে এই ভাগাভাগিগুলো নেহাতই কাজ চালানোর জন্য করা। ইতিহাস পুরোনো দিনেব কথা বলে। সে যত পুরোনোই হোক। তখন মানুষ লিখতে পাবুক আব নাই পাবুক। সেসব লেখা পড়া যাক বা না যাক। প্রোনো দিনেব কথাই ইতিহাসের কথা

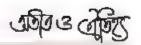
সাল-তারিখের নানারকম

মানুষ লিখতে শেখার পর থেকেই সহজ হলো পুরোনো দিনের কথা জানা।
তাই কবে? প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে লাগল অনেক সহজে। আনুমানিক
কথাব দরকার কমে এল আন্তে আন্তে। সময়ের হিসাব কবা সহজ হলো সাল
কথাটা তোমরা জানো সাল বোঝাতে অব্দও বছর কথাগুলোও ব্যবহার হয়
ইতিহাসে নানারকম অব্দেব ব্যবহাব দেখা যায়। কোনো বডো বা জবুরি ঘটনাকে
ধরে অব্দ গোনা হতো বাজাদের শাসন ধবেও অব্দ গোনা চালু ছিল যেমন,
কনিষ্কাব্দ, গুপ্তাব্দ, হর্ষাব্দ ইত্যাদি। কুষাণ সম্রাটদের মধ্যে সেবা ছিলেন কনিষ্ক তিনি সিংহাসনে বসে এক নতুন অব্দ গোনা চালু কবেন। সেই অব্দ গণনাকে
কনিষ্কাব্দ (কনিষ্ক + অব্দ) বলে। কনিষ্কাব্দেব আর এক নাম শ্রকাব্দ। ধরা হয়
৭৮ খ্রিস্টাব্দে কনিষ্ক সিংহাসনে বসেন। তাহলে খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭৮ বাদ দিলে
কত শ্রাব্দ তা জানা যাবে।

গুপ্ত সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্ত একটা অব্দ গণনা চালু কবেন, তাকে গুপ্তাব্দ বলা হয়। ৩১৯ ৩২০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ গুপ্তাব্দ গণনা শুবু হয়। হর্ষবর্ধনও রাজা হওয়ার সময় (৬০৬ খ্রিস্টাব্দ) থেকে *হর্ষাব্দ* গণনা চালু করেন। 999

ভেবে দেখো

একটি ক্যালেন্ডাব নাও। সেটি ভালো করে দেখো। কোন বঙ্গাব্দ, কোন শকাব্দ এবং কোন খ্রিস্টাব্দের ক্যালেন্ডাব সেটি?



টুকন্ত্রে কথা খ্রিস্টপূর্বাব্দ ও খ্রিস্টাব্দ

ষিশু খ্রিন্টের জন্মকে ধরে যে অব্দ বা সাল গোনা হয় তা হলো খ্রিস্টাব্দ (খ্রিস্ট + অব্দ)। খ্রিস্টাব্দ অনুসাবেই সাধারণভাবে ইতিহাসের সাল-তাবিখ হিসাব করা হয়। যিশুব জন্মের আগের সময়কে বলা হয় খ্রিস্টপূর্বাব্দ। পূর্ব মানে এখানে আগের। তাহলে খ্রিস্টপূর্বাব্দ মানে হলো খ্রিস্টের জন্মের আগের অব্দ গণনা [খ্রিস্ট + পূর্ব (আগের) + অব্দ (সাল গণনা)]। মজার ব্যাপাব হলো, খ্রিস্টপূর্বাব্দ বড়ো থেকে ছোটোব দিকে গোনা হয় মানে সেখানে ৫.৪,৩,২,১ — এভাবে গোনা হয়। আব খ্রিস্টাব্দ গোনা হয় ছোটো থেকে বড়োব দিকে। যেমন ১,২,৩,৪,৫। তাই ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের আগের বছর হবে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ আর খ্রিস্টাব্দ আর খ্রিস্টাব্দ আর খ্রিস্টাব্দ হলে উলটো হবে ২০১৪ খ্রিস্টাব্দর আগের বছর হবে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ পরের বছর হবে ২০১৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।

এখানে আব একটা মজার ব্যাপার আছে। খ্রিস্টীয় শতক গোনাব সময় দেখবে একধাপ করে এগিয়ে গোনা হয় যেমন ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ। এটা কিন্তু খ্রিস্টীয় উনবিংশ শতক নয়, খ্রিস্টীয় বিংশ শতক। কেন? কারণটা খুব সহজ। যিশুর জন্মেব থেকে প্রথম ১০০ বছর হলো খ্রিস্টীয় প্রথম শতক যিশুব জন্মেব ১০১ বছব থেকে ২০০ বছর হলো খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক। তাহলে হিসাবটা হবে এমন —

৩০০-২০১ খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক ১-১০০ খ্রিস্টীয় প্রথম শতক

২০০ ১০১ খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক ১০১ ২০০ খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক

১০০-১ খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক ২০১-৩০০ খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক

এভাবেই ১৮০১ ১৯০০ হলো খ্রিস্টীয় ঊনবিংশ শতক ১৯০১ ২০০০ হলো খ্রিস্টীয় বিংশ (কুড়ি) শতক। আব ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ হলো খ্রিস্টীয় একবিংশ (একুশ) শতক। মনে রেখো প্রথম খ্রিস্টাব্দ মানে যিশু যে বছবে জন্মেছিলেন আব খ্রিস্টীয় প্রথম শতক মানে যিশুব জন্মেব পব থেকে একশো বছব





সমষ গোনার আর একটা হিসাবও দেখা যায়। সেটা হলো একসংখ্য কয়েকটা বছর ধরে গোনা। ধরো, হাজাব বছর একসংখ্য হলে হয় সহস্রাব্দ (সহস্র (হাজার) + অব্দ) আবার একশো বছর বোঝাতে শতাব্দ (শত (একশো) + অব্দ) কথাটা ব্যবহার হয়। শতাব্দকে শতাব্দী বা শতকও বলা হয়। দশ বছর একসংখ্য বোঝাতে দশক কথাটা ব্যবহার হয়। তবে দশাব্দ বলা হয় না।

১.৫ বলা, আঁকা, লেখা

একদিন দিদিমণি ইতিহাস ক্লাসে একটা মজাব কাজ দিলেন। বললেন, আমি কথা বলব না। হাত নেড়ে, অঞ্চাভঙ্গি কবব তোমবা সেটা দেখে বলবে আমি ঠিক কী বলতে চাইছি। সবাই খুব মজা পেল। দিদিমণি হাত নেড়ে অনেক কিছু বোঝালেন। প্রথমে বুঝতে একটু অসুবিধা হলো সবাব। আস্তে আস্তে ওবা অনেকটাই ঠিকমতো বুঝতে পাবল। দিদিমণি বললেন, এবারে আমি বোর্ডে ছবি এঁকে দেবো। ছবিগুলো দেখে বুঝতে হবে আমি কী বলতে চাইছি প্রথমে কেউই বুঝতে পারল না ছবিগুলোর মানে কী বেশ খানিকক্ষণ ভেবে পুথা প্রথমে বলল। তারপবে বাকিরাও বুঝতে পাবল দিদিমণি বললেন, এটাই ইতিহাসেব আবেকটা গল্প। একসময়ে মানুষ কথা বলতে পাবত না। তখন হাত-মাথা নেডে, অঞ্চাভঞ্চিগ কবত। সেগুলো থেকেই একে অন্যের মনেব ভাব বুঝত। তাবপবে তাবা শিখল ছবি আঁকতে তখন ছবি এঁকে তাবা মনেব কথা অন্যদেব বোঝাত সবাই মিলে যা কবত, তাব ছবি এঁকে বাখত। গুহাব পাথবেব দেয়ালে, মাটিব গায়ে, ধাতৃব পাতে। পৰে একসময়ে ছবি এঁকে এঁকেই অক্ষব বোঝাত। ধবো, ক আব খপাশাপাশি বসেছে হয়তো তাব মানে খিদে পেয়েছে। আবাব, ক আর গ পাশাপাশি বসল। তাহলে হয়তো ঘুম পেয়েছে বোঝানো হচ্ছে এভাবেই ধীবে ধীরে মানুষ কথা বলতে, ছবি আঁকতে, লিখতে শিখেছিল। তবে এসব শিখতে হাজাব-হাজার বছব সময় লেগেছিল। সেইসব ছবি, লেখাব কিছু কিছু আজও আছে। তাব থেকেই সেই সময়েব মানুষেব কথা জানা যায়।

মাটির ওপরে ইতিহাস, মাটির নীচে ইতিহাস

রাহুল বলল, শুধু ছবি আর লেখা থেকেই কি ইতিহাস জানা যায় ? পুরোনো দিনের কি অনেক লেখা পাওয়া যায় ? দিদিমণি বললেন, না, অনেক লেখা পাওয়া যায় না। আবার যা লেখা পাওয়া যায়, তার সব পড়া যায় না তাইতো পুরোনো দিনের সব কথা জানা যায় না। তবে ছবি আর লেখা ছাড়া আরো নানা কিছু থেকে ইতিহাস জানা যায় যেমন ধরো, ঘরবাড়ি, বাসনপত্র, পোশাক



्रेक्सा कथा

জাদুঘর

জাদুঘর এই কথাটা তোমাদেব অনেকেবই জানা তবে সেই ঘরে কিন্তু জাদু দেখানো হয় না মাটিরনীচের থেকে পাওয়া পুরোনো দিনের নানা প্রত্নবস্তু যত্ন করে রাখা থাকে। আর থাকে মাটিব উপবে পাওয়া নানা জিনিসও। থাকে হারিয়ে যাওয়া বিশাল জন্তুব হাড। আবার থাকে রাজা-বানিদের পোশাক, অস্ত্র-শস্ত্র। নানারকম মূর্তি, ছবি, বইপত্র আরও কত কী! পৃথিবীর নানা জায়গায় নানাধরনেব জাদ্ঘর দেখা যায় ইংবাজিতে জাদ্ঘবকে বলে Museum (মিউজিযম)।কলকাতা শহরে একটা বিরাট জাদুঘব আছে

আবাব মুদ্রা, গয়না, অস্ত্র শস্ত্র, মূর্তি এমন নানা জিনিস থেকে পুবোনো দিনের কথা জানতে পারা যায় তবে এসব জিনিসও সবসময় পাওয়া যায় না ভেঙে গিয়ে বা মাটির নীচে চাপা পড়ে নস্ট হয়ে গেছে। মাটির নীচে চাপা পড়ে যাওয়া জিনিসগুলো খুঁজে পাওয়া যায় অনেক সময়ে এইসব জিনিসগুলোই পুবোনো দিনের সাক্ষা। ধরো, ইতিহাস একটা শরীব। আর এই সবগুলো শরীবের হাড। সেই টুকরো টুকরো হাড় জুডে ইতিহাসের কঙ্কাল তৈরি হয়। এগুলোকেই ইতিহাসের উপাদান বলে। মাটিব নীচে চাপা পড়ে যাওয়া উপাদানগুলো খুঁজে বের করেন প্রত্নতাত্ত্বিক বা পুরাতাত্ত্বিক। প্রত্ন বা পুরা মানে পুরোনো তাত্ত্বিক মানে ধরো পণ্ডিত মানুষ। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক মানে পুরোনো মানুষ নয়।

খুঁজে পাওয়া পুবোনো জিনিসগুলোকে বলে প্রত্নবন্তু বা পুবাবন্তু পুবোনো দিনেব সেইসব জিনিস থেকে অনেক কিছু জানা যায়। তবে সেগুলো অনেকটাই আন্দাজ। কারণ, সেই পুরোনো দিনগুলো আমবা চোখে দেখিনি। তাও পুরোনো দিনের লেখা পড়া গেলে সুবিধা হয়। কিন্তু যেসব লেখা পড়া যায় নাং বা যে সময়েব লেখাই পাওয়া যায় নাং সেইসব পুবোনো দিনেব কথা জানতে মাটি খুঁডে পাওয়া জিনিসগুলোই কাজে লাগে। এভাবে মাটির উপরে ও নীচে ছডিয়ে আছে ইতিহাসের নানা রকম উপাদান। সেই টুকরো টুকরো উপাদান খুঁজে জুডে নেন প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক। তাব থেকে পুবোনো দিনেব কথা জানতে পাবা যায়।

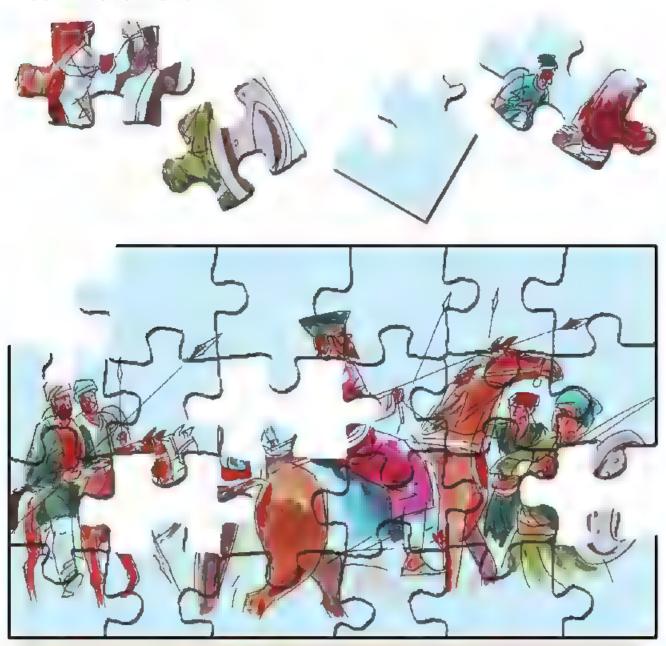
১.৬ টুকরোগুলো জুড়তে জুড়তে

স্কুলের শেষে বিকালে সবাই বুবিদেব বাড়িতে গেল। দাদু আজ একটা মজাব খেলা দেখালেন ওদেব। কতগুলো টুকবো জুড়ে জুড়ে তৈবি হচ্ছে একটা ছবি। খেলাটার নাম জিগ স পাজল। দাদু বললেন, ইতিহাসও এই খেলার মতো। টুকরো টুকবো উপাদান জুড়ে জুড়ে পুরো ছবিটা বানাতে হয়। যেখানে টুকরো পাওয়া যায় না বা হাবিয়ে যায়, সেখানে ফাঁক থাকে।

পরদিন দিদিমণিকে ওরা বলল জিগ-স পাজলেব কথা। দিদিমণি বললেন, প্রত্নতান্ত্বিক ও ঐতিহাসিকেবা এইভাবেই পুবোনো দিনেব ছবিটা সাজান। সব টুকবোগুলো একসঙ্গে পাওয়া যায় না। খুঁজতে হয়, ভাবতে হয়। তাইতো পুরোনো দিনের কথা জানার এত মজা। ঠিক যেন এই জিগ-স পাজল খেলাটার মতো। এই বছরে তোমরা অনেক ওরকম পাজল নিজেরাই বানাতে পারো। সেই আদিম মানুষের কথা থেকে শুবু হবে তোমাদেব জানা। তাবপব ভাবতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসেব হাজার-হাজার বছরেব কথা তোমবা জানবে আদিম



মানুষ ততদিনে সভ্য মানুষ হয়ে গেছে। তার মধ্যে বদলে গেছে কতকিছু। সেইসব বদলে যাওয়ার কথা তোমরা জানবে দেখবে কেমনভাবে টুকরো জোডা দিয়ে পুরোনো দিনের কথা জানতে পারা যায়। এবাবে তাহলে টুকরোগুলো খোঁজার ও জোড়ার কাজ শুরু হোক এই পুরো ইতিহাস বইটাই তো যেন বিরাট একটা জিগ-স পাজল!



পিড়ার মাঝে মজার কাজ

একটা পিচবোর্ড নিয়ে তাব উপরে সাদা কাগজ লাগাও। কাগজেব উপরে নিজেদেব পছন্দমতো একটা ছবি আঁকো অসমান কয়েকটা টুকবো করে কেটে ফেলো ছবিটা। তারপর সবাই মিলে টুকরোগুলো সাজিয়ে গোটা ছবিটা বানাও। হয়ে গেলো তোমাদের জিগ স পাজল।

প্রাচীন ভারতের

পুবোনো দিনেব কথা গুছিয়ে লেখা থাকলে সহজেই জানা যেত পুবোনো সময়ের কথা। কিন্তু, প্রাচীন ভাবতীয় উপমহাদেশেব ইতিহাস তেমন সাজিয়ে গুছিয়ে লেখা ছিল না ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকরা নানাভাবে সেই ইতিহাস জানার চেষ্টাই কবেন হবেক উপাদানের টুকরো জুডেজুডে একটা গোটা ছবি তৈরি কবেন। তবুও

পুরোনো দিনের সব লেখা আজও পড়ে ওঠা যায়নি তাই ঐ লেখাগুলো থেকে পুরোনো সময়ের ইতিহাস জানা যায় না। যেমন, হরপ্পার লিপি আজও পড়া যায়নি। মাটি খুঁড়ে পাওয়া নানা প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানই হরপ্পার ব্যুত্ত প্ৰতিষ্ঠা ব্যুত্ত প্ৰতিষ্ঠা ব্যুত্ত কাওয়া ইতিহাস জানতে সাহায্য কবে। একটা বড়ো অঞ্চল জুড়ে অনেক সময় প্রত্নতাত্ত্বিকরা খোঁড়ার কাজ

চালান। ওই অঞ্চলটাকে প্রত্নক্ষেত্র বলা হয়। তেমনি প্রত্নক্ষেত্র থেকে নানারকম প্রত্নবস্ত পাওয়া যায়। কখনও ধ্বংস হয়ে যাওয়া নগরের চিহ্ন কখনও বা নানা পাত্র, সিলমোহর, মূর্তি। আবার মাটিব পাত্রের গায়ে লেগে থাকা শস্যের দানা বা খোসা। কখনও মানুষ ও পশুর হাড়গোড়, কম্কাল। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস জানতে প্রত্নবস্তুগুলির গুরুত্ব বিরাট। তবে লিখিত ইতিহাস পাওয়া গেলেই প্রত্নবস্তর গুরুত্ব শেষ হয়ে যায় না।

প্রত্নবস্তুর পরীক্ষা থেকে যাচাই করা যায় লেখা ইতিহাস কতটা ঠিক।

<u>ज</u>र প্রত্নবস্তুর পরেই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান লেখমালা প্রাচীনকালে পাথর বা ধাতুর পাতে লিপি খোদাই করে লেখা হতো। সেই লেখাগুলি ভারতীয় উপমহাদেশের নানা জায়গায় পাওয়া গেছে। পাথরের গায়ে খোদাই লেখাগুলিকে শিলা (পাথৰ) লেখ বলা হয়। মৌর্য সম্রাট অশোকের লেখগুলি म्य লেখমালার শ্রেষ্ঠ নমুনা। আবার অনেক শাসকের গুণগানও লেখ হিসাবে খোদাই করা হতো। সেগুলোকে বলে প্রশস্তি। প্রশস্তি মানে গুণগান করা। এই প্রশন্তি লেখগুলি থেকেও ঐ শাসকের বিষয়ে অনেক কিছু জানা যায়। যেমন, গুপ্ত সম্রাট সমূদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি। আর লেখমালাগুলিতে নানা অব্দের ব্যবহার দেখা যায়। তার থেকে ইতিহাসের 'কবে'-র অনেক কিছু জানা যায়। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস জানার জন্য মুদ্রা কাজে লাগে। মুদ্রায় শাসকের নাম, মূর্তি প্রভৃতি খোদাই করা থাকে। অব্দও পাওয়া যায় মুদ্রায়। এর ফলে মুদ্রা থেকে নানারকম তথ্য জানতে পারা যায়। শক-কুষাণদের ইতিহাস তো তাদের মুদ্রা থেকেই জানা যায়।

প্রাচীন ভারতের নানা শিল্পবস্তু থেকেও ইতিহাসের নানা কিছু জানা যায়। এই শিল্পবস্তু সাধারণভাবে তিনরকমের। স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা। পাথব, ধাতৃ ও পোডামাটির উপরে খোদাই করে নানা কিছু বানানো হতো। যেমন দেব-দেবী, মানুষ ও পশুর মূর্তি। এগুলোই ভাস্কর্ষ। মন্দির বা প্রাসাদের দেয়ালেও ভাস্কর্য খোদাই থেকে অনেক বিষয় জানা যায়। তবে প্রাচীন ভারতের চিত্রশিল্পের নমুনা যথেষ্ট পাওয়া যায় না। ভীমবেটকা ও অজন্তার মতো গৃহার দেয়ালগুলোতে আঁকা ছবিগুলি যদিও আজও রয়েছে। সেখানে ছবিব বিষয় হিসাবে শাসক ও সাধারণ মানুষের জীবনের নানাদিক ফুটে উঠেছে। প্রাচীন সমাজ ও জীবন বোঝবার জন্য সেগুলি খুব জরুরি। আবার স্থাপত্যের নানা নমুনা থেকেও পুরোনো দিনের কথা জানা যায়। বাড়িঘর, প্রাসাদ, মন্দির এসবই স্থাপত্যের উদাহরণ।

ইতিহাসের উপাদান

: ক্রুভিত্তিক সাহিত্য

সবসময় ছবিগুলো পুরোপুরি তৈরি হয় না। কারণ উপাদানে ফাঁক থেকে যায় প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসের উপাদানগুলিকে মূল ছ-টি ভাগে ভাগ করা যায়। তার প্রতিটিব মধ্যে আবার নানা ভাগ আছে। নীচের তালিকা-চাকাটি খেযাল করো

প্রত্নতিক উপাদানের ক্ষেত্রে অনুমানের উপরে অনেকটা নির্ভর করতে হয়। লিখিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে পুরোটা অনুমান করতে হয় না।প্রাচীন ভারতের ইতিহাস লেখাব ক্ষেত্রে অনেকরকম সাহিত্য উপাদান পাওয়া যায়। সেগুলোকে মোটামটি দু-রকম ভাগ করা যায়। দেশি ও বিদেশি লেখকদের বচনা। দেশীয় সাহিত্যকে আবার ধর্মভিত্তিক ও ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যে ভাগ করা যায়। ধর্মভিত্তিক সাহিত্যের মধ্যে প্রধান হলো বৈদিক সাহিত্য। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ সময়ের ইতিহাস জানতে বৈদিক সাহিত্যগুলিই

মূল উপাদান। প্রাচীন ভাবতের ইতিহাস জানতে মহাকাব্য ও পুরাণগুলির গুবুত্ব আছে। জৈন ও বৌম্বধর্মের নানা লেখাতেও প্রাচীন ইতিহাসের অনেক কথা আছে। বিশেষত, খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ থেকে ইতিহাস জানার জন্য এই লেখাগুলি খুবই জরুরি।

ধর্মনিরপেক্ষ বিভিন্ন বিষয়ে লেখা নানা বই থেকেও প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায় , রাজনীতি, ব্যাকরণ, বিজ্ঞানের বইতেও সেই সময়ের সমাজ, বাজনীতি, অর্থনীতিব নানা কথা রয়েছে। পাশাপাশি কাব্য, নাটক, অভিধান, চিকিৎসাবিষয়ক বইতেও ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায়। বেশ কিছ জীবনীমূলক লেখাপত্রও প্রাচীন ভারতের ইতিহাস জানতে সাহায্য করে। বাণভট্টের *হর্ষচবিত এ*মন লেখার একটি প্রধান উদাহরণ।

AND INDER THE STATE OF THE PARTY OF THE PART প্রাচীন ভারতের ইতিহাস লেখার জন্য তিনধরনের বিদেশি বিবরণ খব জবুরি। গ্রিক, বোমান ও চিনা দৃত ও পর্যটকদের বিবরণ। তবে, বিদেশি সাহিত্যগুলির কয়েকটি সমস্যা আছে। বিদেশিরা ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কৃতি বুঝতেন না। ফলে অনেক কিছুর মানে বুঝতে তাদের ভুল হয়েছিল। তাছাড়া অনেক লেখার মধ্যে পক্ষপাতিত্ব ছিল। দেশীয় সাহিত্যেও পক্ষপাতিত্বের উদাহরণ আছে। তাছাডা, কাব্য-নটেকে সমাজের নীচু তলার মানুষের কথা বিশেষ জানা যায় না। অধিকাংশ সাহিত্যের বর্ণনা মনগড়া। তবুও প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস জানার জন্য সাহিত্য উপাদানগুলোর গুরুত্ব বয়েছে



>

ভারতীয় উপমহাদেশে আদিম মানুষ

যাযাবর জীবন থেকে স্থায়ী বসতি স্থাপন

ল থেকে দল বেঁধে একদিন চিড়িযাখানায় যাওয়া হলো। সঞ্চো দিদিমণি ও মাস্টারমশায়বাও ছিলেন। শিস্পাঞ্জি দেখে তিতির বলে উঠল, জানিস মানুষ আগে শিস্পাঞ্জিব মতোই ছিল! আনোয়ার বলল, শিস্পাঞ্জি তো জন্তু, গায়ে বড়ো বড়ো লোম। তাছাড়া শিস্পাঞ্জি ভালোভাবে দাঁড়াতেই পারে না। সিধু বলল, চল, আমরা সবাই দিদিমণিকে জিজ্ঞাসা করি অরুণ বলল, দিদি, মানুষ কি সতিয় এক সময় শিস্পাঞ্জিব মতো ছিল? দিদিমণি বললেন, আজ চিডিয়াখানা ভালো করে ঘুরে দেখো। কাল ক্লাসে আমরা এবিষয়ে কথা বলব।



২.১ আদিম মানুষের কথা

মানুষ ও তার কাজকর্ম নিয়েই মানুষের ইতিহাস মানুষ আবার একটি বিশেষ প্রাণীও শরীরের নির্দিষ্ট কতগুলি বৈশিষ্ট্য থেকেই আলাদা করে মানুষকে চেনা যায়। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে নানান বদলের মধ্যে দিয়ে সেই বৈশিষ্ট্যগুলি তৈবি হয়েছে দু-পায়ে হাঁটা, হাতেব ব্যবহাব, লম্বা মেবুদণ্ড— এই সবই মানুষেব বৈশিষ্ট্য আর তার মেরুদণ্ডের উপরে রয়েছে একটি বড়ো মস্তিষ্ক।

মানুষই একমাত্র প্রাণী যাবা হাতের বুড়ো আঙুলকে কোনো কিছু ধরতে ব্যবহাব করে। তাছাডা মানুষেব মাথার খুলি বড়ো মস্তিষ্ক ধবে বাখতে পাবে। কয়েক লক্ষ বছব ধবে এইসব বদলগুলো মানুষেব শরীরে হয়েছিল

লক্ষ লক্ষ বছৰ আগে পৃথিবীৰ স্থলভাগ ছিল ঘন জঙ্গালে ঢাকা আফ্রিকা মহাদেশের পূর্ব অংশেও তেমনি ঘন জঙ্গাল ছিল। সেই জঙ্গালে ঘূবে বেড়াত বিশাল আকাবের ভযানক সব প্রাণী গাছে গাছে ছিল নানা ধরনের অনেক পাখি আর বানর। সেখানে এক ধরনের বড়ো বানর ছিল। তাদের লেজ ছিল না। এদেব এপ (Ape) বলা হয় অনেকদিন ধরে আস্তে আস্তে আবহাওয়া বদলাতে থাকল নানা কাবণে গাছপালা আগের থেকে কমে গেল। গাছে গাছে ঘুবে বেডানো কঠিন হয়ে গেল। তাছাডা আগেব মতো সহজে ফলমূল পাওয়াও মুশকিল হয়ে গেল। তখন এপদেব একদল গভীর জঙ্গালের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল

অন্য দলটি খাবার খুঁজতে গাছ থেকে মাটিতে নেমে এল। দু পায়ে দাঁডাতে চেম্টা করল। খাবাব সহজে পাওয়া গেল না। তাই খাবাব খোঁজা শুবু হলো। এবপব এল কোনোভাবে দাঁড়াতে পাবা মানুষ। সে প্রায় তিরিশ থেকে চল্লিশ লক্ষ বছর আগের কথা। এইভাবে আস্তে আস্তে এপ থেকে আলাদা হয়ে গেল মানুষ পরিবার বা হোমিনিড। শুরু হলো মানুষেব এগিয়ে চলা এবং নিজেকে উন্নত করা।





্টুকন্ত্রে কথা আদিম মানুষের নানারকম

আদিম কথার মানে খুব পুরোনো বা গোডার দিকের। খুব পুরোনো সময়েব মানুষ বোঝাতে আদিম মানুষ কথাটা ব্যবহাব কবা হয়। এখনও পর্যস্ত সবচেয়ে পুরোনো আদিম মানুষের খোঁজ পাওয়া গেছে পূর্ব আফ্রিকাতে। আদিম মানুষের মধ্যেও নানাবকম ভাগ রয়েছে। মূলত মস্তিষ্কের আকার থেকেই সেই ভাগাভাগি কবা হয়।

অস্ট্রালোপিথেকাস: এপ থেকে মানুষ

- এবা ছিল আনুমানিক ৪০ লক্ষ থেকে ৩০ লক্ষ বছব আগে
- এবা দু পায়ে ভব দিয়ে কোনোক্রমে দাঁডাতে পাবত।
- শক্ত বাদাম, শৃকনো ফল চিবিয়ে খেত চোয়ালে ছিল শক্ত ও সৃগঠিত
- এবা গাছে ডাল দিয়ে ধাকা মাবত, পাথব ছুঁড়তে চেষ্টা কবত





হোমো হাবিলিস: দক্ষ মানুষ

- এবা ছিল আনুমানিক ২৬ লক্ষ থেকে ১৭ লক্ষ বছর আগে
- এবা দলবন্ধভাবে থাকত হাঁটতে পাবত
- ফলমূলের পাশাপাশি এরা সম্ভবত কাঁচা মাংস খেত
- এবাই প্রথম পাথরকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার কবে একটা পাথর দিয়ে
 আবেকটা পাথরকে জোরে আঘাত কবে পাথবেব অস্ত্র বানাত।





হোমো ইরেকটাস: সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারা মানুষ

- এবা ছিল আনুমানিক ২০ লক্ষ থেকে ৩ লক্ষ ৫০ হাজাব বছব আগে।
- এরা দ-পায়ে ভব করে সোজা হয়ে দাঁডাত দলবন্ধভাবে গহায় থাকত।
- এবা শিকাব কবতে পারত এরাই প্রথম আগুনেব ব্যবহার শিখেছিল।
- এবা বানিয়েছিল স্তরকাটা নুড়ি পাথরেব হাতিয়াব , শেষ দিকে বানিয়েছিল হাতকুঠার।





হোমো স্যাপিয়েন্স: বুন্ধিমান মানুষ

- এরা আনুমানিক ২ লক্ষ ৩০ হাজার বছব আগে এসেছিল।
- এরা দল বেঁধে বড়ো পশু শিকাব কবত নানা কাজে আগুন ব্যবহার কবত। পশুব মাংস পুডিয়ে খেত। পশুব চামডা পবত।
- ছোটো, তীক্ষ্ণ ও ধাবালো পাথবেব অস্ত্র তৈরি করতে শিখেছিল।
 এরা বর্শা জাতীয় পাথবের অস্ত্র বানাতে পাবত





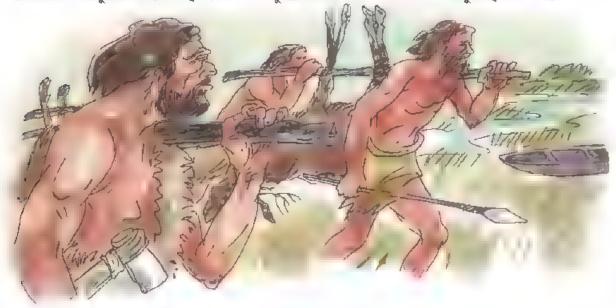


লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আদিম মানুষ পাথব দিয়ে হাতিয়াব বানাত। সেজন্য পাথরেব যুগ মানুষের ইতিহাসের একটা বড়ো অংশ পাথরের যুগকে সাধারণভাবে তিনটে পর্যায়ে ভাগ করা হয়। সেই প্রতিটা ভাগে পাথরের হাতিয়াবগুলির আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে তাছাড়া আদিম মানুষের জীবনযাপনেও অনেক বদল ঘটেছিল।

তালিকা ২.১: এক নজরে তিনটি পাথবের যুগ

्रिकाला भी भेरता गूर्व	মাৰের শশৈলের সুখ	
আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২০ লক্ষ বছর	আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১০ হাজার	আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৮ হাজার
থেকে খ্রিস্ট পূর্ব ১০ হাজার বছব	থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৮ হাজার বছর।	থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৪ হাজার বছর।
হাতিয়াব বড়ো ও ভারী পাথরের,	হাতিয়াবের পাথব ছোটো হালকা	হাতিয়ার অনেক হালকা ও
এবডোখেবড়ো শিকাব করে ও	ও ধাবালো শিকার করে ও বনেব	ধাবালো নানারকমের হাতিয়ার
বনের ফলমূল জোগাড় করে	ফলমূল জোগাড় করার পাশাপাশি	পশুপালন ও কৃষিকাজ শুরু হয়।
খেত	পশুপালন শুরু হয়।	মাটিব পাত্র বানানো শুরু।
খোলা আকাশেব নীচে কখনও বা	গুহা থেকে বেরিয়ে ছোটো ছোটো	যাযাবর জীবন ছেড়ে একটা
গুহায় থাকত।	বসতি বানানো শুবু।	অঞ্চলে স্থায়ী বসতি বানানো

আগুন ব্যবহাব কবতে শেখা মানুষেব ইতিহাসে খুব জবুবি একটা বিষয় অন্য সব প্রাণী আগুনকে ভয় পায়। প্রাণীদের মধ্যে মানুষই একমাত্র আগুন জ্বালাতে ও ব্যবহার কবতে পাবে। প্রথমদিকে বনে লাগা আগুন (দাবানল) বা অন্যভাবে জ্বলে ওঠা আগুন তাবা দেখত। পবে হয়তো কোনো একসময়ে জ্বলন্ত গাছেব ডাল এনে গুহাব মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে বাখত। নিভতে দিত না এবপব হঠাৎ একদিন আদিম মানুষ আগুন জ্বালাতে শিখেছিল। হয়তো পাথবের হাতিয়াব তৈবি কবতে গিয়ে চকমিক জাতীয় পাথবের ঠোকাঠুকিতে হঠাৎ জ্বলে ওঠে আগুন অথবা কাঠে কাঠ ঘষে আগুন জ্বালিয়ে ছিল।





प्रेकासा कथा

न्मि

আফ্রিকা মহাদেশের ইথিওপিয়ায় হাদার (Hadar) নামে একটা জায়গা আছে। সেখানে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে একটা অস্ট্রালোপিথেকাসেব কঙকালেব কিছু অংশ পাওয়া গেছে। কঙকালটি প্রায় ৩২ লক্ষ বছব আগেব একটি ছোটো মেয়ের কঙ্কালটিব নাম দেওয়া হযেছিল লুসি। লুসির মস্তিষ্ক অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় বেশ বড়ো ছিল। যদিও ধীরে ধীরে আদিম মানুষেব মস্তিষ্ক আবও বডো হতে থাকে।



২০ ছবি ২.১: লুসির হাড়গোড়

আগনের ব্যবহার কবার ফলে বেশ কিছু বদল দেখা যেতে থাকে। একদিকে প্রচন্ড শীতের হাত থেকে মানুষকে বাঁচাত আগুন পাশাপাশি বিভিন্ন জন্তব আক্রমণ মোকাবিলা করার জন্যেও আগুনেব ব্যবহার শুরু হয়। তাছাড়া আগুনের ব্যবহার আদিম মানুষের খাবার অভ্যাসও বদলে দিয়েছিল। এসময় কাঁচা খাওয়ার বদলে খাবার আগুনে ঝলসে খাওয়া শুরু হয়। ঝলসানো নরম মাংস খেতে তাদের চোয়াল ও দাঁতের জোর কম লাগত।তাই ধীরে ধীরে তাদের চোয়াল সবু হয়ে এল।সামনের ধারালো উঁচু দাঁত ছোটো হয়ে গেল। আরও নানারকম বদল হলো চেহারায়। আদিম মানুষের শরীরে জোর বাড়ল, বৃদ্ধিরও বিকাশ হলো।

ভারতীয় উপমহাদেশে আদিম মানুষ: হাতিয়ার ও জীবনযাপনের নানা দিক

আফ্রিকা, চিন ও জাভায় খুব পুবোনো মানুষেব কঙ্কাল ও হাডগোড়ের খোঁজ পাওয়া যায়। ভাবতীয় উপমহাদেশে তত পুৰোনো মানুষেব নজিব নেই সম্ভবত আফ্রিকা থেকে আদিম মানুষ একসময় ভাবতীয় উপমহাদেশে এসেছিল আদিম মানুষেব হাড়গোডেব অল্প নমুনইি উপমহাদেশে পাওয়া যায়। ববং তাদের ব্যবহাব কবা পুৰোনো হাতিয়াব বেশ কিছু অঞ্চলে পাওয়া গেছে। সেগুলো থেকেই উপমহাদেশে আদিম মানুষের কথা জানতে পাবা যায়।

২.২১ উপমহাদেশে পুরোনো পাথরের যুগ

ভাবতীয় উপমহাদেশের সব থেকে পুবোনো পাথরেব অস্ত্র পাওয়া গেছে কাশ্মীবের সোষান উপত্যকায়। তাছাড়া পাকিস্তানের পটোয়াব মালভূমিতে ও হিমাচল প্রদেশের শিবালিক পর্বত অঞ্চলেও পুরোনো পাথরের হাতিয়ার পাওয়া গেছে। ঐ হাতিয়ারগুলি বেশির ভাগই হাত কুঠাব ও চপাব জাতীয়। হাতিয়াবগুলি বেশিরভাগ ছিল ভারী নুড়ি পাথরের তৈবি

হোমো ইরেকটাস প্রজাতির আদিম মানুষ উপমহাদেশেব বিভিন্ন এলাকায় ছডিয়ে পডেছিল। কর্ণাটকের হুন্সগি উপত্যকা, রাজস্থানেব দিদওয়ানা ও মহারাষ্ট্রের নেভাসাতে তাব প্রমাণ রয়েছে। এইসব প্রত্নুকেন্দ্রগুলিতে নানারকম পাথবের হাতিয়ার পাওয়া গেছে। মধ্যপ্রদেশেব নর্মদা উপত্যকায় এক লক্ষ তিবিশ হাজার বছরেবও বেশি আগের মানুষের মাথার খুলি পাওয়া গেছে

ভারী নিবেট পাথবের হাত কুঠার যারা ব্যবহার করত তারা খারার জোগাড কবত। নিজেদেব খাবাব তারা নিজেরা বানাতে পারত না। পশুপালনও তাদের

731 13773133

জানা ছিল না শিকার করে ও ফলমূল জোগাড় করেই তারা পেট ভরাত।
ফলে নানান জায়গায় ঘুরে ঘুরে দিন কাটত তাদের। সেই যাযাবর জীবনে
পাকাপাকি একটি অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলেনি আদিম মানুষ। কিছু সময়
থাকার জন্য তারা বেছে নিত কোনো প্রাকৃতিক গুহা। তা না পেলে খোলা
আকাশের নীচেই দিন কাটত। পুরোনো পাথরের যুগে আদিম মানুষের জীবন
ছিল বেশ কঠিন ও কষ্টেব। দলবেঁধে তারা পশু শিকাব করত মিলেমিশে খাবার
ভাগ করে খেত প্রচন্ড ঠান্ডা থেকে বাঁচতে পশুর চামড়া, গাছের ছাল পরত।
আদিম মানুষ তখনও পোশাক তৈবি করতে শেখেনি। উপমহাদেশের কয়েকটি
অংশে তেমন পুরোনো গুহা-বসতির নজির রয়েছে যেমন, উত্তব-পশ্চিম
পাকিস্তানেব সাংঘাও, কর্ণটিকের কুর্ণুল ও মধ্যপ্রদেশের ভীমবেটকা।

টুকান্ত্রে কথা ভীমবেটকা

মধ্যপ্রদেশের ভূপাল থেকে কিছুটা দূরে, বিস্থ্যপর্বতের গা ঘেঁষে নির্জন জঙ্গল । সেখানে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে, ভীমবেটকায় বেশ কিছু গুহার খোঁজ



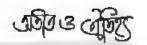
ছবি. ২.২. ভীমবেটকার গুহায় আঁকা ছবি

পাওয়া যায়। ঐ গৃহাগুলিতে পুবাতন পাথবেব যুগ থেকে আদিম মানুষেবা থাকতে শুবু করে। গৃহার দেয়ালে তাদের আঁকা ছবি পাওয়া গেছে। প্রায় সবই শিকাবের দৃশ্য নানারকম বন্য পশুর ছবি বয়েছে। তাছাডা পাখি, মাছ, কাঠবেডালিব মতো প্রাণীর ছবিও দেখা যায়। এছাডা দেখা যায় মানুষ একা অথবা দলবেঁধে শিকার করছে তাদের কারো কাবো মুখে মুখোশ। হাতে পায়ে গয়না অনেক সময়ই মানুষের সঙ্গে কুকুবকে দেখা যায় ছবিগুলিতে সবুজ ও হলুদ রং-এব ব্যবহার হলেও বেশি দেখা যায় সাদা এবং লাল রং।

ছবি ২৩: ভীমবেটকার গৃহা

টুকান্ত্রা কথা

হুসগি উপত্যকা কর্ণাটকের গুলবর্গা জেলার উত্তর-পশ্চিমে হুসগি উপতাকায় ইসামপুরগ্রাম। তাব পাশ দিয়ে বয়ে গেছে কাথটা হাল্লা খাল। ১৯৮৩ গ্রিস্টাব্দে মাটি খুঁডে সেখানে পুরোনো পাথৱেৱ যুগের হাতিয়াব পাওয়া গেছে। ঐগুলি আজ থেকে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় লক্ষ বছব আগেকার। এব বেশির ভাগই হাত কুডুল, ছোৱা, চাঁছুনি জাতীয়।অনেকেব মতে হুন্দগিতে পাথরেব হাতিয়াব তৈবি হতো। খালেব জল, নানাবকম বন্যজন্ত ও গাছপালা ঐ অঞ্চলে ছিল। সম্ভবত সেজন্য ঐ জায়গাটা বেছে নিয়েছিল আদিম মানুষ



प्रेवाखा वाथा

ট্যরো - ট্যরো

ইউরোপের স্পেনে একটি পাহাডি এলাকা হলো আলতামিরা। সেখানে কয়েকটিপ্রাচীন গৃহার খোঁজ পাওয়া যায়। এক প্রত্নতাত্ত্বিক তাঁর ছোটো মেয়েকে নিয়ে গৃহাগুলি দেখতে গিয়েছিলেন তাঁব হাতে ছিল একটা আলো হঠাৎ মেয়েটি চিৎকাব কবেউঠল টারো-টারো অর্থাৎ যাঁড যাঁড। দেখা গেল গৃহাব ছাদে বিশাল বড়ো একটি ষাঁড়েবছবি প্রায় ৫০ থেকে ৩০ হাজাব বছব আগেকাব গৃহাবাসী মানুষেব আঁকা

পাথরের হাতিয়ার তৈবির পন্ধতি খুব ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছিল। হাতিয়ারগুলি আন্তে আন্তে হালকা, ছোটো ও ধারালো হয়ে উঠছিল। একটা বড়ো পাথবের গায়ে আঘাত কবে তাব কোনাচে অংশগুলো বাব কবা হতো। সেই হালকা ও ছোটো কোনাচে অংশগুলো হাতিয়াব হিসেবে ব্যবহাব করা হতো। তার ফলে ভাবী নুডি পাথবের হাতিয়ারের ব্যবহার কমতে থাকে। পাথবের হাতিয়ার বানানো কৌশলের এই তফাত দিয়েই পুরোনো পাথবের যুগের এই মাঝের পর্বেছুরি ছিল একটি প্রধান হাতিয়ার। পুরোনো পাথবের যুগের শেষ পর্ব পর্যন্ত ঐ জাতীয় ছুবিব ব্যবহাব হতো।

২.২.২ উপমহাদেশের মাঝের পাথরের যুগ

এরপর মাঝের পাথরেব যুগে আবও উন্নত হাতিয়াব বানানো হতে থাকে। এই সময় ছুরিগুলো আগের থেকে অনেক বেশি ধাবালো ও ছোটো হয়ে গেছিল তাই সেগুলোকে ছোটো পাথরেব হাতিয়ার বলা হয়। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব দশ হাজার অব্দ নাগাদ উপমহাদেশের আবহাওয়া গরম হতে শুরু করে ফলে আগের থেকে গরম আবহাওয়া মানুষের থাকার জন্য ভালো পরিবেশ তৈরি করেছিল। মাঝের পাথরের যুগের ছোটো হাতিয়াবগুলি গাছের ডালের সঙ্গো জুড়ে বা গেঁথে নেওয়া হতো। তার ফলে হাতিয়াব ধরতে সুবিধা হতো। উত্তরপ্রদেশের মহাদহা, মধ্যপ্রদেশের আদমগড় প্রভৃতি অঞ্চলে ঐ যুগের মানুষের হাতিয়ার পাওয়া গেছে

উত্তবপ্রদেশেব সবাই নহব বাইতে দু-দিকে ধাবওলা ছুবি পাওয়া গেছে। তাছাড়া হাড়েব তৈরি তিবেব ফলাও দেখা গেছে বিভিন্নবকম বন্য পশুব হাড় সেখানে রয়েছে। পশুব মাংস ঝলসানোব জন্য আগুনের ব্যবহাব কবা হতো। ভেড়া বা ছাগল জাতীয় কোনো পশুব হাড় পাওয়া যায়নি। তাব থেকে মনে হয়





আদিম মানুষ তখনও শিকারি ছিল সরাই নহর রাইতে জাঁতার মতো যন্ত্র দেখা গেছে।শস্যদানা গুঁডো করতে ওই জাঁতা ব্যবহার হতো।তবে সবাই নহর বাইয়ের মানুষ বনের শস্য এনে জাঁতায় পিষে নিত। তারা কিন্তু খাদ্যশস্য উৎপাদন কবতে পাবত না। ঐ প্রত্নক্ষেত্রে আদিম মানুষের সমাধি ও কঞ্কাল পাওয়া গেছে। মহাদহাতেও সমাধি পাওয়া গেছে। সেখানের কঞ্কালগুলি থেকে জানা যায় কম বয়সেই সেই মানুষগুলি মাবা গিয়েছিল।

নৰ্মদা উপত্যকার আদমগড়ে আট হাজাব বছব পুরোনো বন্য পশুর হাড পাওয়া গেছে। পাশাপাশি বেশ কিছু গবাদি পশু ও কুকুবেব হাড়ও বয়েছে। গবাদি পশু ও কুকুবের হাড়ে আঘাতেব চিহ্ন নেই। অর্থাৎ তাদেব মাবা হয়নি। এব থেকে মনে হয় আদমগডেব মানুষ পশুপালন কবতে শিখেছিল। তবে তাবাও শিকাব করেই খাবার জোগাড কবত



২ ২.৩ উপমহাদেশে নতুন পাথরের যুগ

আদিম মানুষের ইতিহাসে নতুন পাথবের যুগ অনেকদিক থেকেই নতুন ছিল। পাথরের হাতিয়ার বানানোর কৌশল অনেক উন্নত হয়েছিল। নানান রকম পাথবের হাতিয়ার তৈরি করা শুরু হয়। পাশাপাশি ছোটো পাথরের হাতিয়ারও এসময় ব্যবহার করা হতো। এই পর্যায়ে প্রথম আদিম মানুষ কৃষিকাজ শেখে ফলে তারা নিজেরা নিজেদের খাদ্য উৎপাদন শুরু করে নতুন পাথরের যুগে শিকার করতে বা পশু চরাতে ছেলেরা দল বেঁধে যেত। মেয়েবা বাচ্চাদের

्रेयास्य याथा

বাগোড়

রাজস্থানের বাগোডে আদিম মানুষেব বসতিব চিহ্ন পাওয়া গেছে একেবারে প্রথমদিকে বাগোডেব বাসিন্দাবা শিকার কবেই খাবাব জোটাত কিছু কিছু পশু পালনও তাদেব জানা ছিল। বাগোডে অনেকগুলি পশ্ব হাড পাওযা গেছে সেগুলো থেকে অনুমান কবা হয় পরেব দিকে গৃহপালিত পশুর সংখ্যা বেডেছিল . পাশাপাশি কমতে থাকে শিকার করা পশুর সংখ্যা।অর্থাৎ বাগোডেব মান্ষ ধীরে ধীরে গৃহপালিত পশ্র গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিল। দেখলে সেভাবে বাগোড়ে শিকার ও পশুপালন দুই-ই চলত।



দেখাশোনা কবত ফলমূল জোগাড কবত। এইভাবে একসময়ে গাছপালা দেখতে দেখতে মেয়েবা বুঝাতে পাবল কীভাবে বীজ থেকে চারাগাছ হয়, চাবাগাছ থেকে বড়োগাছ। তখন শুধু খাবাব খোঁজা নয়, খাবাব তৈবি কবতে পাবল তাবা। মানুষ শিখল কৃষিকাজ। কৃষিকাজ শুরু হওয়ার ফলে কৃষি অঞ্চলেই স্থায়ী বসতি বানিয়ে থাকতে শুরু করে মানুষ চাষের সঙ্গো যুক্ত হয় বাস বা থাকা। চাষবাস কথাটা আজও ব্যবহার হয়। তার থেকে ক্ষেতের পাশে বসতি বানানোর গুরুত্ব বোঝা যায়। শিকাব ও পশুপালনের জন্য মানুষকে নানান জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হতো। কৃষিকাজ শুরু করার পরে সেই ঘোরাঘুরি বন্ধ হয়। তাছাড়া কৃষিকাজ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করে। শিকারের মতো তা অনিশ্চিত নয়। ফলে যাযাবর মানুষ ধীরে থীরে কৃষি ও স্থায়ী বসতির দিকে যেতে থাকে। চাষ করার ফলে পশুপালনও সহজ হয়ে গোল। অঢেল খড, বিচালি গ্বাদি পশুর সংখ্যা বেডে গেল।

শিকাব ও পশুপালন করে যা পাওয়া যেত, তা গোষ্ঠীর সবাই ভাগ করে
নিত।তাই সেই সমাজে ভেদাভেদ বিশেষ ছিল না। তুলনায় কৃষি সমাজ অনেক
বেশি জটিল। সেই সমাজে জমি ও ফসলেব সমান ভাগাভাগি ছিল না।
পাশাপাশি কৃষিতে বাড়তি ফসল ফলানো যেত। তাই সবাইকে নিজেদের পেট
ভরানোর জন্য নিজেদের চাষ কবতে হতো না। ফলে কৃষির বদলে অনেকেই
কাবিগব বা অন্যান্য কাজ করতে থাকে। চাষেব কাজে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির
প্রযোজন হতো। পাথব ও কাঠ দিয়ে সেগুলো বানাত কাবিগবেরা ফলে ক্রমশ

আদিম মানুষের সমাজ থেকে জটিল ও উন্নত সমাজ ব্যবস্থা দেখা দেয়।

এবারে ভেবে দেখো মানুষের চেয়ে অনেক প্রাণীর শক্তি অনেক বেশি। অথচ সেই শক্তিশালী প্রাণীরা অনেকেই একসময়ে হাবিয়ে গেছে। তোমরা তো ডাইনোসোরের কথা জেনেছ। কিন্তু মানুষ আজও টিকে আছে। অন্যান্য প্রাণীদের থেকে মানুষ উন্নতিও করেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই টিকে থাকা ও উন্নতি কবা সম্ভব হলো কীভাবে? তার জন্য অনেকটা দায়ী মানুষেব সংস্কৃতি। সংস্কৃতি বলতে এমনিতে নাচ গান, প্রোশাক, শিল্প সাহিত্য বোঝায়। কিন্তু সংস্কৃতি কথাটাব





আরেকটা দিক রয়েছে। খাওয়া, ঘুম এসব মানুষের শবীরের দরকার হয় তার বাইরে নানান কাজকর্ম করে মানুষ। সেইসব কাজকর্মও কিন্তু মানুষের সংস্কৃতির অংশ। সেভাবে বললে আদিম মানুষেবও সংস্কৃতি ছিল পাথরের ভোঁতা হাতিয়াব বানানোও সেই সংস্কৃতির মধ্যেই পড়ে। সংস্কৃতিব জন্যই যে-কোনো পবিবেশে মানুষ নিজেদের মানিষে নিতে পেবেছে। শীত, বর্ষা ও গরম সব অবস্থাতেই টিকে থাকতে শিখেছে মানুষ। প্রকৃতি ও পরিবেশকে নিজের মতো করে ব্যবহার করতে পারে মানুষ। সেই ব্যবহার কবার পন্দতিগুলোও মানুষের সংস্কৃতিব ভেতরে পড়ে। বলা যেতে পারে, সবসময় সব সমাজেরই কোনো না কোনো সংস্কৃতি ছিল

যেমন ধবো, একসময় পৃথিবীতে খুব ঠান্ডা ছিল। অনেক পশু-পাথির মতো মানুষেবও সেই ঠান্ডায় কন্ত হতো। এক সময় ঠান্ডা থেকে বাঁচতে মানুষ গাছের ছাল গায়ে জড়াতে শুবু কবল। কখনওবা মবা পশুর চামড়াও পবত। এই যে ঠান্ডা থেকে বাঁচতে ছাল-চামড়া দিয়ে গা ঢাকার উপায় বের কবল মানুষ, সেটাই সংস্কৃতিব অংশ।

তবে, সংস্কৃতি থেকে সভ্যতা আলাদা ভারতীয় উপমহাদেশে নতুন পাথরের যুগে স্থায়ী বসতি দেখা গেল। তার সঙ্গে ধীরে ধীরে সভ্যতার নানা বৈশিষ্ট্যও ফুটে উঠলো মানুষের জীবনযাত্রায় আদিম মানুষের ইতিহাস সভ্যতার ইতিহাসের দিকে যেতে থাকল।



999

ভেবে দেখো

পুরোনো পাথবের যুগ থেকে নতুন পাথবের যুগ পর্যস্ত মানুষের জীবনযাত্রায় কোন কোন বিষয়গুলি জবুরি হয়ে উঠেছিল গ তার একটা ছবিসহ তালিকা বানাও





ভেবে দেখো



১। সঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো:

- ১.১) আদিম মানুষ প্রথমে (বালা করা খাবার/পোডা মাংস/কাঁচামাংস ও ফলমূল) খেত
- ১২) আদিম মানুষেব প্রথম হাতিয়ার ছিল (ভোঁতা পাথব/ হালকা ছুঁচালো পাথব/ পাথবেব কুঠাব)।
- ১৩) আদিম মানুষের জীবনে প্রথম জরুরি আবিষ্কার— (ধাতু/ চাকা/ আগুন)

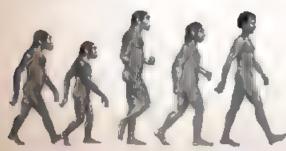
ক-ন্তন্তের সঞ্চো খ-ন্তন্ত মিলিয়ে লেখো :

কৃষিকাজ	মধ্যপ্রদেশ
<u> কান্ট্রবাতাশ</u>	নতুন পাথরের যুগ
ভীমবেটকা	মাঝের পাথরের যুগে
হুসগি	কৰ্ণটিক

৩। নিজের ভাষায় ভেবে লেখো (তিন/চার লাইন) :

- ৩.১) আদিম মানুষ যাযাবর ছিল কেন?
- ৩২) আগুনে জ্বালাতে শেখাব পর আদিম মানুষেব কী কী সুবিধা হয়েছিল?
- ৩.৩) আদিম মানুষ কেন জোট বেঁধেছিল? এব ফলে তার কী লাভ হয়েছিল?

৪। হাতেকলমে করো:



8.১) পাশের ছবিটিতে মানুষের প্রতিটি ধাপের মধ্যে কী কী বদল দেখতে পাওয়া যাচেছ?



২) পাশের ছবিদুটি থেকে
 আদিম মানুষেৰ পাথবের
 হাতিয়াব বানানোর পশ্বতি
 বিষয়ে কী জানা যাচছে?

S

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের ধারা

<mark>প্রথম পর্যায় : আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব</mark> ৭০০০-১৫০০ অব্দ

তিহাসে কি তাহলে শুধু পাথরেব কথাই থাকে? বিনিব একদম ভালো লাগে না। খালি নানাবকম পাথবেব হাতিয়ারেব কথা। বুবির দাদু একদিন বললেন, পাথব নিয়ে এত চিন্তা কীসের? পাথবেওতো লেখা থাকে ইতিহাসেব কথাই। তবে পাথুবে ইতিহাসই সব নয়। তাব সঙ্গো মিশে আছে মানুষেব জীবনও। সবাই এবাবে জমিয়ে বসল। দাদু আবাব ইতিহাসেব গল্প শুরু করলেন।

খাবারেব জন্যে হন্যে হয়ে ঘুবে বেডানো মানুষ একসময় স্থায়ীভাবে বাস কবতে শিখল নিজেদের খাদ্য নিজেরাই উৎপাদন করতে শিখল। শুরু করল কৃষিকাজ। তার পাশাপাশি পশুপালনও করতে লাগল। পাথরের যুগেব শেষদিকে স্থায়ী বসতবাড়ি, কৃষিকাজ এবং পশুপালনকে ঘিবেই গড়ে উঠেছিল মানুষেব জীবনযাত্রা। এভাবেই কালে কালে বদলে গেল মানুষের জীবনযাপনের নানা দিক



অবশ্য সেই বদল ঘটেছে মানুষের নিজের প্রয়োজনেই। নিজের বুন্ধি আর পরিশ্রমের জোরে সেই বদল ঘটিয়েছে মানুষ। সেভাবেই একসময় আদিম মানুষ হয়ে উঠেছে সভ্য। তবে আদিম থেকে সভ্য হওয়ার পথে মানুষকে অনেক ধাপ পেরোতে হয়েছে। যেমন, নতুন পাথরেব যুগে চাষের কাজে ব্যস্ত মানুষের দরকার হলো স্থায়ী বসতবাড়ি ও চাষেব জমি। সেই সময় চাষের জমিব পরিমাণ যেমন বাড়তে থাকে, তেমনি বাড়তে থাকে জমিব চাহিলা যে যার মতো জঙ্গল সাফ করে চাষের জমি বার করে নিতে থাকে। যার যত জমি তার তত ফসল। এভাবেই শুবু হলো জমিব জন্য লড়াই জোট বেঁধে বাস কবতে থাকা মানুষদেব নিজেদের মধ্যে একসময় মতের অমিল দেখা দিল। কিন্তু নিজেদের মধ্যে বিবাদ নিয়ে তো চলা যায় না তাই তারা নিজেদের বিবাদ নিজেরাই মিটিষে নিল ঠিক হলো সবাই নিষম মেনে চলবে। এভাবেই সেসময় চালু হলো নিয়ম বা নিয়মের শাসন।

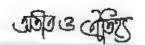
আন্তে আন্তে সভ্য মানুষেব নানা জিনিসের চাহিদা বাডল। তাছাডা প্রয়োজনমতো সব জিনিস কোনো একজন মানুষ তৈরি কবতে পারে না। তাই প্রথমে শুরু হলো জিনিস দিয়ে জিনিস নেওয়া। এবপর এল সেকালেব মুদ্রা। তার ফলে জিনিস কেনাবেচা করা সহজে হলো

সেই পাথরেব যুগ থেকে মানুষ জোট বাঁধতে শুবু করেছিল। পরে তৈবি করল সমাজ। সমাজে মানুষ নানা কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকত সেখানে কাজের বিচারে তৈরি হলো মানুষের নানা ভাগ। একসময় মানুষ লিখতে শিখল। আর তাব প্রয়োজনে এল বর্ণ বা লিপি। সেসময় মানুষ কেবল গ্রামেই নয়, নগরেও বাস কবত। এভাবেই গ্রাম ও নগবকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল সভ্যতা। আদিম মানুষের যুগ থেকে ইতিহাস এসে পড়ল সভ্যতার যুগে।

পবদিন ক্লাসে সবাই বুবিব দাদুব গল্প করল। দিদিমণি শুনলেন তাবপরে বললেন, সংস্কৃতি থেকে সভ্যতা খানিকটা আলাদা সব মানুষেবই কোনো না কোনো সংস্কৃতি থাকে। তা তোমবা আগেই জেনেছ। কিন্তু, সভ্যতাব কথা এলে বিষয়টা আব একটু আলাদা হয়ে যায় সভ্যতাব কতগুলো দিক থাকে সেইসব দিক মিলিয়ে তৈবি হয় একটা সভ্যতা। এবাবে দিদিমণি বোর্ডে একটা ছবি আঁকলেন। সবাই মন দিয়ে সেটা দেখল।

SALMS C

দিদিমণি বললেন, মানুষ নিজের খাদ্য নিজেরা উৎপাদন করতে শিখল।
এক জায়গায় স্থাযীভাবে বসবাসও শুরু কবল। কিন্তু সভ্যতা হতে গেলে
সেইসঙ্গে আবও কতগুলো বিষয়ও থাকতে হবে গ্রাম ও নগর থাকতে হবে
শাসনব্যবস্থা থাকতে হবে। শিল্প ও স্থাপত্যের নমুনা সভ্যতার একটা বড়ো
দিক। আব অবশ্যই লিপির ব্যবহার জানতে হবে সভ্য মানুষকে। লিপিমালার
ব্যবহারই সভ্যতার স্বথেকে বড়ো মাপকাঠি সভ্যতা বলতে একদিকে
জীবনযাপনের উন্নতি বোঝানো হয়। ধবো, যখন লিখতে শিখল মানুষ বা গুহার
বদলে বানাতে শিখল পাকা বাড়ি। আবার পাথরের বদলে ধাতুর ব্যবহার শিখল।



মনে রেখো

নতুন পাথবের যুগেব শেষেব দিকে চাকার ব্যবহার শুরু হয়। এইসবই এক একটা উন্নতির চিহ্ন এগুলো সবই সভ্যতার নানা দিক। আব এক একটা ভৌগোলিক অঞ্চলকে ঘিবে একেকটা সভ্যতা গড়ে উঠে। তাই মেহেবগড় সভ্যতা, হবপ্পা সভ্যতা এসব নামকবণ হয়েছে।

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে ভারতীয় উপমহাদেশে নগর সভ্যতা গড়ে উঠল।
আদিম গোষ্ঠী সমাজে সবাব মধ্যে একটা সমতার ধারণা ছিল। নগর সভ্যতায়
সেই সমতা আব থাকল না। শাসক গোষ্ঠী তৈবি হলো। যাবা গোটা জনসমাজকে
শাসন করত। আবাব একদল ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও যাগ-যজ্ঞ কবত। এভাবেই
সমাজে নানারকম ভেলাভেদ তৈরি হলো। এটাও সভ্যতার একটা বৈশিষ্ট্য।

আদিম গোষ্ঠী সমাজে রক্টের সম্পর্ক ও আখ্মীয়তার ভিত্তিতে জোট বাঁধত মানুষ। অন্যদিকে সভ্যতার একটি বৈশিষ্ট্য হলো একে অন্যের সঞ্চেগ সুযোগ-সুবিধার সম্পর্কে জোট বাঁধা। যেমন হরগ্গা সভ্যতার কথাই ধরা যাক। যে ব্যক্তি পুঁতি বানাত তার রোঞ্জেব যন্ত্রপাতি দবকার হতো। রোঞ্জের যন্ত্রপাতি বানাত রোঞ্জের কারিগব। আবার পাথর গবম করাব জন্য দবকার হতো পাত্র সেই পাত্র তৈবি কবত কুমোব। এভাবেই পুঁতি বানানোব কাবিগবকে রোঞ্জের কারিগর এবং কুমোরেব উপবে নির্ভব কবতে হতো। এই পাবস্পবিক নির্ভব করাটাই সভ্যতার বড়ো বৈশিষ্ট্য।

আবাব গ্রাম ও নগবের পাশাপাশি টিকে থাকাও সভ্যতাব জন্য জবুবি।
নগরের বাসিন্দাবা গ্রামের ফসলেব উপবেই নির্ভব করে থাকত।এভাবেই নগর
ও গ্রামকে ভিত্তি কবে ভারতীয় উপমহাদেশে গড়ে উঠেছিল হরপ্পা সভ্যতা।
তবে কোনো সভ্যতাই হঠাৎ গড়ে ওঠে না তার পিছনেও থাকে ইতিহাস।
এবারে আমবা ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীন সভ্যতার কথা জানব

৩.২ মেহেরগড়

নতুন পাথবেব যুগের কথা <mark>তোম</mark>রা আগেই জেনেছ। ভাবতীয় উপমহাদেশে নতুন পাথরেব যুগে মানুষেব জীবনযাপনে কতগুলি নতুন বিষয় যোগ হয়েছিল। একদিকে শুরু হয়েছিল কৃষিকাজ অন্যদিকে পাথরের পাশাপাশি ধাতুর ব্যবহার শুরু হয়েছিল। অবশ্য ধাতু বলতে তখন শুধু তামা ও কাঁসার ব্যবহারই বোঝাত। লোহার ব্যবহার তখনও জানা ছিল না। তামা ও পাথর দুটোবই ব্যবহার হতো বলে এই সময়কে তামা পাথরের যুগ বলা হয়।

এখনকাব পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশে মেহেরগড়ে তামা-পাথরের যুগের একটি প্রত্নকেন্দ্রের খোঁজ পাওয়া গেছে। মেহেরগড় বোলান গিরিপথের থেকে



খানিক দূবে অবস্থিত সেখানে মূলত একটি কৃষিনির্ভব সভ্যতাব নজিব পাওয়া যায়। সময়টা ছিল ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ। ফবাসি প্রত্নতাত্ত্বিক জাঁ ফ্রাঁসোয়া জারিজ মেহেরগড সভ্যতা আবিষ্কাব কবেন। এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য কবেন রিচার্ড মেডো।

খ্রিস্টপূর্ব ৭০০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দ পর্যন্ত মেহেরগড়ের সবথেকে পুবোনো পর্যায় ছিল বলে অনুমান কবা যায় ঐ পর্যায়ে সেখানকাব মানুষ গম ও যব ফলাতে জানত। ছাগল, ভেড়া ও কুঁজওলা ষাঁড ছিল তাদের গৃহপালিত পশু। পাথবের তৈরি জাঁতা ও শস্য পেষার যন্ত্র মেহেবগড়ে পাওয়া গেছে। পাথরেব ছুবি ও পশুব হাড়েব যন্ত্রপাতিও এই পর্যায়ে মেহেরগড়ের মানুষ বানাতে পারত। তবে কোনো ধাতুর তৈরি জিনিস এই সময় পাওয়া যায়নি

মেহেবগডেব মাটিব বাড়িগুলিতে রোদে পোডানো ইটের ব্যবহাবও দেখা যায়। বাড়িগুলিতে একের বেশি ঘর থাকত কয়েকটি ইমারত সাধারণ বাড়িব থেকে অনেক বড়ো। প্রত্নতাত্ত্বিকেবা অনুমান করেন সেগুলিতে শস্য মজুত বাখা হতো উপমহাদেশের সব থেকে পুরোনো শস্য মজুত রাখার বাড়ি মেহেরগডেই পাওয়া গেছে।

মেহেবগড় সভ্যতাব দ্বিতীয় পর্ব ধরা হয আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দ পর্যন্ত। গম ও যবের পাশাপাশি এই পর্বে কার্পাস চাষেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। এখনও অবধি পৃথিবীতে সবথেকে পুরোনো কার্পাস চাষেব নমুনা মেহেরগড়েই পাওয়া গেছে। মেহেবগড়ে পাওয়া পাথবেব কান্তে ভারতীয উপমহাদেশে কাস্তে ব্যবহারের সব থেকে পুরোনো নজির এই পর্যায়ে মেহেবগড়ে মাটিব পাত্র তৈবি হতো প্রথম দিকে পাত্রগুলি হাতে কবে তৈবি কবা হতো তখনও কুমোবের চাকার ব্যবহার শুবু হয়নি। এই পর্বের একেবারে শেষেব দিকে কুমোবের চাকার তৈবি মাটির পাত্র দেখা যায়। তাছাডা বিভিন্ন রকম পাথব ও শাঁখ দিয়ে গয়না তৈবি হতো। শাঁখ ও পাথবগুলি মেহেবগড়ে বাইরে থেকে আসত

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৪৩০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৩৮০০ অব্দ পর্যন্ত মেহেবগড় সভ্যতার তৃতীয় পর্ব ধরা হয় এই সময় নানাবকম গম এবং যব চাষ কবা হতো। কুমোরের চাকায় মাটির পাত্র বানানোব কৌশল এই পর্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। পাত্রগুলি চুল্লিতে পুড়িয়ে সেগুলির গায়ে নানাবকম নকশা ও ছবি আঁকা হতো। সেখানে একরঙা, দুইরঙা ও বহুরঙা মাটিব পাত্র পাওয়া গেছে।

বসতি হিসেবেও মেহেবগড়েব আযতন বেড়েছিল। এই পর্যায়ে নিয়মিত ভাবে তামাব ব্যবহার শুরু হয়েছিল। তবে আকরিক থেকে ব্যবহারের জন্য তামা



ছবি ৩.১ : মেহেরগড়ে পাওয়া নাবীমূর্তি

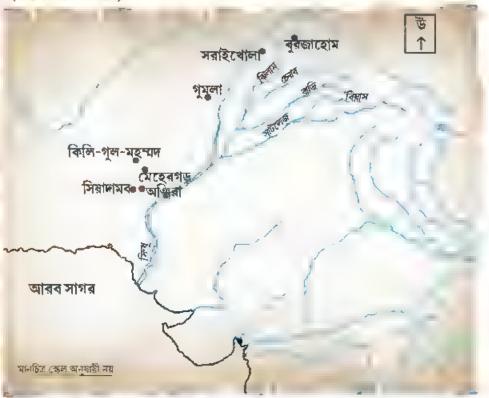
प्रेकासा वन्या

মেহেরগড়ের সমাধি মেহেরগড সভাতাব অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো সমাধিক্ষেত্ৰ। সমাধিতে মৃতদেহ সোজাসুজি বা কাত করে শৃইয়ে দেওয়া হতো। মৃতেব সঙ্গে দেওয়া হতো নানা জিনিসপত্র যেমন-শাঁখ বা পাথবের গয়না, কড়ল প্রভৃতি এছাডা সমাধিতে দেওয়া হতো নানা গৃহপালিত পশ্ও সমাধিতে মূল্যবান পাথবও পাওয়া গেছে মৃতদেহকে লাল কাপড জড়িয়ে, লাল বং মাখিয়ে সমাধি দেওয়া হতো ৷

বার করা সহজ ছিল না। ফলে পাথরের তৈরি জিনিসপত্রের ব্যবহারও জাবি ছিল। এই সময়ে মেহেরগড়ে সিলমোহরেব ব্যবহার শুরু হয়েছিল। সব মিলিয়ে গ্রামীণ কৃষিসমাজ আরও জটিল রুপ নিচ্ছিল মেহেরগড়ে সেই বদলের চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যায়। সেই বদলের চিহ্নগুলো আবও স্পষ্ট হয়ে উঠল হরপ্লা সভ্যতায়



মানচিত্র ৩ ১ : ভারতীয় উপমহাদেশে নতুন পাথবের যুগের গ্রামীণ বসতির প্রথম ধাপ (উত্তর-পশ্চিম ভাগ)





৩.৩ হরপ্পা সভ্যতার কথা

১৯২১ খ্রিস্টাব্দে হবপ্পা ও ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে মহেনজোদাড়ো কেন্দ্র দৃটি আবিষ্কাব করা হয ঐ দৃটি কেন্দ্রই সিন্দু উপত্যকায় অবস্থিত। তাই শুরুতে এই সভাতাব নাম হয়েছিল সিন্দু সভাতা। কিন্তু পরে সিন্দু উপত্যকার বাইবেও এই সভ্যতার অনেক কেন্দ্রেব খোঁজ মিলেছে। সেই সবকটা কেন্দ্রকেই সিন্দু উপত্যকাব কেন্দ্র বলাব যুক্তি নেই। ফলে হরপ্পাব নামেই ওই সভ্যতার নাম হয় হবপ্পা সভ্যতা। কাবণ সেখানেই ঐ সভ্যতার প্রথম কেন্দ্রটি আবিষ্কৃত হয়েছিল। তাছাডা হরপ্পা ছিল ওই সভ্যতার সবথেকে বডো কেন্দ্র।

*টুফা*স্ত্রে ফথা হরপ্পা আবিষ্কারের কথা

সময়টা ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দ। তখনকার পাঞ্জাব প্রদেশের সাহিওয়াল জেলায় গেছিলেন চার্লস ম্যাসন। ম্যাসনেব ধারণা ছিল ওখানেই খ্রিস্ট পূর্ব চতুর্থ শতকে-আলেকজাভারের সঙ্গে পুরুর যুখ হয়েছিল কিন্তু তখনও ঐ অঞ্চলেব আসল গুবুত্ব কেউ জানতেন না। ১৮৫০

খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আলেকজান্ডার কানিংহাম ঐ অঞ্চলে যা<mark>ন প্রত্নতত্ত্বে তাঁব উৎসাহ ছিল। তিনি ঐ অঞ্চলে</mark> খোঁডাখুডি কবে কিছু জিনিসপত্র পেয়েছিলেন। তবু তখনও হবগ্গা সভাতার বিষয়ে কিছু জানা যায়নি

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ভাবতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান হিসাবে আবাব কানিংহাম হবপ্পায় যান। গিয়ে দেখেন সেখানকার ইট রেললাইন বানানোর কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। সেখান থেকে কানিংহাম বেশ কিছু পাত্র পান। আর পান কয়েকটি সিলমোহর। তাতে খোদাই কবা ছিল অজানা হরফের লেখা। কানিংহাম এবারেও হরপ্পার আসল গুরুত্ব বুঝতে পারেননি

বিংশ শতকেব গোডার দিকে হবপ্পার বিষয়ে বিশেষ উৎসাহ ছিল না। শেষপর্যন্ত ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে দয়াবাম
সাহানি হবপ্পায় খোঁড়াখুড়ি শুবু কবেন তাব পবেব বছর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহেনজোদাড়োতেও
খননকাজ শুবু কবেন ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে জন মার্শাল হরপ্পা ও মহেনজোদাডো বিষয়ে বিস্তারিত বিববণ
পেশ কবেন। ম্যাসনেব সময় থেকে ধবলে তখন প্রায় একশো বছর পেরিয়ে গেছে। প্রাচীন ভাবতেব
ইতিহাস নতুন করে লেখা শুবু হয় তারপর থেকেই

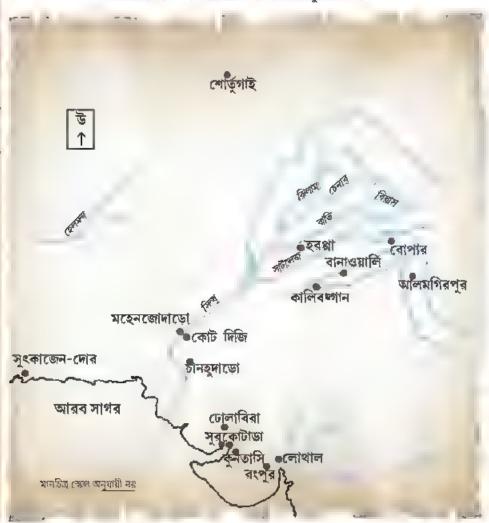
হরপ্পা সভ্যতা প্রায়-ইতিহাস যুগের সভ্যতা। কাবণ হরপ্পাব লোকেবা লিখতে জানত। কিন্তু, সেই লেখা আজও পড়া যায়নি । তাই প্রত্নবস্তুর উপর ভিত্তি করেই হরপ্পা সভ্যতার ইতিহাস জানতে হয়। এই সভ্যতার মানুষ তামা ও ব্রোঞ্জ ধাতুর ব্যবহার জানত। সেজন্য একে তামা ও ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতাও বলা হয়। তামা-ব্রোঞ্জ যুগেব সভ্যতাগুলির মধ্যে হরপ্পা সভ্যতাই সবথেকে বড়ো। খ্রিস্টপূর্ব ২৬০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৮০০ অব্দ পর্যন্ত হবপ্পা সভ্যতার উন্নতির সময়। তবে মোটামুটিভাবে খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ পর্যন্ত এই সভ্যতাব সমষকাল ধবা যায়



হরপ্পা সভ্যতার বিস্তার

হবপ্পা সভ্যতা কতদূব পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল ? সাধারণ ভাবে বলা যায় জন্মুব মাণ্ডা ভারতীয় উপমহাদেশে এই সভ্যতাব উত্তর সীমা তবে তারও উত্তবে আফগানিস্তানের একটি প্রত্মক্ষেত্রেও হবপ্পা সভ্যতাব অনেক লক্ষণ দেখা গেছে। দক্ষিণে গুজরাট ও কচ্ছ অঞ্চলে হরপ্পা সভ্যতা ছড়িয়ে পড়েছিল তবে আবও দক্ষিণে মহারাষ্ট্রেব দৈমাবাদ অঞ্চলেও এই সভ্যতাব ছাপ দেখা যায়। হবপ্পা সভ্যতাব পশ্চিম সীমা বর্তমান পাকিস্তানেব বালুচিস্তান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। সেখানে দুটি গুবুত্বপূর্ণ প্রত্মক্ষেত্র আবিষ্কার কবা হয়েছে। পূর্ব দিকে হবপ্পা সভ্যতাব চিহ্ন পাওয়া গেছে আলমগিরপুর পর্যন্ত। এই অঞ্চলটা দিল্লিব পূর্বদিকে। প্রায় সাত লক্ষ বর্গ কিলোমিটাব জুড়ে ছড়িয়ে ছিল হবপ্পা সভ্যতা।

মানচিত্র ৩.২ : হরপ্পা সভ্যতার কতগুলি কেন্দ্র





নগর পরিকল্পনা

ভারতীয় উপমহাদেশে হরপ্পা সভ্যতাতেই প্রথম নগব গড়ে উঠেছিল।
তাই একে প্রথম নগরায়ণ বলা হয়। মহেনজোদাড়ো ও হবপ্পা ছিল
সবচেয়ে বড়ো দুটো নগর। সে তুলনায় লোথাল ও কালিবঙ্গান ছিল
ছোটো। হয়তো হরপ্পা সভ্যতায় নগরগুলোব ক্ষেত্রে ছোটো-বড়ো
তফাত ছিল। গুরুত্বের দিক থেকে সমস্ত নগর সমান ছিল না।

হরপ্পার নগরগুলিতে বসতি অঞ্চল দুটি স্পষ্ট ও আলাদা এলাকায় ভাগ কবা ছিল শহবে একটি উঁচু এলাকা থাকত। প্রত্নতাত্ত্বিকবা তাকে বলেন সিটাডেল। এই এলাকাটি একটা বানানো ঢিবির ওপব অবস্থিত ছিল। সাধাবণত ঢিবিটি আয়তাকার হতো উঁচু এলাকায় বানানো হতো জরুরি ইমারত। সেগুলি সচবাচর সাধাবণ মানুষের থাকাব বাড়ি হতো না। নগবেব প্রধান বসতি এলাকাটা নীচু অঞ্চলে থাকত। ঐ অঞ্চলে ইমাবতগুলির মধ্যে বেশিবভাগই বসত বাড়ি। উঁচু এলাকাটি প্রায়শই নগরেব উত্তর বা উত্তর-পশ্চিম দিকে থাকত। নীচু বসতি এলাকাটা থাকত পূর্ব বা দক্ষিণ-পূর্ব অংশে। একমাত্র চানহুদাডোতে কোনো সিটাডেল ছিল না।

সিটাডেল এলাকাটা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা থাকত। হরপ্পায় নগরের উত্তর ও পশ্চিম দিকে দুটি ঢোকা ও বেবোনোর ফটক ছিল মহেনজোদাডোতে উঁচু এলাকায় একটি বড়ো জলাধার ছিল। সেটি পাকা পোডানো ইটের তৈবি বোধহয় স্নান করার জন্য এটি ব্যবহার করা হতো। আয়তাকার জলাধাবটিতে ওঠানামার জন্য সিঁডিব ধাপও ছিল জলাধাবটিব কাছাকাছি কয়েকটি ছোটো ঘরও দেখা যায়। জলাধারটি সম্ভবত নগরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ব্যবহার কবতেন।

হরপ্পা সভ্যতার নগর জীবনে খাদ্যশস্য মজুত রাখার বিশেষ গুরুত্ব ছিল।
মহেনজোদাড়ো ও হবপ্পায় খাদ্যশস্য মজুত বাখাব জন্য দুটি বড়ো জায়গা ছিল।
সেগুলি অনেকটা পাকা ইটেব তৈবি বাড়িব মতো হবপ্পায় শস্য রাখার বাড়িটির ভেতরে ছিল দুই সারিতে ভাগ করা মোট বারোটা বড়ো তাক। সেখানে হাওয়া চলাচলের জন্য ঘুলঘুলিও ছিল ফলে খাদ্যশস্য শুকনো ও তাজা রাখা সম্ভব হতো। তাছাডা শস্য ঝাড়াই বাছাইয়ের ব্যবস্থাও ছিল। সেখানে দুই সারি ছোটো বাড়িও দেখা যায় সম্ভবত ওখানে কাজ করত যারা তাবা ওই বাড়িতে থাকত।

মহেনজোদাড়োর উঁচু এলাকায় আরেকটি বিশাল ইমারত পাওয়া গেছে। মনে কবা হয় সেটি সাধারণ থাকাব বাড়ি নয়। এই ইমাবতটি সম্ভবত বড়ো

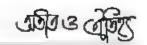
হরপ্পা সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র হরপ্পা সভ্যতা অনেকগৃলি কেন্দ্র নিযে গড়ে উঠেছিল। কয়েকটিব নাম এখানে দেওয়া হলো

ELESIED

???

ভেবে দেখো

এব আগে তোমবা
পাথবের যুগের মানুষের;
ইতিহাস পড়েছ। তেমনি
জেনেছ মেহেরগড়ের
ইতিহাস। আর এখন
জানছ হরগ্গা সভ্যতা।
ভাবোতো কীভাবে মানুষ
ধাপে ধাপে পাথব থেকে
নানা ধাতুর ব্যবহার
শিখেছিল?



999

ভেবে দেখো

হরপ্পা সভাতায় শস্য মজুত বাখাব ব্যবস্থা কেন ছিল? আজও কি তোমরা শস্য , খাবার মজুত রাখার জায়গা দেখতে পাও?

प्रेकाखा यथा

মহেনজোদাড়োর স্নানাগার

স্থানাগার হলো স্থান কবাব জায়গা। এমনই একটি স্নানাগারের খোঁজ পাওয়া গেছে মহেনজো দাডোতে। সেটি লম্বায় ১৮০ ফুট ও চওভায ১০৮ ফট তাব চাবি দিকে ৮ ফুট উঁচু ইটেব দেয়াল দিয়ে ঘেবা এব মাঝামাঝি অংশে একটি বড়ো জলাশয় ছিল। জলাশয়টিতে বাইরেব জল ঢোকা বন্ধ করা হয়েছিল। আবাব অতিবিক্ত জল বাব করে দেওয়াও যেত জল পরিষ্কার ক্রার ব্যবস্থাও ছিল

ছবি ৩ ৩: মহেনজোদাড়োর স্লানাগাব কোনো উৎসবে জমায়েত হওয়াব জন্য ব্যবহাব হতো। ঢোলাবিবা নগবেব সিটাডেল এলাকায় একটি জলাধাবও দেখা যায়।

নগরেব নীচু এলাকায় থাকত মূল বসতি । বাডিগুলির নানারকম আকার দেখা যায় মহেনজোদাড়োতে প্রায় ৩০০ বর্গ মিটাব আয়তনেব একটি বাড়ি পাওয়া গেছে। তাতে সাতাশটা ঘর ও একটি আঙিনা ছিল। আবেকটা বড়ো বাডিতে উপবে ওঠার সিঁড়ি ভাঙা অবস্থায় পাওয়া গেছে। ঐ বাডিটিব হয়তো অনেকগুলি তলা ছিল। ঐ ধবনেব বড়ো বাডিতে ধনী মানুষেবাই থাকতেন বলে মনে কবা হয়।

বসত বাডিগুলিতে বেশ কিছু ঘর থাকলেও বান্নাঘর থাকত একটি মনে কবা হয় ঐ বাড়ির বাসিন্দাদের একটিই হেঁসেল ছিল। হয়তো হরপ্পা সভ্যতায় যৌথ পরিবার ছিল। ছোটো বাড়িগুলি দেখে মনে হয় সেগুলিতে গরিব মানুষেরা থাকতেন। এর থেকে হরপ্পার নগর জীবনে ধনী-গরিব ভেদাভেদ ছিল বলে অনুমান করা হয়

হবপ্পা সভ্যতার নগব জীবনে আরেকটি গুবুত্বপূর্ণ দিক ছিল শৌচাগাব ও স্নানাগার। এর থেকে মনে হয় নগবগুলি সাধাবণভাবে পবিষ্কাব ছিল। মহেনজোদাড়োর নীচু এলাকায় প্রায় দু-হাজার বাড়ির জন্য অন্তত সাতাশটা কুয়ো ছিল হরপ্পায় অত কুযো না থাকলেও, প্রতিটি বাড়িতে শৌচাগার ছিল। পাকা নর্দমা দিয়ে জল নিকাশি ব্যবস্থাও ছিল। বড়ো নর্দমাগুলি ঢাকা থাকত। প্রতিটি বাড়ি থেকে ছোটো নালা গিয়ে মিশত বড়ো নর্দমাগুলোয়। উন্নত নগর শাসনের নমুনা ছিল এই জল নিকাশি ব্যবস্থা





শহরের নীচু এলাকায় যাতায়াতের উপযোগী সড়ক ছিল। মহেনজোদাডো ও হরপ্পায় বেশ কয়েকটি চওডা, পাকা রাস্তা দেখা গেছে। ওই রাস্তাগুলি সাধারণত উত্তর-দক্ষিণ দিকে গিয়েছে। তুলনায় কম চওডা রাস্তা ও সরু গলিগুলো ছিল পূর্ব-পশ্চিমে। পথঘাটের এরকম পরিকল্পনার জন্য নগরের নকশাগুলো হতো চৌকো আকারের। মনে হয় হরপ্পা সভাতার নগর জীবনের মান ছিল খুব উঁচু। সেই মান ধরে বাখার জন্য নিশ্চয়ই দক্ষ ও শক্তিশালী শাসন ব্যবস্থার দরকাব হতো। নগরের উঁচু অংশে সম্ভবত প্রশাসকরা থাকতেন।



বাণিজ্যের উন্নতির কারণে হবপ্পার নগরগুলিতে হযতো বণিকদেব বিশেষ
মর্যাদা ছিল। তাবপরে ছিল বিভিন্ন কারিগর ও পেশাব মানুষ। মনে হয় এই
সমাজে মজুব ও শ্রমিকদেব অবস্থা বেশ খারাপ ছিল। তবে এবা সবাই নগবেই
বাস কবত। নগবেব বাইরে গ্রামীণ এলাকায় থাকত কৃষিজীবী মানুষ। নগবে
সরাসরি খাদ্য উৎপাদন হতো না। খাদ্যশস্যেব জন্য নগরবাসীদের গ্রামের ওপরেই
নির্ভব করতে হতো। গ্রামে নানারকম ফসলের চাষ হতো। যেমন, গম, যব,
জোষার, বাজবা, নানাবকম ভাল, সবষে এবং ধান তবে ধানেব ফলন সব
জায়গায় হতো না। শুধু গুজরাটের রংপুর ও লোথালেই ধানের চিহ্ন পাওয়া
গেছে। তাছাড়া তুলো, তিল প্রভৃতি ফসলেবও চাষ হতো। রাজস্থানেব
কালিবঙ্গানে একটি ক্ষেতে কাঠেব লাঙলের ফলাব দাগও পাওয়া গেছে।

কৃষির সঙ্গে সবাসবি যুক্ত ছিল পশুপালন। হবপ্পাব মানুষ গৃহপালিত পশুব ব্যবহার জানত সবচেয়ে গুবুত্বপূর্ণ ছিল গবাদি পশু। ষাঁড়, ভেডা ও ছাগলেব ব্যবহাব হতো। উটেব ব্যবহাবও হবপ্পাব লোকেরা জানত তবে ঘোডাব ব্যবহাব



ऐकाखा कथा

হরপ্পা সভ্যতার শাসক

মহেনজোদাডোয় একটা পুরুষের মূর্তি পাওয়া গেছে৷ তার চুল আঁচভানো, 211(01 চাপদাভি চোখ আধবোজা। কপালে ও <mark>তান বাহুতে একটা করে</mark> পাথর বসানো পটি বাঁধা। মৃতিটাব বাঁ-কাঁধ থেকে একটা চাদব ঝুলছে। এই মূর্তিটা কাব তা নিয়ে ধাঁধা আছে বাজাব না পুরোহিতেব? নাকি একজন পুরোহিত-বাজাব মূর্তি? হরপ্লায় বডো বাডি ছিল। তবে সেগুলো কি বাজপ্রাসাদ ছিল? তাহলে হবপ্পাব শাসন কারা চালাতেন ? বাজা, পুবোহিত বাজা নাকি বণিকরা? এসব প্রশ্নেব নিশ্চিত সমাধান এখনও হয়নি।



হবপ্পাব মানুষ জানত না। এছাড়াও ছিল ঘুরে বেড়ানো পশুপালক গোষ্ঠী। এইসব মিলিয়ে হবপ্পা সভ্যতার সমাজ গড়ে উঠেছিল।

মূর্তি গুলি দেখে হবপ্পার মানুষদেব পোশাক, গযনা ও সাজগোজ সম্পর্কে আন্দাজ কবা যায়। তাবা সূতি ও পশমেব বস্ত্র ব্যবহার করত। হবপ্পা সভ্যতাব নানা জায়গায় অনেক সোনা, বুপো, তামা ও হাতির দাঁতেব গয়না পাওয়া গেছে।

কারিগরি শিল্প

হরপ্পা সভাতার অর্থনীতির অন্যতম জরুরি দিক ছিল কারিগবি শিল্প। পাথব ও ধাতৃ — দুটোরই ব্যবহার হতো কারিগরি শিল্পে। ধাতৃর মধ্যে তামা, কাঁসা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার হতো লোহার ব্যবহার হরপ্পার মানুষ জানত না। এই সভ্যতায় তামা ও কাঁসার তৈরি ছুরি, কুঠার, বাটালি প্রভৃতি পাওয়া গিয়েছে। তাছাডা মাটি ও ধাতৃর বাসনপত্রও বানানো হতো। পাথরের ছুবি তৈবির কারখানাও হরপ্পা সভ্যতায় ছিল।

হরপ্পা সভ্যতার নানাবকম মাটিব পাত্র ছিল কাবিগবির উন্নতির নজির। বেশিবভাগ পাত্র সাদামাটা, রোজকার ব্যবহারেব জন্য। পোড়ানোব ফলে সেগুলি লালচে রঙের হযে উঠেছিল। কিছু পাত্রেব গাযে চকচকে লাল পালিশ লাগানো হতো। সেগুলিব গায়ে উজ্জ্বল কালো রঙের নকশাও আঁকা হতো। ঐ পাত্রগুলিকে প্রত্নতাত্ত্বিকেবা লাল–কালো মাটির পাত্র বলেন। তুলনায় হালকা ও পাতলা ঐ মাটিব পাত্রগুলি বোজগার কাজে ব্যবহার হতো না। মাটি দিয়ে থালা, বাটি, রানার বাসন, জালা জাতীয় পাত্র হরপ্পা সভ্যতায় তৈবি হতো।

হবপ্পা সভ্যতায় কাপড় বোনার কাবিগবিও ছিল। মহেনজোদাড়োতে পুবোনো কাপড় বানানোব নজিব পাওয়া গেছে। কাপডে সুতোব কাজ কবার শিল্পও হরপ্পা সভ্যতায় দেখা যায়। মহেনজোদাড়ো থেকে পাওযা পুবুষ মূর্তিটির গায়ের পোশাকে তারই নমুনা রয়েছে।

ইট বানানোব শিল্প এই সভ্যতাব একটি গুরুত্বপূর্ণ কাবিগরি দিক। কাদামাটির ইট ও চুল্লিতে পোডানো পাকা ইট — দুয়েবই ব্যবহাব দেখা যায়। তবে চুল্লিতে পোডানো পাকা ইট সম্ভবত জবুরি ইমাবত বানানোব ক্ষেত্রে ব্যবহার হতো।

হরপ্পা সভ্যতার কাবিগরি শিল্পের অন্যতম নমুনা অনেকবকম মালার দানা।
সেকাজে সোনা, তামা, শাঁখ, দামি-কমদামি পাথর, হাতির দাঁত প্রভৃতির ব্যবহার
হতো। নীলচে লাপিস লাজুলি পাথরও গয়না বানাতে লাগত। মালার দানা
বানানোর কারখানাও হরপ্পা সভ্যতায় পাওয়া গেছে। সৃক্ষ্ ওজন মাপার
বাটখাবারও খোঁজ মিলেছে

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহামের ধারা





ছবি ৩৬: হরপ্পা সভ্যতায় পাওয়া ব্রোঞ্জের নারী মূর্ডি

হরপ্পা সভ্যতাতেই প্রথম পাথর ও ধাতুর ভাস্কর্যের নমুনা দেখা যায়। পাশাপাশি পোড়ামাটির ভাস্কর্যেবও নজির রযেছে। একটি ব্রোঞ্জেব তৈরি নারী মুর্তি পাওয়া গিয়েছে মহেনজোদাড়ো থেকে শিল্পেব দিক থেকে সেটি খুবই গুরুত্বপুর্ণ। ব্রোঞ্জের তৈবি কয়েকটি পশু-মূর্তিও হরপ্পা সভ্যতায় পাওয়া গিয়েছে। তবে পোডামাটির তৈরি মূর্তি সংখ্যায় অনেক বেশি। নারী মূর্তি, পশু ও পাখির মূর্তি তৈরিতে পোড়ামাটির ব্যবহাব হতো। পোড়ামাটির তৈরি বানবের মূর্তিও পাওয়া গিয়েছে সেগুলি সম্ভবত খেলনা ছিল

কিস্তু এতবকম কারিগরি শিল্পেব জন্য দবকাবি কাঁচামাল কোথা থেকে পাওয়া যেত ? সমস্ত কাঁচামাল অবশ্যই হবপ্পা সভ্যতায় পাওয়া যেত না। বিভিন্ন এলাকা থেকে নানারকম কাঁচামাল নিয়ে আসা হতো। কাঁচামাল আনানেই ছিল হবপ্পা সভ্যতাব ব্যবসাবাণিজ্যেব অন্যতম প্রধান দিক সেই কাজে হবপ্পা সভ্যতাব সিলমোহরগুলিও অবশ্যই ব্যবহাব হতো। এই সভ্যতাব ইতিহাস জানার জন্য এই সিলমোহরগুলি খুবই গুবুত্বপূর্ণ

টুকরো কথা হরপ্পা সভ্যতার সিলমোহর

<mark>হবপ্পা সভ্যতায় প্রত্নতাত্ত্বিকরা অনেক সিলমোহব পেয়েছেন। সিলমোহবগুলিতে</mark> <mark>নানা লিপি ও প্রতীকচিহ্ন খোদাই করা হতো। বেশিরভাগ হরঞ্চীয় সিলুমোহর</mark> <u>একধরনের নরম পাথব কেটে তৈরি। বেশিরভাগ সিলমোহরে একটা উলটো</u> <mark>নকশা খোদাই কবা হতো। নকশাটি সাধারণত কোনো না কোনো জীবজন্তুর।</mark> তার সঙ্গে একসারি লিপি খোদাই করা থাকত ভিজে কাদামাটিতে ঐ <mark>সিলমো</mark>হবটাব ছাপ দিলে তা সোজা হয়ে পড়ত সিলগুলো বানাবাব পবে



ছবি. ৩.৭[·] হরপ্পা সভ্যতায় পাওয়া একটি সিলমোহর

<mark>সেগুলো</mark>তে একবকমের সাদা জিনিস মাখানো হতো। তাবপরে সেগুলো পোড়ানো হতো। ফলে খুব<mark>ই শস্ত</mark> <mark>হযে যে</mark>ত সিলগুলি। বেশিবভাগ সিলমোহরে একশিংওলা একটি কল্পিত প্রাণীব ছাপ দেখা যায়। <mark>তাছাড</mark>া <mark>অন্যান্য ছাপও সিলমোহবে আছে। শিংওলা মানুষ,ষাঁড, গাছ ও জ্যামিতিক নকশা খোদাই করা সিলমোহর</mark> পাওষা গেছে। সিলমোহবগুলি থেকে হবপ্পার অর্থনীতি ও ধর্মবিশ্বাস বিষয়ে অনেক কিছু জানা যায়

হরপ্পার বাণিজ্য

হবপ্পা সভ্যতার তেইশটা সিলমোহর পাওয়া গেছে মেসোপটেমিয়ায়। এর থেকে বোঝা যায় এই দুই সভাতার মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন ছিল । মেসোপটেমিয়াতে সম্ভবত হরপ্পাব বণিকরা পাকাপাকি বসতিও গডে তুলেছিল। মেসোপটেমিয়াতে একটি সিলমোহরে খোদাই কবা লিপি পাওয়া গেছে। সেটা পড়ে თ



्रेयाखा यथा

বন্দর নগর : লোথাল গুজরাটি ভাষায় লোথ ও থল থেকে লোখাল এর মানে মৃতের স্থান গুজরাটেব ভোগাবোব নদীব তীরে ছিল হরপ্পা সভ্যতাব বন্দর নগর এখানে লোখাল। পাওয়া যায় জাহাজঘাটা ও সমাধিক্ষেত্রের নমুনা সম্ভবত সেখানে জাহাজ রাখার, বানাবার ও মেৱামতির বন্দোবস্ত ছিল লোখালে বোতাম আকারের সিলমোহব পাওয়া গেছে সম্ভবত পারসা উপসাগরীয় অঞ্জলের সভেগ এব বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল এখানে নারীমূর্তি, দাবার ঘূঁটিব মতো ঘূঁটি, খেলনা গাড়ি পাওয়া গেছে তাছাডা পাওয়া গেছে নানা গয়নাও গুজরাটের উপকৃল অঞ্জলে হওয়ার জন্য লোখাল সমুদ্র বাণিজ্যে অংশ নিতবলে মনে হয়

জানা যায় হরপ্পা সভ্যতাব সংক্ষা জলপথে মেসোপটেমিয়াব বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। হরপ্পা সভ্যতার আমলে পারস্য উপসাগরীয় এলাকার সমুদ্রবাণিজ্য গুবুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এমনকি বিভিন্ন অঞ্চলেব ভাষা জানা দোভাষীদেরও গুরুত্ব বেড়েছিল। সম্ভবত বিদেশ থেকে হরপ্পা সভ্যতায আমদানি করা হতো সোনা, রুপো, তামা, দামি পাথর, হাতির দাঁতের তৈরি চিবুনি, পাখির মূর্তি প্রভৃতি আব রফতানি করা হতো বার্লি, ময়দা, তেল ও পশমজাত দ্রব্য।



তবে শুধু জলপথেই নয়, স্থলপথেও হরপ্পার বাণিজ্য চলত ইরানে হরপ্পা সভ্যতাব সিলমোহব পাওয়া গিয়েছে আবাব এখনকার তুর্কমেনিস্তানে হরপ্পায় তৈরি শিল্পদ্রব্যেব খোঁজ মিলেছে এইসব আমদানি-রফতানি স্থলপথের মাধ্যমেই হতো।

হরপ্পা সভ্যতায় যোগাযোগ ব্যবস্থার বিভিন্ন উপায় ছিল। ভারবাহী পশু, গাডি, নৌকা ও জাহাজেব ব্যবহাব হতো। স্থলপথ ও জলপথে রোজকার যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। বলদ, গাধা ও উটের ব্যবহাব হতো হরপ্পা সভ্যতায়। তবে গাধা ও উট সম্ভবত ভাবতীয় উপমহাদেশের বাইরে থেকে আনা হয়েছিল। গাড়ি টানাব কাজে বলদের ব্যবহার হতো বেশি হরপ্পায় অনেক গাডির আদলে বানানো কাদামাটির খেলনা গাডি পাওয়া গেছে। সেগুলিতে চাকার ব্যবহাবও আছে। বেশিবভাগ গাড়ি ছিল দু-চাকার। চাকাগুলি বেশ শন্ত। গোল করে কাটা তিনটি সমান মাপের তক্তা দিয়ে সেগুলি তৈরি। আবাব ক্ষেকটি ছোটো গাড়িও পাওয়া গেছে। সেগুলিতে অনেক চাকা লাগানো।

হবপ্পাব রাস্তায় গাড়িব চাকাব গভীর ছাপ পাওয়া গেছে। তার থেকে বোঝা যায় গাড়ির কাঠামোগুলো নেহাত ছোটো ছিল না। হবপ্পাব অনেক রাস্তাই এবড়ো-খেবড়ো ছিল বলদে টানা গাড়িগুলি উঁচু-নীচু রাস্তায় সহজেই চলতে পারত।

তবে গাড়ির থেকে নৌকায় যাতায়াতে সময় কম লাগত পশুতে টানা গাড়ি চলত খুব আস্তে। তার উপর পশুদের খাওয়াতে খরচ হতো। ববং নদীর

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহামের ধারা

李\$ 13075133

স্রোত ও হাওয়ার সাহায্যে সহজেই নৌকা চলতে পারত। কাজেই জলপথে যাতায়াত অনেক সস্তা ছিল। মহেনজোদাড়োর সিলমোহরে নৌকার ছবি খোদাই করা আছে। পালতোলা নৌকার ব্যবহার হরপ্পা সভ্যতায় ছিল। হরপ্পার অর্থনীতি ও যাতায়াত ব্যবস্থা অনেকটাই নদীর উপর নির্ভর করত।

হরপ্লার ধর্ম

প্রত্নতাত্ত্বিকেরা হরপ্পার বিভিন্ন কেন্দ্রে অনেক পোড়ামাটির নারীমূর্তি পেয়েছেন।
তার থেকে মনে কবা হয় ঐ মূর্তিগুলির পুজো হতো। অর্থাৎ হবপ্পা সভ্যতায়
মাতৃপুজোর চল ছিল বলে মনে হয় মহেনজোদাডোতে একটি সিলমোহর
পাওয়া গিয়েছে। সেটিতে এক যোগীর মূর্তি খোদাই করা আছে। ঐ যোগী
জোড়াসনে বসে আছে। তার চাবপাশে বয়েছে গন্ডার, বাঘ, হাতি ইত্যাদি বেশ
কিছু বন্যপ্রাণী একসময় ওই মূর্তিটিকে পশুপতি শিবেব আদি রূপ বলে মনে
কবা হতো কিন্তু পশু শব্দে গৃহপালিত প্রাণী বোঝায় অথচ ওই মূর্তির চাবপাশে
সবই বন্যপ্রাণী দেখা যায়। সেকাবণে ওই মূর্তিটাকে পশুপতি শিবের আদিরূপ
মনে করার যুক্তি নেই।

হরপ্পার মানুষ নানাবকম জীবজন্তু ও গাছপালার পুজো করত একশিংওলা কাল্পনিক পশুর মূর্তির পুজো খুব বেশি হতো। হরপ্পার সিলমোহরে যাঁড়ের ছাপ থেকে মনে হয় যাঁড়ের পুজোও হতো। কিন্তু সিলমোহরে কখনোই গোরুব মূর্তি দেখা যায় না। অশ্বত্ম গাছ ও পাতার ছবি সিলমোহর ও মাটির পাত্রে দেখা যায়। অশ্বত্ম গাছকে দেবতা হিসেবে পুজো করা হতো বলে মনে হয়। ধর্মীয় কাজে জলের ব্যবহার হতো হয়তো মহেনজোদাড়োব জলাশয়টি ধর্মীয় কাজে

হবপ্পা সভ্যতায় মৃতদেহ সমাধি দেওয়া হতো। মৃতদেহব মাথা উত্তর দিকে করে শুইয়ে বাখা হতো। সমাধিব ভিতরে গয়না ও মাটির পাত্র বাখা হতো। কালিবঙ্গানে ইটেব তৈবি সমাধিও দেখা যায়।

হরপ্পা সভ্যতার শেষ পর্যায়

বিশাল ও বৈচিত্র্যময় হরপ্পা সভাতার অস্তিত্ব খ্রিস্টপূর্ব ১৭৫০ অন্দের পরে ক্রমশ হারিয়ে যেতে থাকে। অথচ হঠাৎ করে একটি সভ্যতা শেষও হয়ে যায় না। বেশ কিছু ঘটনার যোগফলে হরপ্পা সভাতার অবনতি হয়েছিল। মহেনজোদাড়ো নগরের বিরাট পাঁচিলটি বেশ কয়েকবার নম্ট হয়েছিল পাঁচিলটিতে একই





ছবি ৩.৯: হবপ্লার দৃটি সিলমোহর

999

ভেবে দেখো

ইবপ্পাব সিলমোহব দৃটিতে

 কোন কোন পশ্ব ছাপ

 দেখতে পাচেছা ?

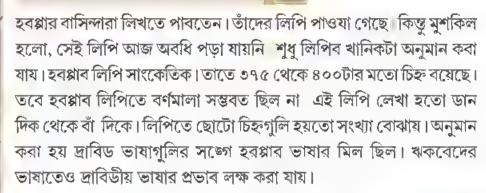


জায়গায় অনেকবার মেরামতির ছাপ দেখা যায়। তাছাড়া পাঁচিলের গায়ে কাদার চিহ্নও পাওয়া গেছে ওই জমে থাকা কাদা সম্ভবত বন্যাব ফলে এসেছিল। সিন্ধুনদেব বন্যায় মহেনজোদাড়োর ক্ষতি হযেছিল বলে মনে হয়

খ্রিস্টপূর্ব ২২০০ অব্দ নাগাদ থেকে এশিয়া মহাদেশেব অনেক জায়গাতেই বৃষ্টিপাত কমতে থাকে। ফলে শৃষ্ক জলবায়ু দেখা দেয়। তাব জন্য কৃষিকাজ সমস্যার মুখে পডেছিল। হবগ্গা সভ্যতাব কৃষিব্যবস্থাও এই সমস্যাব আওতায় পডেছিল বলেই মনে হয়। তাছাড়া ইট পোডানোর জন্য চুল্লির জ্বালানি হিসেবে কাঠেব ব্যবহার হতো গাছ কেটেই ঐ কাঠ পাওয়া যেত বলে মনে হয়। ব্যাপকভাবে গাছ কাটার ফলেও বৃষ্টিপাতেব পরিমাণ কমে গিয়েছিল

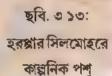
আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৯০০ অব্দেব পবেব দিকে মেসোপটেমিয়াব সঙ্গো হরপ্পাব বাণিজ্যে ভাটা পড়ে। এর ফলে হবপ্পা সভ্যতাব অর্থনীতি সমস্যায় পড়েছিল বলে মনে হয় পাশাপাশি, নগর শাসন ব্যবস্থাও দুর্বল হয়ে পডেছিল। এইসব সমস্যাগুলি থেকে বেরোবার পথ হরপ্পা সভাতার মানুষরা বের কবতে পারেনি।

হরপ্পা সভ্যতার লিপি



পাত্র, সিলমোহব, তামার ফলক নানা কিছুব উপবেই হরপ্পাব লিপি পাওয়া গেছে। লিপি সাজিয়ে সাইনবোর্ডের মতো জিনিস ঢোলাবিরা কেন্দ্র থেকে পাওয়া গেছে হরপ্পা সভ্যতার উন্নতিব নমুনা এই লিপি। সেগুলি ঠিকমতো পড়া গেলে ভাবতীয় উপমহাদেশের অনেক অজানা ইতিহাস

জানা যাবে।



ছবি. ৩ ১২:

হবপ্পার সিলমোহরে

যোগীমূর্তি

ভেবে দেখো



১। বেমানান শব্দটি খুঁজে বের করো:

- ১.১) তামা, কাঁসা, পাথর, লোহা
- ১.২) ঘোডা, হাতি, গন্ডার, যাঁড
- ১.৩) কালিবঙ্গান, মেহেবগড়, বানাওয়ালি, ঢোলাবিরা

। নীচের বাকাগুলির কোনটি ঠিক কোনটি ভুল লেখা :

- লিপির ব্যবহার সভ্যতার একটি বৈশিষ্ট্য।
- ২.২) মেহেরগড সভ্যতা আবিষ্কার করেন দয়ারাম সাহানি
- ২.৩) হরপ্পা সভ্যতা প্রাক-ঐতিহাসিক যুগের সভ্যতা।
- ২.৪) হরপ্পার মানুষ লিখতে জানতেন।

সঠিক শব্দ বেছে নিয়ে শৃন্যস্থান পূরণ করো :

- হরপ্পা সভ্যতাব বাডিঘবগুলি তৈরি হতো (পাথর দিয়ে/পোডা ইট দিয়ে/কাঠ দিয়ে)।
- ৩.২) হরপ্পা সভ্যতা ছিল (পাথবের যুগের/ লোহার যুগের/ তামা ও ব্রোঞ্জ যুগের) সভ্যতা।
- ৩.৩) ভারতীয় উপমহাদেশে হরপ্লাতেই (প্রথম নগর / প্রথম গ্রাম/ দ্বিতীয় নগর) দেখা গিয়েছিল

৪। নিজের ভাষায় ভেবে লেখো (তিন / চার লাইন):

- 8.১) তোমার জানা কোনো একটি শহরের সঞ্চো হরগ্গা সভাতার শহরের মিল-অমিলগুলি খুঁজে বার <mark>করো</mark>।
- 8.২) সিন্ধুনদীব তীরে হরপ্পা সভ্যতার শহরগুলি কেন গড়ে উঠেছিল বলে তোমাব মনে হয়?
- 8.৩) হবপ্পা সভাতায কী ধরনের বাডিঘব পাওয়া গেছে ? সেগুলিতে কারা থাকতেন বলে মনে হয় ?
- ৪.৪) তোমার কি মনে হয়, হবয়য় সভ্যতাব মানুষ স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার-পবিচ্ছয়তা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন
 তোমার স্থানীয় অঞ্বলে স্বাস্থ্য ও পবিচ্ছয়তা বজায় বাখতে হবয়য়র মানুষের থেকে কোন কোন বিষয় তুমি শিখবে
 ?

৫। হাতেকলমে করো:

- ৫১) হরপ্পা সভাতায় শহর ও মানুষেব জীবন কেমন ছিল? তার ছবি দিয়ে চার্ট তৈরি করো।
- ৫২) হবপ্পা সভাতার বিভিন্ন প্রত্ন-নিদর্শনগুলি মাটি, পিচবোর্ড বা থার্মোকল দিয়ে বানাও। ঐ প্রত্ন-নিদর্শনগুলি হরপ্পা সভাতাব ইতিহাস জানতে কীভাবে সাহায্য করে?

8

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের ধারা

দ্বিতীয় পর্যায় : আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০-৬০০ অব্দ

কুমার ঝুলি পড়ে তানিয়াব মনে অনেক প্রশ্ন তৈবি হলো। বুবির দাদুব কাছে একদিন ও জানতে চাইল সেগুলোব উত্তর আচ্ছা দাদু, বাক্ষস-বাক্ষসীবা কি সত্যিই ভযানক দেখতে হয়?



অরুণ বলল, মেলার মাঠে বাম বাবণের যুদ্ধ দেখেছি। বাবণ তো বাক্ষস বাজা তাই হারুকাকা বাবণ সাজার জন্য মুখে কালি মেখেছিলেন।

তিতির বলল, দাদু, রামায়ণের রাবণের সত্যিই দশটা মাথা ছিল?

দাদু সবসময় ওদেব প্রশ্ন শুনে খুশিই হন। বললেন, মানুষের কল্পনায় <mark>আব কথায় এভাবেই গল্পগাথা</mark> তৈবি হয় বাক্ষসের যে বর্ণনা তোমবা জানো, সে সবই মানুষেব কল্পনা বামায়ণের গল্পকথায় কিন্তু বাবণ খুব সুন্দর দেখতে ছিলেন। আব দশটা মাথা মানে দশ দিকে যাব মাথা খাটে।

পলাশ বলল, তাহলে বাবণকে কবে থেকে আব কেন ভয়ানক ভাবা শুবু হলো?

দাদু বললেন, এই তো ইতিহাসের *কেন* ও *কবে* তোমাদের ভাবাতে শুরু করেছে। *রামাযণ* কী তা তোমরা

সবাই জানো?

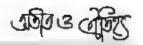
সুবাইযা বলল, বামায়ণ তো বাম-বাবণের যুদ্ধের গল্প। আচ্ছা দাদু, <u>রামায়ণ</u> কি ইতিহাস?

দাদু বললেন, ইতিহাস সবেতেই আছে। কোথায়, কতটা, কীভাবে ইতিহাস লুকিয়ে আছে সেটা খোঁজাই ইতিহাসের গোয়েন্দার কাজ। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মোবাইল ফোনে কথা বলেছ বা দেখেছ। মোবাইল নিয়ে নিজেব বাজ্য বা দেশের বাইবে গেলে বেশি টাকা কাটে কেন জানো? অরুণ বলল, বাইরে ঘোরা বা বোমিং (Roaming)-এব জন্য।

দাদু বললেন, ইংবেজিতে Roaming শব্দটাব একটা মানে হলো ঘোরা আবাব সংস্কৃতে রাম শব্দেব একটা অর্থ যিনি ঘুরে বেডান। খেয়াল কবো ইংবেজি আব সংস্কৃত শব্দ দুটির অর্থেব মধ্যেব মিলটা। কোনো এক সময়ে একদল যাযাবর ঘুবতে ঘুবতে চলে এসেছিল ভারতীয় উপমহাদেশে। সেখানকাব পুবোনো বাসিন্দাদেব সঙ্গো শুবু হলো তাদেব মেলামেশা তাব সঙ্গো চলল যুন্ধ-লড়াই। সেই যুন্ধে বেশিবভাগ সময় বাইবে থেকে আসা মানুষগুলি জিতে গেল। তাবপব আস্তে আস্তে উপমহাদেশেব উত্তব অংশে তারা বসতি তৈরি কবল। ধীবে ধীবে দক্ষিণ অংশেও ছডিয়ে পড়েছিল তাবা। মনে কবা হয়, দক্ষিণ অংশে ছডিয়ে পড়াব সেই কাহিনিই বামায়েল পাওয়া যায়।

যুন্ধে জয় আব বসতি গড়ে তোলাব কথা ঘিরে তৈবি হলো অনেক গল্প। সেগুলি ফিবতে লাগল মুখে মুখে। সেই গল্পগুলোতে যুন্ধে হেবে যাওয়া মানুষদেব অন্যবক্ষভাবে দেখানো হলো। তাবা কখনও রাক্ষস বা অসুর, কখনও বা দৈত্য। তাছাড়া তারা কখনও অসভ্য বা দস্যু। রামায়ণ সেই যুন্ধে জেতা মানুষদের গল্প তাই হেবে যাওয়া রাবণ সেখানে খাবাপ ও ভয়ানক

পরের দিন ইতিহাসের ক্লাসে দাদুর বলা কথাগুলো বলল তানিয়া। দিদিমণি বললেন, রামায়ণের ও মহাভারতের গল্পের আগের অনেক গল্পকথাও জানা যায়। সেইসব কথা আছে *বেদ*-এ। <mark>আজ আমবা</mark> সেই সময়ের কথাই জানব



8.১ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার পরিবার

তোমবা রাম ও Roaming শব্দেব মিল পেয়েছ অর্থে ও উচ্চারণে। এমনই আবও অনেক শব্দ আছে। যেমন ধরো, বাংলায় মা, সংস্কৃতে মাতঃ বা মাতৃ, ইংরাজিতে Mother, লাতিন-এ মাতের। পিতৃ বা লাতৃ শব্দগুলোরও এমনই মিল বয়েছে বেশ কিছু ভাষার শব্দের সঙ্গো। উচ্চারণ ও অর্থের মিল কিছু এমনি এমনি হয় না। মানুষেব পরিবাবের মতো ভাষারও পরিবাব আছে। সেই একই পরিবাবের ভাষাগুলিব মধ্যে বেশ কিছু মিল থাকে। তেমনই একটা ভাষা পরিবাব হলো ইন্দো ইউবোপীয় ভাষা পরিবাব ভারতীয় উপমহাদেশ ও ইউরোপের অনেক ভাষাই এই ভাষা পরিবারের সদস্য। এদেরকে তাই একসঙ্গো ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা পরিবাব বলা হয়। এই ভাষা ব্যবহাবকাবীরা কোথায় থাকতো?

শব্দের ব্যবহার থেকে মনে হয় যে, তারা তৃণভূমি অঞ্চলের মানুষ ছিল। কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত শব্দ বিশেষ ব্যবহার হয়নি। বেশিরভাগ ঐতিহাসিকের মতে তারা মধ্য-এশিয়ার তৃণভূমি অঞ্চলের যায়াবর ছিল। তাদের নিজেদের ও তাদের পালিত পশুব খাদোর অভাব দেখা দিলে তারা ছড়িয়ে পড়ে নানা





ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা পবিবারের এক সদস্য *ইন্দো ইবানীয ভাষা* ঐ ভাষা মানুষেব মুখে ধীবে ধীবে বদলে ভাবতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন ভাষায় পরিণত হয়েছে। তার সঞ্চো মিশেছে নানান আঞ্চলিক শব্দ। সংস্কৃত ভাষা সেই ভাষাগুলির মধ্যে একটি।

আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বর্তমানে আর নেই। ঋকবেদ ও জেন্দ্র অবেস্তায় ইন্দো-ইবানীয় ভাষাব প্রভাব লক্ষ কবা যায়। এই দুটি সাহিত্যেব ভাষায় ও বর্ণনায় বেশ কিছু মিল দেখা যায়। এর থেকে ইন্দো ইরানীয় ভাষাব অস্তিত্ব জানা যায়। তবে মিলের পাশাপাশি ঐ দুই রচনায় বেশ কিছু অমিলও দেখা যায়। যেমন, ঋকবেদে যারা দেব, তাবা সম্মানিত ব্যক্তি। কিন্তু অবেস্তায় যাবা দয়েব(দেব), তাদেব ঘৃণা কবা হতো। আবার অবেস্তার শ্রেষ্ঠ দেবতা অহুব। অথচ বৈদিক সাহিত্যে অসুর (অহুর) খারাপ বলে পরিচিত। হয়তো কোনো কাবণে ইন্দো-ইবানীয় ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ তৈবি হয়েছিল। তার ফলে ঐ গোষ্ঠীর একটি শাখা। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত হয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে পৌছেছিল এদেরই ইন্দো-আর্য ভাষা গোষ্ঠী বলা হয়। এক্ষেত্রে মনে রেখো আর্য কোনো জাতিবাচক শব্দ নয়। ইন্দো-আর্য ভাষারই সবথেকে পুরোনো সাহিত্য ঋকবেদ

অনেকে অনুমান করেন উত্তব-পশ্চিম দিক দিয়ে ইন্দো-আর্যবা ভাবতে ঢুকেছিল। বৈদিক সাহিত্য থেকেই এই ইন্দো আর্যদের বসতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানা যায়। তাই এই সভ্যতাব নাম বৈদিক সভ্যতা

৪.২ বৈদিক সভ্যতা ও বৈদিক সাহিত্য

বৈদিক সাহিত্য বলতে কী বোঝায়? বেদ এসেছে বিদ শব্দ থেকে বিদ মানে জ্ঞান। সমস্ত বৈদিক সাহিত্য চার ভাগে ভাগ কবা যায় সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। ঋক, সাম, যজুঃ ও অথব এই চারটি হলো সংহিতা। সংহিতাগুলি ছন্দে বাঁধা কবিতা। ঋকবেদ সবথেকে পুরোনো বৈদিক সংহিতা। ঋকবেদ বচনাব ভাষা আব ভৌগোলিক পবিবেশেব উল্লেখ থেকে তা বোঝা যায়। বাকি তিনটি সংহিতা ও অন্যান্য বৈদিক সাহিত্য ঋকবেদের পরের বচনা। তাই সেগুলিকে পববর্তী বৈদিক সাহিত্য বলা হয় অর্থাৎ বৈদিক সাহিত্যের দুটি ভাগ। আদি বৈদিক সাহিত্য ও পববর্তী বৈদিক সাহিত্য (থেকেই বৈদিক সভ্যতার ইতিহাস জানা যায়। তাই বৈদিক যুগেরও ভাগ দুটি। আদি বৈদিক যুগ ও পরবর্তী বৈদিক যুগ আদি বৈদিক যুগের ইতিহাস জানার একমাত্র উপাদান ঋকবেদ। পববর্তী বৈদিক সাহিত্য থেকে পববর্তী বৈদিক যুগের ইতিহাস জানা যায়।

865

ভেবে দেখো

- বলতে পারো
 ইন্দো- ইউবোপীয়বা
 তৃণভূমি অঞ্জলে কেন
 বাস কবত?



TO THE PARTY OF

- □ ঋকবেদেব সৃক্তগুলি ছন্দে বাঁধা ঋক-এর সমষ্টি। তাই ঐ সংহিতার নাম ঋক সংহিতা। সংহিতা কথার অর্থ সংকলন করা
- সামবেদ সংহিতাব বেশিরভাগটাই ঋকবেদেব থেকেই নেওয়া কেবল

 সামবেদ সুর করে গানের মতো গাওয়া হতো।
- যজুর্বেদ মূলত বিভিন্ন আচাব-অনুষ্ঠানে দবকারি মন্ত্রের সংকলন মন্ত্রগুলি
 কিছুটা পদ্যে ও কিছুটা গদ্যে লেখা।
- অথর্ববেদ জাদুমন্ত্রের সংকলন। বৈদিক যুগে ও তার পরেও দীর্ঘদিন
 অথর্ববেদকে সংহিতা বলে ধরা হতো না।
- 🗖 সংহিতাগুলিকে ব্যাখ্যা কবার জন্য তৈরি হয়েছিল গদ্যে লেখা ব্রাশ্মণ।
- আরণ্যকগুলি যারা লিখতেন তাবা অবণ্যে (বনে) থাকতেন যাগয়জ্ঞেব
 ব্যাখ্যা ও নানা চিস্তাভাবনা আরণ্যক সাহিত্যে দেখা যায়।
- 🗖 বেদ-এর নানা তত্ত্বের বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও চিন্তাভাবনা উপনিষদে আছে।
- □ বৈদিক সাহিত্যগুলিকে ঠিক মতো উচ্চারণ করা, ছন্দ, আসল অর্থ বোঝার জন্য বচনা হয়েছিল বেদাঙ্গ। সংখ্যায় বেদাঙ্গ ছ-টি এছাড়াও নক্ষত্রের অবস্থান, বিভিন্ন নিয়য়, জ্যামিতির ধাবণা প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে।

বৈদিক সাহিত্য ঠিক কোন সময়ের রচনা তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল।
মোটামুটিভাবে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ৬০০ অব্দের মধ্যে বৈদিক
সাহিত্য বচিত হয়েছিল। এর মধ্যে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ১০০০ অব্দকে আদি
বৈদিক যুগ বলে ধবা যায়। তাবপর থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ পর্যন্ত পরবর্তী
বৈদিক যুগ। তবে মনে রাখা দবকার, তারপবেও বৈদিক সাহিত্য লেখার কাজ
চলেছিল। এখন যে চেহারায় বৈদিক সাহিত্য পাওয়া যায় তা অনেক পরের রচনা।

বেদের ভূগোল

বৈদিক সাহিত্যে পর্বত ও নদীব নাম থেকে উপমহাদেশে আর্যদের বসতিব কথা বোঝা যায়। বৈদিক সাহিত্যে বিশেষ কবে ঋকবেদে ভূগোল বিষয়ে অনেক আলোচনা বয়েছে । ঋকবেদে হিমালয় (হিমবৎ) ও কাশ্মীবের মূজবন্ত শৃঙ্গোব উল্লেখ আছে। বিশ্যপর্বতেব উল্লেখ নেই। ঋকবেদে অনেক নদীর কথা বলা হয়েছে। তার থেকে মনে হয ঐ নদীব কাছাকাছি এলাকাগুলিতেই ছিল আদি



বৈদিক যুগেব বসতি ঋকবেদেব আলোচনায় গুবুত্বপূর্ণ নদী ছিল সিন্ধু। সরস্বতী নামে যে নদীব কথা ঋকবেদে বয়েছে, তা আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ঋকবেদেব মানুষ গঙ্গা ও যমুনা নদীব এলাকাব সঙ্গো বিশেষ পবিচিত ছিলেন না। ঋকবেদের একেবাবে শেষের দিকে মাত্র একবার গঙ্গা ও যমুনা নদীর কথা পাওয়া যায়।

ঋকবেদের ভূগোল থেকে আদি বৈদিক সভ্যতা কতটা ছডিয়েছিল তা বোঝা যায় আজকেব আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তেব সঙ্গে আদি বৈদিক যুগের মানুষের পরিচয় ছিল। সিন্ধু ও তার পূর্ব দিকের উপনদীগুলি দিয়ে ঘেরা অঞ্চল ছিল আদি বৈদিক মানুষের বাসস্থান। ঐ অঞ্চলটিকে বলা হতো সপ্তসিন্ধু অঞ্চল।

পববর্তী বৈদিক সাহিত্যের বর্ণনায় ঐ ভূগোল আস্তে আস্তে বদলে গিয়েছিল। গঙ্গা-যমুনা দোয়াব এলাকার উল্লেখ পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে অনেক বেশি। এর থেকে বোঝা যায়, বৈদিক-বসতি পাঞ্জাব থেকে পূর্ব দিকে হরিয়ানাতে সবে গিয়েছিল। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে পূর্ব ভারতকে নীচু নজরে দেখা হয়েছে। তার থেকে মনে হয় পরবর্তী বৈদিক সভ্যতার পূর্ব সীমা ছিল উত্তর বিহারেব মিথিলা। গঙ্গা নদীব সমভূমি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়াব ফলে বৈদিক সমাজে কৃষির প্রচলন হয়।

পববর্তী বৈদিক সাহিত্যের মূল ভৌগোলিক অঞ্চল ছিল সিন্ধু ও গঙ্গার মাঝের এলাকা। তাছাড়া গঙ্গা উপত্যকার উত্তব ভাগ ও গঙ্গা যমুনা দোয়াবও তার ভেত্তবে পড্ত

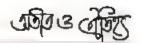
বৈদিকযুগ ও প্রত্নতত্ত্ব

বৈদিক সাহিত্যে তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহারের কথা স্পন্ট শেষদিকের বচনাষ লোহাব ব্যবহারেব ধারণা পাওয়া যায় ঘোড়া ছিল অন্যতম পালিত পশু। ঘোড়ায টানা বথ ও তির-ধনুকের ব্যবহার ছিল উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। উপমহাদেশের হরপ্পার নাগরিক সভাতার অবসানের পরের প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষ পাওয়া যায় বিভিন্ন স্থানে। সেগুলি সবই গ্রামীণ সভাতার পরিচয় দেয় এই সমস্ত কেন্দ্রগুলিতে ঘোড়ার ও পরবর্তী পর্যায়ে লোহার ব্যবহারেব প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে মনে রেখাে, আগের থেকে আলাদা কোনাে নতুন সভ্যতার চিহ্ন মেলে না। একটা মিশ্র বৈশিষ্ট্য এই অঞ্চলগুলিতে দেখা যায়। পরবর্তী বৈদিক যুগে একরকমের মাটির পাত্র বানানাে হতাে। সেই পাত্রগুলির রং ছিল ধুসব। সেগুলিব

प्रेवाखा वाथा

মহাকাব্য

পববতী বৈদিক সাহিত্যের আরেকটি অংশ হলো মহাকাব্য মহাকাব্য কথাৰ মানে মহৎ বা মহান কাব্য বা কবিতা। কোনো বিশেষ ঘটনা, দেবতা বা বড়ো রাজবংশের শাসককে নিয়েই মহাকাব্য লেখা হতো তাবস্ঞো থাকত ভূগোল, গ্রহ নক্ষত্র ও গ্রাম-নগরের কথা সমাজজীবনেব নানা দিক, রাজনীতি, যুন্ধ, উৎসবের মহাকাব্যেব মধ্যে মিশে থাকত সাতটি বা অন্তত আটটি সর্গ বা ভাগে ভাগ কবা হতো মহাকাব্য কবির, মূল ঘটনার বা কাব্যের প্রধান চরিত্রের নামে মহাকাব্যেব নাম দেওয়া হতো প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে সবথেকে জনপ্রিয় মহাকাব্য ছিল বামায়ণ ও মহাভারত





ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহামের খারা



গায়ে ছবিও আঁকা হতো। এদের বলা হয় চিত্রিত ধুসর মাটির পাত্র হরিয়ানার ভগবানপুবায় (খ্রি পু ১৬০০-খ্রি:পু. ১০০০ অব্দ) লোহার ব্যবহাবের আগের সমযের প্রচুব পরিমাণে চিত্রিত ধুসর মাটির বাসন পাওয়া গেছে। এই মাটির পাত্র এলাহাবাদের পুর্বদিকে বিশেষ পাওয়া যায়নি অত্রঞ্জিখেবা, হস্তিনাপুর, অহিচ্ছত্র, নোহ প্রভৃতি জায়গাগুলোতে খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দের পরের সময়ের মাটিব বাসন ও লোহার ব্যবহারের প্রমাণ মেলে। এছাড়াও অনেক জায়গায় প্রাচীন গ্রামের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেছে। লোহার তিরের ফলা, বর্শার ফলা, আংটি, পেরেক, ছোরা, বঁড়শি, নানা ধ্বনের মাটির পাত্র, তামা-ব্রোঞ্জের গয়না, মাটির তৈরি মানুষ ও পশুর মূর্তি পাওয়া গেছে।

^{१११} ভেবে দেখো

হবপ্পাব মতো উন্নত পবিকল্পিত নাগরিক সভ্যতাব পর বৈদিক গ্রামীণ সভ্যতা গড়ে ওঠাব কারণ কী হতে পাবে?

৪.৩ বৈদিক রাজনীতি

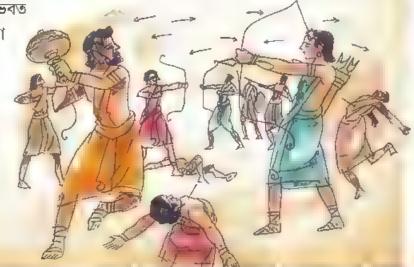
বৈদিক সাহিত্য মূলত ধর্মীয় সাহিত্য। কিন্তু তাব থেকে সেই সময়েব বাজনীতি বিষয়ে বেশ কিছু কথা জানা যায় ঋকবেদে যুদ্ধে জিতে লুঠপাট চালানোর জন্য দেবতাব আশীর্বাদ চাওয়া হয়েছে। আবাব পববর্তী বৈদিক সাহিত্যে শাসকদেব জন্য বেশ কিছু যজ্ঞের কথাও রয়েছে। তবে রাজনীতিব ঘটনার সরাসরি বর্ণনা বৈদিক সাহিত্যে খুবই কম।

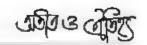
ঠুকারো কথা দশ রাজার যুন্ধ

যুদ্ধের কথা ঋকবেদে অনেক আছে তার মধ্যে বিখ্যাত হলো দশ রাজার যুদ্ধ। ভরত গোষ্ঠীর রাজা ছিলেন সুদাস। তার সঞ্চো অন্যান্য দশটি গোষ্ঠীর রাজাদের যুদ্ধ হয়েছিল। সুদাস দৃশ্ রাজার জোটকে

<mark>হাবিয়ে দিয়েছিলেন। এর ফলে ভবত</mark>

গোষ্ঠীর রাজনৈতিক ক্ষমতা বেডেছিল নদীর ওপর একটি বাঁধ ভেঙে দিয়েছিলেন সুদাস। হয়তো নদীব জলের উপব অধিকাব বজায় রাখার জন্যই এমনটা করা হয়েছিল। এই যুদ্ধের সঞ্চো পরবর্তীকালে মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কিছুটা মিল রয়েছে।





টুকারো কথা

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে রাজা

প্রবতী বৈদিক
সাহিত্যেব এক জাযগায
বাজা হওয়াব একটা গঞ্চ
আছে দেবতা ও
অস্বদেব মধ্যে যুদ্ধে
প্রতিবারেই দেবতারা
অস্বদেব কাছে হেবে
যেতেন। চিন্তায় পডে
দেবতাবা জেতার উপায
ঠিক কবাব জন্য বসেন
আলোচনায়।বোঝা যায়
কোনো বাজা না থাকাব
জন্যই দেবতাদের এই
পরিণতি।

এবাব দেবতারা রাজা
খুঁজতেলাগলেন সবাই
একমত হয়ে দেবতাদেব
মধ্যে সেবা বীব ইন্দ্রকেই
বাজা বাছলেন ইন্দ্র
দেখতেও বেশ ভালো
ছিলেন। তাই সবাই
তাকেই রাজা মেনে
নিলেন। এবার কিন্তু
দেবতাবা ইন্দ্রের নেতৃত্বে
জয়ী হতে থাকলেন।

■ উপবেব গল্পটি পড়ে ভেবে বলো কেন বাজাব দবকার হয়েছিল ? ঋকবেদে গ্রাম মানে শুধু গ্রামীণ বসতি নয় একটি ছোটো জনসমষ্টিকেও গ্রাম বলা হয়েছে আলাদা কয়েকটি পবিবার নিয়ে সম্ভবত ঐ ছোটো জনগোষ্ঠী বা গ্রাম তৈরি হতো। ঋকবেদে জন, গণ, বিশ প্রভৃতি শব্দ অনেকবার ব্যবহার হয়েছে সেগুলি দিয়ে গ্রামেব থেকে বডো একটি জনগোষ্ঠীকে বোঝানো হতো। ঋকবেদে যুদ্ধে জেতা ও লুঠপাটের নানান কথা রয়েছে। গবাদি পশু ও ঘোডা পুঠ হতো সবথেকে বেশি।

শ্বকবেদে রাজা শব্দেব নানান বকম ব্যবহার ব্যেছে। রাজা কথাব আক্ষবিক অর্থ নেতা। নেতা যে ধবনের দাযিত্ব সামলাতেন তার ভিত্তিতেই ঠিক হতো তাঁব নাম। বাজাকে বিশপতি অর্থাৎ বিশ বা গোষ্ঠীব প্রধান বলা হয়েছে। কখনও বা বাজা গোপতি বা গবাদি পশুব প্রভু বলে পরিচিত শ্বকবেদে বাজা মানুষ ও জমিব দখল পায়নি। তাই নরপতি বা ভূপতি শব্দগুলির ব্যবহার শ্বকবেদে নেই। বিদথ নামের একটি প্রতিষ্ঠানেব কথা শ্বকবেদে রয়েছে। বাজা ও বিশেব সদস্যরা বিদথের সদস্য ছিলেন। সেখানে যুন্ধের কথা আলোচনা হতো। আবাব যুন্ধে লুঠ কবা সম্পদের ভাগ বাঁটোয়াবাও হতো। সেই ভাগাভাগির দায়িত্ব সামলাতেন বাজা। পরবতী বৈদিক যুগে রাজা শাসকে পরিণত হয়। তখন তিনি হলেন ভূপতি বা মহীপতি। ভূপতি হলেন ভূ অর্থাৎ জমির পতি বা মালিক। মহীপতি হলেন পৃথিবীর রাজা। রাজ্যের প্রজার বা জনগণের প্রধান হিসাবে রাজার উপাধি হলো নুপতি বা নবপতি। অর্থাৎ যিনি নু বা নব অর্থাৎ মানুষের রক্ষাকাবী। এভাবেই গোষ্ঠীর নেতা হয়ে উঠলেন রাজা। জনগণ পরিণত হলো তাঁর অনুগত প্রজায়। পরবতী বৈদিক যুগে বাজনৈতিক অবস্থা বদলে গিয়েছিল। ব্রাহ্রাণ সাহিত্যে দেবতা ও অসুরদের লড়াই তারই উদাহরণ।

রাজা যে এলাকাটি শাসন করতেন তাকেই রাজ্য বলা হতো। পরবর্তী বৈদিক যুগে উপজাতি বা গোষ্ঠীর নামে অঞ্চলের নাম হতে থাকে। যেমন, কুরু, পাঞ্চাল ইত্যাদি। এভাবে অঞ্চল থেকে প্রাথমিকভাবে বাজ্যের ধারণা গড়ে ওঠে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের উপর দখল থাকলে তবেই কেউ রাজা হতে পারত। ধরা হতো সেই অঞ্চলেব মানুষেরা ঐ বাজাব শাসন মেনে চলবে শাসনকাজ চালানোর জন্য রাজাব কিছু কর্মচারী থাকবে আর থাকবে সেনাবাহিনী

রাজাব কথা এলেই প্রজা র কথাও এসে পড়ে বাজা যে অঞ্চলে শাসন করতেন সেখানকার বাসিন্দারাই তাঁর প্রজা। প্রজা না থাকলে বাজার শাসন চলবে না। প্রজাদের সমস্যা মেটাবেন বাজা। তার বিনিময়ে প্রজাবা রাজাকে মেনে চলবে এটাই ছিল সেকালের নিয়ম



প্রাচীনকালে রাজা হওয়ার অনেক উপায় ছিল কেউ যুন্থে জিতে রাজা হতেন।
আবার কেউবা রাজার ছেলে হিসেবে পরবর্তী রাজা হতেন। কখনও বা গোষ্ঠীর
সবাই মিলে নিজেদের মধ্যে থেকে একজনকে রাজা হিসেবে বাছাই করত।
বাজারা অনেক সময় পুবোহিতদেব পবামর্শে নানান বকম যজ্ঞেব আয়োজন
করতেন। যেমন, অশ্বমেধ যজ্ঞ , রাজসূয় যজ্ঞ , বাজপেয় যজ্ঞ ইত্যাদি। যুন্থে
যাওয়ার আগে কিছু যজ্ঞ হতো। যুন্থ জিতে ফিরে এসেও যজ্ঞ করতেন বাজাবা।
যজ্ঞেব মধ্যে দিয়ে রাজারা নিজেদের ক্ষমতা জাহির কবতে চাইতেন শাসকদেব
জন্য নানাবকম যজ্ঞ ও অনুষ্ঠানেব কথা পববর্তী বৈদিক সাহিত্যে বলা হয়েছে।

শাসনের কাজে সাহায্য কবতেন যারা, তাদের বাজুন বলা হতো। হয়তো এদেব থেকেই পরে মন্ত্রীব ধাবণা এসেছে পববর্তী বৈদিক যুগে বিদথেব কথা পাওয়া যায় না। তাব বদলে সভা ও সমিতিব গুবুত্বের কথা জানা যায়। সভাতে বয়স্ক ব্যক্তিবা যোগ দিতেন। গোষ্ঠীব সবাই সম্ভবত সমিতির সদস্য ছিল। সমিতিতে নানারকম বাজনীতি বিষয়ে আলোচনা করা হতো

বৈদিক সভ্যতার অর্থনীতি ও সমাজ

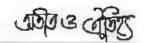
ঋকবেদে কৃষিব তুলনায় পশুপালনেব কথা বেশি পাওয়া যায়। আদি বৈদিক সমাজে গবাদি পশুই ছিল প্রধান সম্পদ যাব গবাদি পশু বেশি তিনি ধনী বলে পরিচিত হতেন। পশুপালনের ওপর সমাজ বেশি নির্ভর করত বলেই গবাদি পশুর এত গুবুত্ব ছিল। থেয়াল রাখা দরকার ঋকবেদে যুল্ধ করে জমি দখলের কথা বিশেষ নেই। কারণ ঋকবেদেব যুগে সম্পদ হিসাবে জমিব গুবুত্ব বিশেষ ছিল না তাছাড়া ঘোড়ার চাহিদাও ছিল সম্পদ হিসাবে। আদি বৈদিক যুগে কৃষির প্রসঞ্চা কম হলেও, ছিল। উৎপন্ন শস্যের মধ্যে যব ছিল প্রধান। গম ও ধান উৎপাদন হতো কিনা তা নিশ্চিত বলা যায় না আন্তে আন্তে বৈদিক সমাজে কৃষির গুরুত্ব বাড়ছিল।

আদি বৈদিক সমাজে কারিগরি শিল্পের চল ছিল কম। কাঠের কারিগরি
শিল্পেব কথা জানা যায়। কাঠেব আসবাব ও বাডিঘব তৈবি কবা হতো। তাছাডা
বথ তৈবি কবতেও কাঠ ব্যবহার হতো। ঋকবেদে চামড়াব শিল্পেব কথা বয়েছে।
চামড়া দিয়ে থলি, ঘোডাব লাগাম প্রভৃতি বানানো হতো ভেড়ার লোম থেকে
পোশাক বানানোর কথা ঋকবেদে রয়েছে। টানা ও পোডেন দু বকমেব
সুতো কাপড বোনায় ব্যবহাব হতো সোনার নানাবকম গয়নার কথাও ঋকবেদ
থেকে জানা যায। তামা দিয়ে চাষের প্রয়োজনীয যন্ত্রপাতি বানানো হতো।
ঋকবেদে লোহার কথা নেই ফলে আদি বৈদিক সমাজে লোহার ব্যবহার ছিল
বলে মনে হয় না।

प्रेकास यथा

বেদের যুগে কর দেওয়া-নেওয়া

গোষ্ঠীজীবনে প্রথম দিকে জমির উপর নেতাব কোনো অধিকাব ছিল না। কিন্তু নেতৃত্ব চালানোর জন্য তাঁব ধনসম্পদের দরকাব ছিল তা সম্ভবত কৃষি থেকেই পেতেন শাসকৰা ঋকবেদের যুগে শাসকরা কর নিতেন তবে জোরকরে কবের বোঝা প্রজাদের ওপর চাপিয়ে দেওযা হতো না প্রজারা নিরাপদে থাকাব জন্য স্বেচ্ছায় এক ধবনেব কব বাজাকে দিত খাকরেদে এই কবই বলি নামে পবিচিত তবে পববতী বৈদিক যুগে দলপতি সম্ভবত জোব করে বলি কর আদায় করতেন অর্থাৎ পরবর্তী বৈদিক যুগে কব হয়ে উঠেছিল বাধ্যতামূলক। যুদ্ধে যাঁরা হেবে যেত তাঁদের থেকেও বাজাবা জোব কবে কব আদায় করতেন।



পরবর্তী বৈদিক যুগে গণ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলে পাকাপাকি কৃষিকাজ শুরু হয়। এই সময় যবের পাশাপাশি গম ও ধান ছিল প্রধান ফসল। কোন ঋতুতে কোন ফসল ফলানো উচিত, তা নিয়েও পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে আলোচনা দেখা যায়। লাঙলের ফলা সাধাবণত কাঠ বা তামা দিয়ে তৈরি হতো। লোহার লাঙল সম্ভবত তখনও ব্যবহার হতো না।

গঙ্গা অববাহিকায় কৃষিকাজ ও বসতি তৈবির জন্য জঙ্গাল পবিষ্কার করা ছিল দবকাবি সম্ভবত বন পুড়িয়ে ফেলা হতো আবাব লোহার অস্ত্র দিয়ে বন কেটে ফেলাও হতো হয়তো পরবর্তী বৈদিক সমাজে লোহাব ব্যবহার নিশ্চিতভাবেই হতো লোহার কুড়াল ও কুঠার দিয়ে গঙ্গা উপত্যকার ঘন জঙ্গাল সাফ কবা সহজ হয়েছিল। লোহাব তৈবি লাঙলের ফলা না থাকলেও অস্ত্রশস্ত্র লোহা দিয়েই তৈরি হতো। লোহাব অস্ত্র পরবর্তী বৈদিক যুগের শাসকদের সুবিধা করে দিয়েছিল।

লোহা ও অন্যান্য ধাতুর ব্যবহার কারিগরি শিল্পে উন্নতি ঘটিয়েছিল। পরবর্তী বৈদিক যুগের চিত্রিত ধুসর মাটির পাত্র প্রত্নতান্ত্বিকেরা পেয়েছেন। তার থেকে বোঝা যায় পরবর্তী বৈদিক সমাজে কুমোরের পেশা ছিল। তাছাড়া এসময় কামার, জেলে, রাখাল, চিকিৎসক প্রভৃতি পেশার কথা জানা যায়। গয়না, অস্ত্রশস্ত্র, কাপড় তৈরির শিল্প চালু ছিল। পরবর্তী বৈদিক যুগে কাজের ভাগাভাগি অনেক বেডে গেছিল। এমনকি একটি জিনিস বানাতেও আলাদা আলাদা অংশের কারিগর থাকত। যেমন, ধনুক, ধনুকের ছিলা এবং তির তৈরির আলাদা কারিগর ছিল।

আদি বৈদিক যুগে ব্যবসাবাণিজ্যের বিশেষ চলন ছিল না। সবাসরি সমুদ্র-বাণিজ্যের কথা ঋকবেদে নেই। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে ব্যবসাবাণিজ্যেব কথা বেশি পাওয়া যায়। তবে সমুদ্র-বাণিজ্য এই আমলেও ছিল কিনা নিশ্চিত জানা যায় না । বৈদিক যুগে জিনিসপত্র বিনিম্য কবা হতো। তবে মুদ্রাব ব্যবহার ছিল বলে মনে হয় না। যদিও নিষ্ক, শতমান এগুলি হয়তো মুদ্রাব মতো ব্যবহার হতো।



ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহামের ধারা

বৈদিক সাহিত্য থেকে ঐ সময়ে সমাজের কথাও জানা যায়। সমাজেব সবথেকে ছোটো অংশ ছিল পরিবার। পরিবারের সবথেকে বয়স্ক পুরুষ ছিলেন প্রধান। তাই বৈদিক যুগে সমাজ ছিল পিতৃতান্ত্রিক। অর্থাৎ পবিবারে ও সমাজে পিতা বা বাবাই ছিলেন প্রধান। হরপ্পার সমাজের মতো মায়ের ক্ষমতা ঋকবৈদিক সমাজে ছিল না

খাবদে গোড়ার দিকে বর্ণাশ্রম বা চতুর্বর্ণপ্রথা বিশেষ ছিল বলে জানা যায় না। চাবটি বর্ণ বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা ঋকবেদে পাওয়া যায় না। ববং মনে হয় ঋকবেদে বর্ণ বলতে গায়ের বংকেই বোঝাত। বর্ণাশ্রম বোঝাতে বর্ণ শব্দেব ব্যবহাব আদি বৈদিক সমাজে ছিল না। ঋকবেদেব সমাজে সামাজিক ভেদাভেদ ছিল তবে তা বর্ণপ্রথা দিয়ে বিচার করা হতো না একই পরিবারেব সদস্যবা নানা কাজে যুক্ত থাকতেন। ঋকবেদেব থেকে এমন একটি পরিবারেব কথা জানা যায় সেখানে বাবা চিকিৎসক, মা শস্য পেশাই কবতেন এবং তাদেব ছেলে ছিলেন কবি।

ঋকবেদের শেষের দিকে বর্ণাশ্রম প্রথা বোঝাতে বর্ণ শব্দের ব্যবহার দেখা যায় পববতী বৈদিক সমাজে বর্ণপ্রথা জাঁকিয়ে বসতে শুবু কবে। সেখানে বর্ণ বলতে আর গায়ের বং বোঝাত না। পরবতী বৈদিকযুগে চারটি বর্ণের উল্লেখ পাওয়া যায় এই চাববর্ণকে জন্মগত ধবে নিয়ে পেশা ঠিক কবা শুবু হতে থাকে। তার থেকেই জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি বলে অনেকে মনে করেন।

পুজা, যজ্ঞ, বেদ পাঠ ইত্যাদি কবতেন ব্রাম্বণবা। যুন্ধ করা, সম্পদ লুঠ করার কাজ ছিল ক্ষত্রিয়দেব। কারিগরি, কৃষি ও বাণিজ্য বৈশ্যদেব কাজ এই তিনবর্ণেব সেবা করত শূদ্ররা। যুন্ধবন্দি দাসবাই মূলত শূদ্র ছিল। পরবর্তী বৈদিক আমলে জটিল যাগযজ্ঞ অনেক বেড়ে গিয়েছিল তার সঞ্চো বেডেছিল ব্রায়্বণদের ক্ষমতাও। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যগুলি ব্রায়্বণবাই লিখেছিলেন। সেগুলিতে তাই ব্রায়্বণদের শ্রেষ্ঠ বলেই ঘোষণা করা হয়েছিল। ব্রায়্বণদের ঠিক পরেই ছিল ক্ষত্রিয়বা। পরবর্তী বৈদিক সমাজে কৃষিকাজ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। সেই সমাজে ক্ষত্রিয়বা আন্তে আন্তে শক্তিশালী হতে থাকে। এমনকি কে বড়ো, তা নিয়ে ব্রায়্বণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে গোলমাল বাঁধতে শ্বু করে।

পববর্তী বৈদিক সমাজে বৈশ্য ও শৃদ্রদের অবস্থা আন্তে আন্তে খারাপ হয়েছিল। পববর্তী বৈদিক সাহিত্যে বৈশ্যদেব হেয় কবে দেখানো হয়েছে। বর্ণব্যবস্থার সবথেকে খারাপ প্রভাব পড়েছিল শৃদ্রদেব উপর। তাদেব কোনো সামাজিক সুযোগসুবিধা প্রায় ছিল না

्रेकासा यथा

সত্যকামের কথা

সত্যকাম তার বাবাব পরিচয় জানত না পড়াশোনার জন্য গুরুব কাছে গোলে গুবু তার গোত্র জানতে চান সত্যকাম তার মা জবালাকে নিজেব গোত্র জানতে চাইলো জবালা বললেন, 'আমি তা জানি না। কেউ জিজ্ঞাসা কবলে তুমি বলবে যে, তুমি সত্যকাম জাবাল '

সতাকাম গুবু গৌতমেব কাছে গিয়ে বলল, 'আমি আমার গোত্র জানি না। আমার মা বললেন আমার নাম সত্যকাম জাবাল' গৌতম বললেন, 'তুমি সত্য কথা বলেছো তাই তোমাকে আমি শিক্ষাদান করব।'

রায়েশের প্রকৃত
পবিচয় কী ছিল ? এই
 অবস্থার কখন কেন
পবিকর্তন হয়েছিল বলে
 মনে হয়?

्रेवास्त्र वथा

চতুরাশ্রম

পববতী বৈদিক যুগে জীবনযাপনের চাবটি ভাগ বা পর্যায় ছিল ब शहर्य, भार्यस्था, বাণপ্রস্থ এবং সন্মাস ছাত্রাবস্থায় গুরুগুহে থেকে শিক্ষালাভ করা 'ছিল *বহচযাশ্ৰম* শিক্ষালাভেব পব বিয়ে করে সংসার জীবন যাপনকে বলা হতো গাঠস্থ্যাত্রম বাণপ্রস্থা শ্রম বলা হতে। সংসাব থেকে দুরে বনে কৃটিব বানিয়ে ধর্মচর্চা কবাকে। সবকিছু ভূলে ঈশ্ব্রচিন্তায় শেষ জীবন ন কটানোকে বলা হতো সয়াাস আশ্রম। এই চারটি পর্যায়কে একসংখ্য চতুবাশ্রম বলা হতো। শুদ্রদের এই জীবনযাপনের অধিকার ছিল না

মনে রেখো

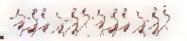
গোষ্ঠীর গবাদিপশু রাখাব জায়গাকে বলা হতো পোত্র পরে গোত্রের মানে দাঁডায় একই পূর্বপুবুষ থেকে আসা উত্তরাধিকারী জাতিভেদ প্রথা কঠোর হওয়ার ক্ষেত্রে গোত্রের জবুবি ভূমিকা ছিল

আদি বৈদিক সমাজে অনেক নাবী শিক্ষা লাভ কবতেন। এমনকি সমিতিব বৈঠকেও কিছু নাবী যোগ দিতেন বলে জানা যায় যুম্পেও তাবা অংশ নিতেন। ঋকবেদে কোথাও বাল্যবিবাহেব কথা নেই। সতীদাহ প্রথার কথাও সেখানে পাওয়া যায় না। যজ্ঞেও নারীবা অংশ নিতে পারতেন।

পরবর্তী বৈদিক সমাজে নারীদের অবস্থাও খারাপ হয়েছিল মেয়ে জন্মালে পরিবারে সবাই দুহুখ পেত। ছোটো বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওযার প্রথা শুরু হয়েছিল যুদ্ধে বা সমিতির কাজে মেয়েদেব আর যোগ দিতে দেখা যেত না।

বৈদিক সমাজে পাশাখেলা ছিল খুব জনপ্রিয়। সভা ও সমিতিতেও পাশা খেলা হতো। রথ ও ঘোডদৌডের প্রতিযোগিতা দেখতে মানুষ ভিড করত গানবাজনারও প্রচলন ছিল বৈদিক সমাজে। যব, গম ও ধান ছিল প্রধান খাদ্যশস্য। আদি বৈদিক সমাজে নানারকম মাংস খাওয়ারও প্রচলন ছিল





টুকাব্রো কথা বৈদিক সমাজ ও ধর্ম

বৈদিক যুগে মূর্তি পুজো প্রচলিত ছিল না। কিন্তু দেবদেবীর মূর্তি কল্পনা কবা হতো মানুষেব মতন। কোনো মন্দিবেব উল্লেখ নেই বৈদিক সাহিত্যে। ধর্মচর্চা মূলত ছিল আচার অনুষ্ঠান নির্ভর এবং যজ্ঞকেন্দ্রিক। যজ্ঞে গোরু, যোডা ইত্যাদি পশু বলি দেওয়া হতো। ঋকবেদের দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি সূর্য, মিত্র, অশ্বিনীদ্বয়, সোম প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। উষা, সবস্বতী, অদিতি, পৃথিবী প্রভৃতি ছিলেন উল্লেখযোগ্য দেবী যুন্থেব ও বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্র ঋকবৈদিক যুগের প্রধান দেবতা। সূর্যদেবতা সবিতৃ-র উদ্দেশ্যে গায়ত্রী মন্ত্র রচিত হয়েছিল পববর্তী বৈদিক যুগে বুদ্র ও বিষু গুবুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। যজ্ঞ ও আচার অনুষ্ঠান অনেক গুণ বেডে যায় যজ্ঞে অনেক পশু হত্যা করা হতো যজ্ঞে দান করা হতো পশু, সোনা ও জমি। পুরোহিত বা ব্রান্থণরা এভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে ধর্মীয় আচার নিয়মের জন্য বৈদিক ধর্ম ধীবে ধীবে ব্রান্থণাধর্মের বুপ নিতে লাগল তবে উপনিষদে নিবাকাব এক ঈশ্ববের ভাবনা পাওয়া যায়

বৈদিক যুগের শিক্ষা

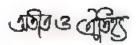
বৈদিক সাহিত্য থেকেই সেই যুগের শিক্ষা ব্যবস্থার ধাবণা আমবা পাই। শিক্ষা ব্যবস্থাব প্রধান ছিলেন গুরু মৌখিকভাবেই শিক্ষাব চর্চা হতো গুবু একটা অংশ পড়ে তার মানে বুঝিয়ে দিতেন। ছাত্ররা সেই পুবোটা শুনে আবৃত্তি করত ও মনে রাখত। মুখস্থা কবার ক্ষেত্রে সঠিক উচ্চারণের উপরে বিশেষ জোব দেওযা হতো। বৈদিক যুগেব কোনো লিপিব খোঁজ প্রত্নতাত্ত্বিকরা পাননি।

পরবর্তী বৈদিক যুগে শিক্ষার সঙ্গে উপনয়নেব সম্পর্ক দেখা যায়। ছাত্র শিক্ষা নেওয়াব জন্য গুরুব কাছে আবেদন কবত। উপযুক্ত মনে কবলেই উপনয়ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে গুরু সেই ছাত্রকে শিষ্য হিসেবে মেনে নিতেন। মেয়েদেরও যে উপনয়ন হতো তাবও বেশ কিছু প্রমাণ দেখা যায়। গুবুব কাছে থেকেই ছাত্ররা শিক্ষা লাভ করত। সেখানে পডাশোনার পাশাপাশি অন্যান্য কাজকর্মও ছাত্রদের করতে হতো। ছাত্রদের থাকা খাওয়ার দায়িত্ব ছিল গুবুর উপরে

प्रेकाखा कथा

বৈদিকপড়াশোনা ও শ্রুতি

বৈদিক সাহিত্য মূলত শুনে শুনে মনে বাখতে হতো। তাই বেদের আরকে নাম শ্রুতি। ঋকবেদে ভেকস্তৃতি বলে একটা অংশ আছে সেখানে বলা আছে একটি ব্যাং ডাকলে অন্যান্য ব্যাং তার মতেই ডাকতে থাকে ঠিক তেমনি ঋকরেদেব সুক্তগুলি মনে করে গুব বা একজন শিক্ষার্থী আবৃত্তি কবত। বাকিবা শ্নেশুনে মনে রেখে সেটাই নিখুঁতভাবে বলত। সেকাবণে নির্ভুল উচ্চারণ করে বৈদিক মন্ত্রগুলি বলার দক্ষতা অর্জন করতে হতো। তাই ছুদ ও ব্যাকরণ বৈদিক শিক্ষাব দুটি প্রধান বিষয়





টুকান্ত্রে কথা আরুণির কথা

মহর্ষি আয়োদধীম্য ছিলেন একজন আদর্শ গুরু। তাঁর তিনজন বিখ্যাত ছাত্র ছিল। বেদ, উপমন্যু ও আরুণি। গুরুভক্তি পরীক্ষা করার জন্য আযোদধীম্য তাঁর শিষ্যদের নানা কঠিন কাজ দিতেন। একদিন তিনি আরুণিকে ক্ষেতের জল বেব হওয়া জায়গায় আল বাঁধতে বললেন। আরুণি আল বাঁধার অনেক চেষ্টা করতে লাগল। কিতৃ ক্ষেতের সব জল ঐ জায়গা দিয়েই বার হয়। তাই আল বাঁধা মুশকিল হলো। এদিকে গুবুর আদেশ পালনেব জন্য আরুণিকে জলস্রোত আটকাতে হবেই। তখন আরুণি নিরুপায় হয়ে আলের উপর নিজে শুয়ে পড়ল। সেভাবেই নিজের শরীর দিয়ে জলস্রোত আটকে রাখতে চেষ্টা করল। আবুণির ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে মহর্ষি তার খোঁজে ক্ষেতে এসে পোঁছোলেন। গুরুর ডাক শুনে আরুণি ক্ষেত থেকে উঠে গেল। আয়োদধীম্য আরুণির মুখে সব শুনে শিষ্যের গুরুত্তিতে খুব খুশি হলেন। ক্ষেতের আল বা কেদারখণ্ড ভেদ কবে আরুণি উঠে এসেছিল বলে মহর্ষি তার নাম দিলেন উদ্দালক। উদ্দালক নিজেও পরে খুব বিখ্যাত গুরু হয়েছিলেন।

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহামের ধারা

有多次的自己的

বেদপাঠ কবানোর মধ্যে দিয়েই শিক্ষাদান কবা হতো তার সঞ্চো গণিত, ব্যাকরণ ও ভাষাশিক্ষাব উপবও জোব দেওয়া হতো হাতেকলমে অনেক কিছুই শিখতে হতো ছাত্রদেব নিজেকে বক্ষা কবা ও অস্ত্রচালানো শিখতে হতো। এমনকি ব্রায়্বণবাও অস্ত্রশিক্ষা গ্রহণ কবত। যেমন, মহাভারত থেকে দ্রোণাচার্য, কৃপ, পবশুবামেব কথা জানা যায়। ছাত্রবা চিকিৎসা করা শিখত। মেয়েবা অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গো নাচ ও গানের চর্চা কবত।

ং ভবে দেখো

তোমবা পডাশোনাব সঙ্গে হাতেকলমেও কি কাজ শেখো ? হাতেকলমে কী কী শিখেছ ?

সাধারণত বারো বছর ধবে শিক্ষা গ্রহণ চলত আনেকে আবার জীবনভবই ছাত্র থাকত। এমনিতে বাবো বছরের পডাশোনা শেষ হলে সমাবর্তন অনুষ্ঠান হতো সেই অনুষ্ঠানে ছাত্রদের স্লাতক বলে ঘোষণা কবা হতো পডাশোনার শেষে ছাত্রদের বিশেষ স্লান করাব প্রথা ছিল। তাব থেকেই স্লাতক কথাটা এসেছে গুবুগৃহ ছেডে চলে যাবাৰ আগে ছাত্রবা সাধ্যমতো গুবুদক্ষিণা দিত। গুবুদক্ষিণা হিসাবে গোবুদান কবার কথা জানা যায়।

्रेकखा कथा

একলব্য

ভিলদেব রাজা ছিলেন হিরণ্যধনু তাঁর একমাত্র ছেলের নাম একলব্য। একলব্য খুবই সাহসী ও পবিশ্রমী। একলব্যেব ইচ্ছা হলো সে তিব ছুঁড়তে শিখবে। সে শুনেছে গুরু দ্রোণাচার্য খুব বড়ো অস্ত্র-শিক্ষক।

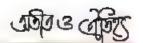
ঘবে ফিবে বাবাকে দ্রোণাচার্যেব বিষয়ে জানতে চাইল একলব্য হিবণাধনু বললেন, ব্রায়ণ দ্রোণাচার্য শুধু ক্ষত্রিয় বালকদেবই অস্ত্র শিক্ষা দেন ভিল বালককে কিছুতেই আচার্য দ্রোণ নিজেব শিষ্য করবেন না। সেকথা শুনে একলব্য বলল, তির ছোঁডা শুধু আচার্য দ্রোণের কাছেই শিথব

দ্রোণেব কৃটিবে গিয়ে একলব্য তাঁকে প্রণাম কবে তাবপরে নিজের পরিচয় দিল। দ্রোণকে বলল, আপনাব কাছে তির ছোঁড়াব শিক্ষা নিতে এসেছি। আমায় আপনার শিষ্য করে নিন গুরুদেব। দ্রোণ ভালো করে বুঝিয়েই বললেন, আমি তোমাকে শিষ্য করতে পারব না। আমি শুধু ক্ষত্রিয়দেরই অস্ত্র শিক্ষা দিই তুমি ভিলকুমার। ঘরে ফিরে যাও

प्रेकाखा कथा

বৈদিক পড়াশোনা ও বিজ্ঞানচর্চা

বৈদিক শিক্ষায় গণিতেব চর্চা হতো। যজ্ঞবৈদি বানানোব জন্য জ্যামিতিব জ্ঞান প্রয়োজন হতো। যজ্জবেদিব ইট পোডানো হতো ঠিক মতো ইট বানানো ও পোডানোর দায়িত্ব পড়ত ইটেব কারিগবদের ওপর আর যজ্ঞবেদি বানাত মিস্ত্রি আর স্থপতিবা ফলে স্থপতিদেব হাতেই বৈদিক গণিতচর্চা শুবু হয়েছিল। যজ্জের বেদি তৈবিতে শ্রমিক, ছুতোব, গণিতবিদদের দরকাব হতো। তবে ঋকবেদে ইটেব কথা নেই। সেকথা প্রথম পাওয়া যায় যজুর্বেদে যজ্ঞেব বেদি তৈরির জন্য বিভিন্নবকম যন্ত্ৰেব ব্যবহাব হতো। কবাব গ্রহ-নক্ষত্র ও কাল, ঋতুর সঠিক ধারণা দরকাব ছিল সেই চর্চা থেকেই জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে জানা-বোঝা শুবু হয় অথর্ববেদের একটা অংশে চিকিৎসাবিদ্যা বিষয়েও আলোচনা দেখা যায়



খুব মন খারাপ হয়ে গেল একলব্যর। দ্রোণের কুটিব থেকে বেবিয়ে ঘবেব দিকে ফিরল না। জম্পলে গিয়ে সে মাটি দিয়ে আচার্য দ্রোণের একটা মূর্তি তৈরি করল আর একাই ঐ মূর্তির সামনে তির ছোঁড়া অভ্যাস করতে লাগল। একটানা অভ্যাস চালিয়ে গেল একলব্য এভাবে অনেকদিন পর সে সত্যিই বিরাট তিবন্দাজ হয়ে উঠল।

একদিন সেই মূর্তির সামনে একলব্য তির ছোঁড়া অভ্যাস করছে হঠাৎ একটা কুকুবেব চিৎকারে তার মনোযোগ নষ্ট হয়ে গেল। বাধ্য হয়ে তির ছুঁডে কুকুবটার মুখ আটকে দিল একলব্য সেই অবস্থায় কুকুবটা দৌডে চলে গেল কৌবব ও পাণ্ডব রাজকুমাবদেব কাছে। কুকুবেব অবস্থা দেখে তাবা বুঝল এভাবে তিব মাবা আশ্চর্যেব ব্যাপাব। অর্জুনও এত অসাধাবণ তির ছুঁড়তে পাবে না দ্রোণাচার্য চমকে উঠলেন কুকুবটাকে দেখে।

ব্যাপাব। অর্জুনও এত অসাধাবণ তির ছুঁড়তে পাবে না দ্রোণাচার্য চমকে উঠলেন কুকুবটাকে দেখে। তিনি মনে মনে ঐ তিরন্দাজেব তারিফ কবলেন কিছদুব গিয়েই দ্রোণ দেখলেন একলব্য তির ছোঁডা অভ্যাস করছে তিনি একলব্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার গুরু কে? একলব্য জানাল, আচার্য দ্রোণ আমার গুরু। তখন একলব্য স্বাইকে দ্রোণাচার্যের মর্তিটা দেখাল দ্রোণ একলব্যের পরিশ্রম <mark>ও শেথাব আগ্রহ</mark> দেখে খুবই খুশি হলেন। অথচ অর্জুনকে তিনি কথা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তাকেই পৃথিবীর সেবা ধনুর্ধারী <mark>বানাবেন। কিন্তু একলব্য অর্জুনকেও ছাড়িয়ে গেছে। নিজের কথাব</mark> খেলাপ হবে ভেবে দ্রোণ একটা উপায় ঠিক কবলেন। একলব্যকে বললেন, তুমি আমাকে গুবুদক্ষিণা হিসাবে কী দেবে? একলব্য বলল, আপনি যা চাইবেন তাই দেবো। দ্রোণ বললেন, তবে তোমার ভান হাতের বুডো আঙুলটা আমায় দাও। নিজের ডান হাতের বুডো আঙুলটা কেটে **ट्यांगरक** फिरम फिल একলব্য। এরপর একলব্য তার 🖑 ডান হাতের বুডো আঙুল ছাডাই তির ছঁডতে শিখেছিল তবু আগের মতো সে আর তির ছ্ডতে পারতো না। একলব্যের কথা মহাভারতে আছে। মহাভারত পববতী বৈদিক যুগের বচনা।



8.8 বৈদিক যুগে অন্যান্য সমাজ

পুরো ভাবতীয় উপমহাদেশ জুডে বৈদিক সভ্যতা ছডিয়ে পডেনি। সিন্ধু ও গঙ্গা নদীর উপত্যকা অঞ্চলেই বৈদিক বসতি ছিল। পূর্ব, উত্তব-পূর্ব ও দক্ষিণ অংশে বৈদিক সভ্যতা ছিল না উপমহাদেশেব অন্যান্য অঞ্চলে ঐসময়ে অন্যরকম সংস্কৃতির খোঁজ পোয়েছেন প্রত্নতাত্ত্বিকরা। সেই সংস্কৃতিগুলিতে মানুষ পাথব ও তামার অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করত কালো ও লাল রঙের মাটির পাত্র তারা ব্যবহার করত। মাটির তৈরি ভাঙা বাডিঘরও খুঁজে পেয়েছেন প্রত্নতাত্ত্বিকরা। পশ্চিমবঙ্গে মহিষদলে তেমনই একটি সংস্কৃতির খোঁজ পাওয়া গেছে। সেখানে গ্রামীণ কৃষিসমাজ ছিল বলে জানা যায়। তাবা মৃতদেহকে সমাধি দিত। এমনই একটি সমাজের খোঁজ পাওয়া গেছে মহারাষ্ট্রেব ইনামগাঁওতে।

মেগালিথ

মেগালিথ হলো বড়ো পাথরের সমাধি। প্রাচীন ভারতে লোহার ব্যবহারেব সঙ্গো এই সমাধির সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। বিভিন্ন অঞ্চলের জনগোষ্ঠী বড়ো বড়ো পাথর দিয়ে পরিবারের মৃত ব্যক্তিদের সমাধি চিহ্নিত করত। বড়ো পাথর দিয়ে চিহ্নিত এই সমাধিগুলোর নানা বকমফের দেখতে পাওয়া যায় কোথাও আকাশেব দিকে তাকিয়ে থাকা বড়ো একটি পাথব। কোথাও বৃত্তাকারে সাজানো অনেক পাথর কোথাও অনেকগুলো পাথব ঢাকা দেওয়া বয়েছে একটা বড়ো পাথর দিয়ে কোথাওবা পাহাড কেটে বানানো গুহার ভেতব সমাধি। এইসব সমাধিগুলো থেকে মানুষের কঙ্কাল ও তাদের ব্যবহারেব জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। কাশ্মীরের বুরজাহোম, রাজস্থানের ভরতপুর, ইনামগাঁও বিখ্যাত মেগালিথ কেন্দ্র। তবে এই বড়ো পাথরের সমাধিগুলো বেশি পাওয়া যায় দক্ষিণ ভাবতে। এইসব জায়গায় কালো বা লাল মাটির বাসন, পাথব, পোডামাটিব তৈবি জিনিসপত্র পাওয়া গেছে। তাছাডা লোহা, সোনা, বুপো, ব্রোঞ্জেব জিনিসও বয়েছে। ঘোডা ও অন্যান্য জীবজভুব হাড়, মাছেব



কাঁটা ইত্যাদিও পাওয়া গেছে। ব্যবহার করা জিনিসের তফাত থেকে বোঝা যায় ঐসব সমাজে ধনী-দরিদ্র ভাগ ছিল। জানা যায় যে, কোনো কোনো জায়গায় একসঙ্গো একটি পরিবাবের সমাধি দেওয়া হতো। 999

ভেবে দেখো

লোহাও ঘোড়াব ব্যবহাব
শুরু হওয়ার ফলে
ভাবতীয়উপমহাদেশে কী
কী বদল ঘটেছিল বলে
তোমার মনে হয় ?

ছবি ৪.১: একটি মেগালিথ

মনে রেখো

ছোটোনাগপুরে মুণ্ডা,
আসামে খাসিদের মধ্যে
মেগালিখ ব্যবস্থা এখনও
রযেছে। পশ্চিমবঙ্গের
বাঁকুডা, হুগলি ও পুরুলিয়ায়
এমন সমাধিক্ষেত্র দেখা
'যায়।

টুকস্ত্রে কথা এক নজরে ইনামগাঁও

- ≭ মহারাষ্ট্রের পুণে জেলার একটি প্রত্নক্ষেত্র একটি মেগালিথ কেন্দ্র
- ★ ভীমা নদী উপতাকার এই কেন্দ্রে খ্রি পৃ ১৪০০ থেকে খ্রি পৃ ৬০০ অব্দ সময়কালেব মানুষের বাস ছিল
- ≭ কৃষি, পশুপালন ও মৎস্যশিকার ছিল তাদের প্রধান জীবিকা।
- ≭ আয়তাকার প্রায় ১৩৪ টি ঘরের খোঁজ পাওয়া গেছে।
- * ৬ মিটার চওড়া, ৪২০ মিটাব লম্বা একটি সেচখালেব অবশেষ পাওয়া গেছে।
- ≭ গম, যব, ডাল ও ধান ছিল প্রধান উৎপন্ন খাদ্যশস্য
- ★ বাডিতে শস্য মজুত বাখাব জালা, আগুন জ্বালাবার গর্ত পাওয়া গেছে। বাডিব লাগোয়া সমাধিক্ষেত্রও পাওয়া গেছে
- ≭ দামি পাথরেব হাব পরা দু বছবেব বাচ্চা মেয়েব সমাধি পাওয়া গেছে।
- ≭ পাত্রের গায়ে পাওয়া গেছে যাঁডে টানা গাডির ছবি।
- ≭ মাথাসমেত ও মাথা ছাড়া দুটি দেবীমূর্তি পাওয়া গেছে।
- ★ প্রতিটি বাড়িতেই মাটিব পাঁচিল, মাংস ঝলসাবাব জন্য উনুন ছিল।
- শেষপর্বে আয়তাকার বাড়ির বদলে ছোটো গোলাকার কুঁডে তৈবি হতে থাকে।
- ≭ কালো ও লাল মাটিব বাসনপত্র, লোহাব জিনিস ইত্যাদি পাওয়া গেছে।
- ≭ পবের দিকে ঘোডার অস্তিত্ব পাওয়া গেছে
- পাঁচটি ঘরওলা একটি বড়ো বাড়িতে উত্তরে মাথা কবা একটি সমাধি পাওয়া গুছে। হয়তো সেটা ছিল গোষ্ঠীপতিব সমাধি।



ছবি ৪.২: মেগালিথ কেন্দ্ৰ

ভেবে দেখো



>৷ সঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শৃন্যস্থান পূরণ করো :

- ১ ১) আদি বৈদিক যুগের ইতিহাস জানার প্রধান উপাদান— (জেন্দ অবেস্তা/মহাকাব্য/ক্ষকবেদ)
- ১২) মেগালিথ বলা হয়— (পাথরের গাডি/পাথরের সমাধি/পাথরের খেলনা) কে
- ১৩) ঋকবেদে রাজা ছিলেন—(গোষ্ঠীর প্রধান/রাজ্যের প্রধান/সমাজের প্রধান)।
- > ৪) বৈদিক সমাজে পরিবারের প্রধান ছিলেন (রাজা/বিশপতি/বাবা)

২। বেমানান শব্দটি খুঁজে লেখো:

- ২.১) ঋকবেদ, মহাকাব্য, সামবেদ, অথর্ববেদ
- ২.২) ব্রান্নণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, নৃপতি
- ২.৩) ইনামগাঁও, হস্তিনাপুর, কৌশাস্বী, গ্রাবস্তী
- ২.৪) উষা, অদিতি, পৃথিবী, দুর্গা

৩। নিজের ভাষায় ভেবে লেখো (তিন/চার লাইন):

- ৩.১) বেদ শৃনে শৃনে মনে রাখতে হতো। এব কাবণ কী বলে তোমার মনে হয়?
- ৩২) বৈদিক সমাজ চাবটি ভাগে কেন ভাগ হয়েছিল বলে তোমার মনে হয়?
- ৩৩) বৈদিক যুগের পড়াশোনায় গুবু ও শিষ্যেব সম্পর্ক কেমন ছিল বলে মনে হয়?
- ৩৪) আদি বৈদিক ও পববতী বৈদিক যুগে নারীর অবস্থার কি কোনো বদল হয়েছিল? বদল
 হয়ে থাকলে কেন তা হয়েছিল বলে মনে হয়?

৪৷ হাতেকলমে করো:

- 8.১) বৈদিক সমাজে বাজাৰ ধাবণাব বদল একটি চার্টেব সাহায্যে দেখাও
- ৪.২) বৈদিক সমাজে জীবিকাগুলির একটি চার্ট তৈরি করো।

D

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের ভারতীয় উপমহাদেশ

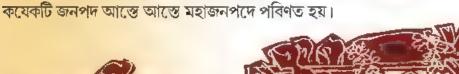
রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং ধর্মের বিবর্তন - উত্তর ভারত

বিব দাদু জানতে চাইলেন, তোমবা রূপকথাব গল্প নিশ্চয়ই পড়েছ ? আজ দাদু ওদের বৃপকথার গল্প শোনাছেন যদিও ওবা ক্লাস সিক্সে পড়ে, তবুও রূপকথার গল্প শোনার মজাই আলাদা কত রাজা, বানি, বাজপুত্র, বাজকন্যা সঙ্গো আছে পক্ষীবাজ ঘোড়া, তেপান্তবেব মাঠ। সবমিলিয়ে বেশ জমজমাট কিন্তু রূপকথার গল্প শুনতে শুনতে পলাশেব মনে একটা ভাবনা আসে। রূপকথায় রাজার নাম থাকে না। সেই বাজা কবে, কোথায় ছিলেন তাও বলা থাকে না। দিদিমণি বলেছিলেন, রূপকথা ইতিহাস নয়। পলাশের খুব জানতে ইচ্ছা করে ইতিহাসের বাজা-রানিদের কথা পরদিন ক্লাসে সেই ইচ্ছাব কথাই জানাল পলাশ। দিদিমণি বললেন, বেশ তো, এবারে তাহলে বাজাব কথাই হোক।

৫.১. জনপদ থেকে মহাজনপদ

প্রাচীন ভাবতে গ্রামের থেকে বড়ো অঞ্চলকে জন বলা হতো সেই জন-কে কেন্দ্র করেই তৈরি হযেছিল ছোটো ছোটো বাজ্য। এইভাবে জন শব্দ থেকেই জনপদ শব্দটি এসেছিল। আরেক দিক থেকে সাধাবণ মানুষ বা জনগণ যেখানে বাস করত তাকে বলা হতো জনপদ। অর্থাৎ জনগণ যেখানে পা বা পদ রাখেন, সেটাই জনপদ। কোনো একটি নির্দিষ্ট এলাকায় জনগণ পাকাপাকিভাবে বাস কবতে থাকলে তা জনপদ হয়ে ওঠে।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের গোড়াব দিকে ভারতীয উপমহাদেশে এইরকম অনেকগুলি জনপদেব কথা জানা যায় সেসব জনপদগুলি অনেক সময়েই পরিচিত হতো সেখানকার শাসক বংশের নামে ঐ জনপদগুলিকে ভিত্তি করেই পবেব দিকে বড়ো বড়ো রাজ্য তৈরি হয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকরা ভাবতীয় উপমহাদেশেব কয়েকটি জায়গায় মাটি খুঁড়ে এরকম জনপদেব খোঁজ পেয়েছেন মগধেব মতো





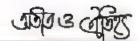
খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক নাগাদ একেকটা জনপদেব ক্ষমতা ব্রুমে বাডতে থাকে সেখানকার শাসকবা যুশ্ব কবে নিজেদেব বাজ্যের সীমানা বাডাতে থাকেন। ছোটো ছোটো জনপদগুলিব কয়েকটি পরিণত হয় বড়ো বাজ্যে। এই বড়ো বাজ্যগুলিই মহাজনপদ বলে পবিচিত হয়।জনপদেব থেকে যা আয়তন ও ক্ষমতায় বড়ো তাই মহাজনপদ। মহাজনপদগুলির শাসকবা ছিলেন বৈদিক যুগের বাজাদেব চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী। তাঁদেব হাতে অনেক সম্পদ জমা হলো। সেই সম্পদ ব্যবহাব কবে তাঁবা নিজেদেব ক্ষমতা আবো বাড়াতে চাইলেন। ফলে প্রায়শই লেগে থাকত যুশ্ব।

ষোড়শ মহাজনপদ

জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যেও জনপদ-মহাজনপদের আলোচনা পাওয়া যায়। সেগুলি থেকে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ
শতকে ভারতীয় উপমহাদেশে যোলোটি মহাজনপদের কথা জানা যায়। সেইসময়ে এদেরকে একসঙ্গে
ষোড়শ মহাজনপদ বলা হতো মহাজনপদগুলির মধ্যে ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকত একে অন্যের
বাজ্য জয় করে নিজেদের রাজ্যের সীমানা বাড়াতে চাইত। এইভাবে ক্রমে যোলোটা মহাজনপদ কমতে
কমতে চারটে মহাজনপদে এসে দাঁড়াল। এগুলি হলো অবস্তী, বৎস, কোশল ও মগধ। এই চারটে মহাজনপদ
আবার নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করত। তাদের মধ্যে শেষপর্যন্ত মগধ হয়ে ওঠে সবথেকে বেশি শক্তিশালী।

যোলোটি মহাজনপদেব বেশিবভাগই ছিল আজকের মধ্য ও উত্তর ভারত অঞ্চলে। দক্ষিণ ভারতের একমাত্র মহাজনপদ ছিল অম্মক। মানচিত্র (৫.১) থেকে দেখা যাচ্ছে যে, গঙ্গা-যমুনার উপত্যকাকে ভিত্তি কবেই বেশিবভাগ মহাজনপদ গড়ে উঠেছিল। গঙ্গা নদীর উপতাকা অঞ্চল ছিল সেই সময়ের





বিবাট গ**ণ্গা** উপত্যকা ছিল একটি সমতল অঞ্চল। ফলে রাজ্য জয়েব ক্ষে<u>ত্রে</u> প্রাকৃতিক বাধা ছিল না। যথেষ্ট বৃষ্টি হওয়াব ফলে পলিমাটিব জমি ছিল উর্বর চাষ হতো খুবই ভালো। পাশাপাশি গভীর বনও ছিল। বনে কাঠ থেকে হাতি সবই পাওয়া যেত। নদীপথে যাতাযাত

করারও সুবিধা ছিল। এসবের ফলেই ঐ অঞ্চলের

মহাজনপদগুলি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

মহাজনপদের শাসন ব্যবস্থা

অধিকাংশ মহাজনপদেই ছিল রাজার শাসন সেই মহাজনপদগুলিকে বলা হতো বাজতান্ত্ৰিক বাজ্য। রাজতান্ত্রিক বাজ্যগুলিতে শাসনব্যবস্থাব সবচেয়ে উপরে ছিলেন রাজা রাজা বিশেষ কোনো বংশের সদস্য ছিলেন সেই বংশই বছবেব পব বছর রাজত্ব কবত। একসময়ে তাদেব হাবিয়ে অন্য বংশেব কেউ আবার বাজা হতেন। শাসনের কাজে রাজাকে সাহায্য করত একটি সভা তার সদস্যরা বাজাকে নানা বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। রাজ্যগুলিতে জমি জরি<mark>প করে কর</mark> সংগ্রহ কবা হতো কব থেকে পাওয়া টাকায় বাজ্যের শাসন কাজের খবচ চলত।

এরকম একটি রাজতান্ত্রিক মহাজনপদ ছিল মগধ। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের আগে মগধ ছিল দক্ষিণ বিহাবেব একটি সামান্য এলাকা কিন্তু দক্ষ বাজাদেব নেতৃত্বে মগধ আন্তে আন্তে গুবুত্বপূৰ্ণ শক্তি হয়ে ওঠে। সেকালে মগধ বলতে এখনকার বিহারের পাটনা ও গয়া জেলাকে বোঝাত। মগধের বাজধানী ছিল বাজগৃহ। পবে পাটলিপুত্র রাজধানী হয়ে যায়।

মগধ রাজ্য নদী ও পাহাড় দিয়ে ঘেরা ছিল। ফলে বাইরের আক্রমণ থেকে মগধ সহজেই বেঁচে যেতে পাৰত। গঙ্গা নদীব পলিমাটি ঐ অঞ্চলেব কৃষিজমিকে উৰ্বব করে তুলেছিল। মগধ অঞ্চলেব ঘন বনগুলিতে অনেক হাতি পাওয়া যেত। সেই হাতিগুলি মগধের বাজারা যুন্থের কাজে ব্যবহার কবতেন। পাশাপাশি সেখানে অনেকগুলি লোহা ও তামাব খনি ছিল। ফলে মগধেব রাজাবা সহজেই লোহার অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহাব করতে পাবতেন। জল ও স্থলপথে মগধেব বাণিজ্য চলত এসব সুবিধাব ফলে মগধই শেষপর্যস্ত সবথেকে শক্তিশালী মহাজনপদে পবিণত হয়।

কয়েকটি মহাজনপদ ছিল অবাজতান্ত্ৰিক। সেখানে কোনো বাজাব শাসন ছিল না। সেগুলিকে বলা হতো গণবাজ্য। এবকম দুটি গুরুত্বপূর্ণ গণরাজ্য ছিল মল্ল ও বজ্জি বা বুজি। সাধারণভাবে গণরাজ্যগুলিতে একেকটি উপজাতি বাস কবত তাবা নিজেব নিজেব বাজ্যে অবাজতান্ত্রিক শাসন বজায় রেখেছিল।



মানচিত্র ৫.১ : যোড়শ মহাজনপদ (খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক)



গণবাজ্যগুলিতে জনগণ সবাই মিলে আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে কর্তব্য ঠিক করতেন। অবশ্য নারী ও দাসেরা ঐ আলোচনায় অংশ নিতে পারতেন না।

বাজতান্ত্রিক মহাজনপদগুলি গণরাজ্যগুলিকে দখল করতে চাইত। গণরাজ্যগুলিব মধ্যে তিনটি বাজ্য স্বাধীন থেকে গিয়েছিল। বজ্জিদের বাজ্য ও মল্লদের দুটি বাজ্য— পাবা ও কুশিনাবা। এদেব মধ্যে বজ্জিদেব শস্তি সবচেয়ে বেশি ছিল। বজ্জি মহাজনপদটি ছিল মগধের খুব কাছেই বজ্জিব শাসন ক্ষমতা ছিল ক্যেকটি গোষ্ঠীর হাতে

গৌতম বুন্ধের সময় বজ্জিবা একজোট ও স্বাধীন ছিল। বুন্ধ নিজেও বজ্জিদের সম্মান করতেন। বজ্জিদের রাজধানী ছিল বৈশালী। বৈশালীর আশেপাশে যেসব বজ্জি থাকত তাদেব বলা হত লিচ্ছবি। গৌতমবুন্ধ বজ্জিদেব একজোট থাকাব জন্য কয়েকটি নিয়ম পালনেব কথা বলেছিলেন। সেই নিয়মগুলি দেখে মনে হয় বজ্জিদের রাজ্যে আইনকানুন অনেকটা লেখা থাকত। সেখানে নিরপরাধ মানুষেব শাস্তি হতো না।

प्रेकाखा कथा

মগধের রাজাদের সাল-তারিখ

মগধ মহাজনপদে মোট তিনটি বাজবংশ শাসন করেছিল সেগুলি হলো হর্ষজ্ক, শৈশুনাগ এবং নন্দ রাজবংশ তবে ঠিক কবে কে মগধের রাজা ছিলেন, তা বলা মুশকিল একটা আনু মানিক সাল তারিখ অবশ্য তৈবি কৰা যায়। গৌতম বুন্ধের মাবা যাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে এই সালগুলো গোনা হয়েছে মনে কৰা হয় বাজা অজাতশত্ৰব বাজত্বেব আট বছরেব মাথায় গৌতম কুশ্ব মারা যান সেই সালটি ধবা হয় ৪৮৬ খ্রি পু। সেই হিসেবে মগধে হর্যজ্ঞ বংশের শাসন শুবু হয়েছিল ৫৪৫ খ্রিস্ট প্রান্দে। আর নন্দ বংশের শাসন শেষ হয়েছিল ৩২৪ খ্রিস্ট পূৰ্বাব্দে



রাজতান্ত্রিক মহাজনপদগুলির সঙ্গে লড়াইয়ের ফলে গণরাজ্যগুলি ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। যুদ্ধেব জন্য দবকাব হতো অনেক সৈন্য। সৈন্যদেব জন্য খরচ হতো অনেক। সেই খবচেব অর্থ জোগাড কবা হতো প্রজাদেব ওপব কব বসিয়ে। গণবাজ্যগুলিতে সেই বাডতি কর আদায় কবা সহজ ছিল না। পাশাপাশি সেগুলিব মধ্যে গোষ্ঠীবিবাদ পাকিয়ে ওঠে। ফলে গণবাজ্যগুলিব পক্ষে নিজেদেব অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছিল।

प्रेकाखा कथा

বজ্জিদের উন্নতির সাতটি নিয়ম

মগধেব বাজা অজাতশত্র একবাব বজ্জিদের বিবৃদ্ধে যুদ্ধের উদ্যোগ নিয়েছিলেন সে বিষয়ে গৌতম বৃদ্ধের মতামত জানতে তিনি একজন কর্মচারীকে বৃদ্ধেব কাছে পাঠান। বৃদ্ধ তখন নিজের শিষ্য আনন্দর সঙ্গে সে বিষয়ে কথাবার্তা বলেন। ঐ আলোচনায় বজ্জিদের দেওয়া বৃদ্ধের উপদেশেব মধ্যে সাতটি নিয়মেব কথা ওঠে। বৃদ্ধ বলেন, সেই নিয়মগুলি মেনে চললে বজ্জিদেব উন্নতি অটুট থাকবে। বাজা অজাতশত্র কোনোভাবেই বজ্জিদেব হারাতে পাববেন না সেই নিয়মগুলি হলো—

- ক) বজ্জিদের প্রায়ই সভা করে রাজ্য চালাতে হবে।
- বিজ্জদের সব কাজ সবাই মিলে একজোট হয়ে করতে হবে।
- গ) বজ্জিদেব নিজেদেব বানানো আইন অনুসাবে চলতে হবে
- য) বিজ্ঞাসমাজে বয়স্ক মানুষদের কথা শুনে চলতে হবে ও তাদের সম্মান করতে হবে।
- ঙ) বজ্জিসমাজে নারীদের সবসময় সম্মান করে চলতে হবে।
- চ) বজ্জিদেব সমস্ত দেবতার মন্দিবগুলিব যত্ন নিতে হবে
- ছ) নিজেদের অঞ্জলে গাছপালা ও পশুপাখিদের উপর অত্যাচাব করা যাবে না

৫.২ নব্যধর্ম আন্দোলন

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক নাগাদ ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতি বদলাতে শুরু করে। কৃষি হয়ে ওঠে বেশিবভাগ মানুষের প্রধান জীবিকা লোহার লাঙলের ব্যবহার বাড়ায় ফসলের উৎপাদন খুব বেডে যায়। পাশাপাশি নতুন নতুন নগর এই সময় গড়ে উঠছিল। সেগুলিব বাসিন্দাদেব একটা বড়ো অংশ ছিল ব্যবসায়ী ও কারিগর। ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনেকেই বেশ ধনী ছিল

555

ভেবে দেখো

গৌতম বৃন্ধ বজ্জিদের
যে সব পরামর্শ
দিয়েছিলেন তার মধ্যে
কোনগুলো আজও
মেনে চলা উচিত ? তা
নিয়ে নিজেদেব মধ্যে
আলোচনা করে।

李51230年

যজ্ঞ, পশ্বলি ও যুদ্ধেব ফলে কৃষক ও ব্যবসায়ীদের নানা ক্ষতি হতো। চাষের কাজে গবাদিপশুর প্রয়োজন হতো। তাই যজ্ঞে পশুবলি দেওয়া কৃষকদের পক্ষেমেনে নেওয়া সহজ ছিল না। পাশাপাশি বিভিন্ন জনপদ ও উপজাতিগুলির মধ্যে লড়াই-ঝগড়া ব্যবসার ক্ষতি করেছিল। অথচ নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থাও ব্যবসার জন্য জরুরি ছিল। ধর্মের নামে বেড়েছিল আড়ম্বর ও অনুষ্ঠান। আগে সমাজে কাজের ভিত্তিতে শ্রেণিভাগ ছিল কিন্তু পবে তা জন্মগত হয়। আব এভাবে প্রবল হয় জাতিভেদ। এই জাতিভেদ প্রথার জন্য সাধারণ মানুষ বৈদিক ধর্মেব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। তাই সমাজে নতুন ধর্মমতের চাহিদা তৈরি হয়েছিল।

বাণিজ্যেব জন্য সমুদ্রযাত্রা অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হতো। অথচ সমুদ্রযাত্রাকে পাপ হিসাবে দেখত ব্রাল্মণেবা। ব্যবসা চালাতে গেলে পযসাব লেনদেন ও সুদে টাকা খাটানোর দবকাব পড়ত। কিন্তু সুদ নেওয়া ব্রাল্মণ্য ধর্মে নিন্দাব বিষয় ছিল।

লোহার তৈবি অস্থ্রশস্ত্র ক্ষত্রিয়দের ক্ষমতা আরও বাডিয়ে দিয়েছিল ফলে ক্ষত্রিয়বা রাত্মণদের সমান ক্ষমতা দাবি কবতে থাকে। এইভাবে সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ রাত্মণদের বিরুদ্ধে দাঁডাতে শুরু করেছিল। রাত্মণ্য ধর্মের বদলে নতুন সহজ সরল ধর্মের খোঁজ শুরু হয়েছিল। সেই চাহিদা পূরণ করেছিল বেশ কিছু ধর্ম, যার মধ্যে প্রধান দুটি হলো জৈনধর্ম ও বৌদ্ধর্মে রাত্মণ্য ধর্মের যজ্ঞ ও আচাব অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করেছিল এইসব ধর্মগুলি। সহজ সরল জীবনযাপনের ওপরে তারা জোব দিয়েছিল। রাত্মণ্য ধর্মের ও বেদের বিরোধিতা করে ধর্ম সম্পর্কে অনেক নতুন কথা বলেছিলেন এইসব ধর্মেব প্রচারকরা। নতুন এই ধর্মমতগুলিকেই নব্যধর্ম (নতুন ধর্ম) বলা হয়।

জৈন ধর্ম

নতুন তৈবি হওয়া ধর্মমতগুলিব মধ্যে জৈন ধর্ম ছিল অন্যতম প্রধান। এই ধর্মেব প্রধান প্রচাবককে বলা হতো *তীর্থাঙ্কব* জৈন ধর্ম অনুযায়ী মোট চবিবশজন তীর্থাঙ্কব ছিলেন তাঁদেব মধ্যে শেষ দুজন হলেন পার্শ্বনাথ ও বর্ধমান মহাবীব। পার্শ্বনাথ ছিলেন কাশীর বাজপুত্র। তিনি ছিলেন মহাবীবেব প্রায় আড়াইশো বছর আগের মানুষ।

বর্ধমান মহাবীব (খ্রিস্টপূর্ব ৫৪০ ৪৬৮) লিচ্ছবি বংশেব ক্ষত্রিয় বাজকুমাব ছিলেন। বজ্জি জনপদের সঞ্চো লিচ্ছবিদের যোগাযোগ ছিল। তিবিশ বছব বয়সে তিনি সংসাব ছেড়ে তপস্যা করতে চলে যান। টানা বারো বছব অনেক কম্ব মেনেও তপস্যা করতে থাকেন। শেষপর্যন্ত তিনি সর্বজ্ঞানী হন ও কেবলিন নামে পবিচিত

प्रेकाखा कथा

চার্বাক ও আজীবিক

জৈন ও বৌদ্ধদেব আগেও ব্রায়ণদের ও ব্রাম্মণ্যধর্মেব বিরোধিতা কবেছিলেন চাৰ্বাক ও আজীবিক গোষ্ঠী এঁবা কেউই বেদকে চূডান্ত বলে মানতেন না চার্বাকবা বর্ণাশ্রম প্রথাব বিবোধী ছিলেন। তাঁৱা স্বর্গেব ধাবণা মানতেন না। যজে পশবলিব বিরোধী ছিলেন চার্বাকবা আজীবিক গোষ্ঠী তৈবি করেন মংখলিপুত্ত গোসাল জানা যায় তিনি ছিলেন মহাবীরেব বস্থ আজীবিকরা বেদ ও কোনো দেবতায় বিশ্বাস করতেন না তাঁরা মানতেন না যে, মানুষ ভালো কাজ কবলেই ভালো ফল পাবে আজীবিকদের কোনো ধর্মগ্রন্থ পাওয়া যায়নি তাঁরা মৌর্য সম্রাট বিন্দুসাব ও অশোকেব থেকেও সহায়তা পেয়েছিলেন।

ছবি. ৫.১: বর্ধমান মহাবীর হন দীর্ঘ তিবিশ বছর মহাবীর জৈন ধর্ম প্রচার কবেন। আনুমানিক বাহাত্তর বছব বয়সে পাবা নগবীতে অনশন করেন মহাবীব। সেখানেই তাঁব মৃত্যু <mark>হয়।</mark>

प्रेकास्य कथा

<mark>চতুৰ্যাম ও পঞ্জমহা</mark>ব্ৰত

জৈন ধর্মে চারটি মূলনীতি অবশ্যই মেনে চলতে হতো। সেগুলি হলো— ক) কোনো প্রাণী হত্যা না করা।



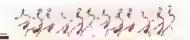
খ) মিথ্যাকথা না বলা গ) অন্যেব জিনিস ছিনিযে না নেওয়া ঘ) নিজেব জন্য কোনো সম্পত্তি না কবা পার্শ্বনাথ এই চাবটি মূল নীতি মেনে চলাব নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই নীতি চারটিকেই একসঙ্গে চতুর্যামন্তত বলা হয়। মহাবীর এই চারটি নীতিব সঙ্গে আবো একটি নীতি যোগ করেন তাঁর মতে, ব্রস্কার্য নীতিও জৈনদের মেনে চলা উচিত। এই পাঁচটি নীতিকে একসঙ্গে পঞ্জ মহান্তত বলা হয়।

গোডাব দিকে জৈন ধর্ম মগধ, বিদেহ, কোশল ও অঙ্গাবাজ্যেব মধ্যে জনপ্রিয় ছিল। মৌর্যযুগে জৈনদের প্রভাব বাডতে থাকে। জানা যায় যে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য শেষ জীবনে জৈন হয়ে যান। পরে ওডিশা থেকে মথুবা পর্যন্ত জৈন ধর্ম ছডিয়ে পড়েছিল। জৈন ধর্মের মূল উপদেশগুলি বারোটি ভাগে সাজানো হয়েছিল। এই ভাগগুলিকে অঙ্গা বলা হয় সংখ্যায় বারোটি বলে অঙ্গাগুলিকে একসঙ্গো বলা হয় গ্লান্স্প অঙ্গা।

টুফান্ত্রো ফামা দিগন্বর ও শ্বেতান্বর

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যেব শাসনের শেষ দিকে এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয় সেইসময় অনেক জৈন সন্মাসী উত্তব-পূর্ব ভারত থেকে দক্ষিণাত্যে চলে যান। ঐ চলে যাওয়া থেকেই জৈনদের মধ্যে দুটি ভাগ হয়ে যায় দাক্ষিণাত্যে চলে যাওয়া জৈন সন্মাসীদেব নেতা ছিলেন ভদ্রবাহু। তিনি বর্ধমান মহাবীরেব পথকেই কঠোরভাবে মেনে চলতেন মহাবীরেব মতোই ভদ্রবাহু ও তাব অনুগামীবা কোনো পোশাক পরতেন না। এব জন্যেই তাঁদের দিগন্ধব বলা হয়

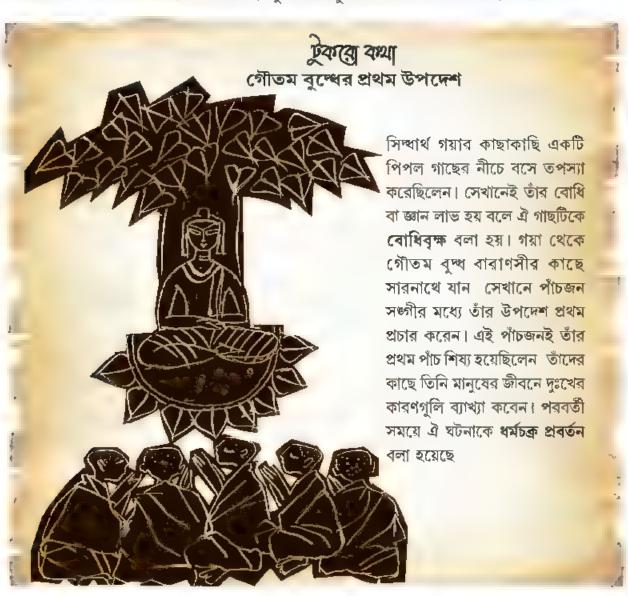
প্রিম্পূর্ব ষষ্ট শতকের ভারতীয় উপমহাদেশ



অন্যদিকে উত্তর ভারতে থেকে যাওয়া জৈনদের নেতা ছিলেন স্থালভদ্র। তিনি পার্শ্বনাথের মতো জৈনদের একটা সাদা কাপড ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। এই জৈন সন্যাসীদের গোষ্ঠী শ্বেতাম্বর বলে পরিচিত্ত হয় খ্রিস্টীয় প্রথম শতক নাগাদ দিগম্বর ও শ্বেতাম্বরদেব বিভেদ পবিষ্কাব হয়ে যায়। তবে জৈন ধর্মেব মূল নীতিগুলির ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বিশেষ তফাত ছিল না

বৌষ্ধ ধর্ম

গৌতম বৃন্ধের প্রথম নাম ছিল সিন্ধার্থ নেপালের তবাই অঞ্চলের কপিলাবস্তুব শাক্য বংশে সিন্ধার্থের জন্ম হয় (খ্রিস্টপূর্ব ৫৬৬ অব্দ) সিন্ধার্থও মহাবীরের মতোই ক্ষত্রিয় বংশের মানুষ ছিলেন উনত্রিশ বছব বযসে সিন্ধার্থ সংসাব ছেডে তপস্যা কবতে চলে যান। প্রায় ছ-বছর তপস্যা করার পর সিন্ধার্থ বোধি বা জ্ঞান লাভ কবেন বোধি লাভ করার জন্যই তার নাম হয় বুল্খ। তাই বুল্ধেব প্রচারিত ধর্মকে বলা হয় বৌন্ধ ধর্ম।





ছবি. ৫.২: ধ্যানে বসা গৌতম বুদেধর একটি মৃতি

বৃদ্ধ নিজের শিষ্যদের কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন দুঃখের কারণ কী? কীভাবে সেই দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়? এই প্রশ্নগুলির ব্যাখ্যায় বৃদ্ধ চারটি মূল উপদেশ দেন। প্রতিটি উপদেশকে বলা হয় আর্যসত্য। ঐ চারটি উপদেশকে একসজে চতুবার্যসত্য বলা হয়। দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আটটি উপায়ের কথা গৌতম বলেছিলেন। সেই আটটি উপায়কে একসজো বলা হয় অস্টাজ্যিক মার্গ মার্ন মানে পথ। আটটি পথকে তাই একসজো অস্টাজ্যিক মার্গ বলা হয়।

এবপর বৃদ্ধ বাজগৃহে যান। সেখানে মগধেব রাজা বিশ্বিসার বৃদ্ধেব শিষ্য হন। বছবে আট মাস যুরে ঘুবে তিনি তাঁব মতামত প্রচার কবতেন। কোশল বাজ্যে গৌতম বৃদ্ধ টানা ২১ বছব ছিলেন। প্রায় ৪৫ বছব ধর্মপ্রচাবেব পব কুশিনগবে গৌতম বৃদ্ধ মারা যান (আনুমানিক ৪৮৬ খ্রি:পূ:)।

বৌন্দ ধর্মের ইতিহাসে বৌন্দ ধর্মসংগীতিগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ধর্মসংগীতি অনেকটা ধর্মসন্মেলনের মতো। সেখানে বৌন্দ সন্ন্যাসীরা সমবেত হতেন। বৌন্দ ধর্মের নানা বিষয়ে আলোচনা হতো। সংগীতিগুলিতে নানা বিবাদের প্রসঙ্গাও উঠত। এমন চারটি সংগীতির কথা জানা যায় গৌতম বুন্দের মৃত্যুর পরে পরেই প্রথম বৌন্দ সংগীতি হয়েছিল।

তালিকা ৫.১: একনজরে প্রথম চারটি বৌশ্ব সংগীতি

প্রথম	রাজগৃহ	অজাতশত্ৰু	মহাকাশ্যপ	সুত্ত ও বিনয় পিটক সংকলন কবা হয
দ্বিতীয়	বৈশালী	কালাশোক বা কাকবর্ণ	যুশ্	বৌষ্ধরা থেরবাদী ও মহাসাংঘিক এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে যান
তৃতীয়	পাটলিপুত্র	অশোক	মোগগলিপুত্ত তিসস	বৌষ্ধ সংঘের নিয়মগুলি কঠোরভাবে মানার উপরে জোর পড়ে সংঘের মধ্যে ভাঙন আটকাবার চেষ্টা হয়
চতুৰ্থ	কাশ্মীর	কনিষ্ক	বসুমিত্র	বৌষ্ধর্ম হীনযান ও মহাযান— এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়





ছবি
৫ ৩
গৌতম
বুম্বের
মারা
যাওয়ার
দুশ্যের
একটি
ভাস্কর্য

प्रेवाखा वाथा

হীনযান ও মহাযান জীবনযাপন ও ধর্মীয় আচরণ বিষয়ে বৌষ্ধ সংঘে মতবিরোধ তৈবি হয়। কেশ কিছু সন্ন্যাসী আমিষ খাবার খেতে থাকেন। দামি, ভালো পোশাক পরতে থাকেন সোনা-রূপো দান হিসাবে নিতে শ্র কবেন ধীরে ধীরে কিছ সন্নাসী প্রায় পাবিবাবিক জীবনযাপন শুবু করেন সংঘের নিয়মনীতি শিথিল হতে থাকে। এব ফলে বৌন্ধ ধর্মে মহাধান নামে এক নতুন দল তৈরি হয়। ক্ষাণ আমল থেকে বুশ্বেৰ মূৰ্তি পূজোৰ চল শুরু হয়। মহাযানীরা মূর্তি পুজোব সমর্থক ছিলেন এর ফলে পুরোনো মতের বৌন্ধ সন্ন্যাসীবা মহাযান মতামতেব বিরোধী হয়ে পড়েন তারা হীন্যান নামে পবিচিত হন সম্রাট কনিম্ব মহাযান বৌন্ধমতের সমর্থক ছিলেন। চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতিতেই হীনযান ও মহাযানরা চূডান্তভাবে আলাদা হয়ে যায়

টুকন্ত্রে কথা তিপিটক বা ত্রিপিটক

বৌশ্ব ধর্মে তিপিটক (ত্রিপিটক) প্রধান গ্রন্থ। সুত্তপিটক, বিনয়পিটক ও অভিধন্মপিটক— এই তিনটি ভাগ নিয়ে তিপিটক পিটক কথার মানে হলো ঝুডি তিনটি সংকলনকে তিনটি ঝুড়িব সংজ্ঞা তুলনা করা হয়েছে সুত্তপিটক হলো গৌতমবুশ্ব ও তাঁব প্রধান শিষ্যদেব উপদেশগুলিব সংকলন। বিনয়পিটকে বৌশ্বসংঘেবও বৌশ্বসন্ন্যাসীদের আচার-আচরণের নিয়মগুলি আছে। অভিধন্মপিটক গৌতম বুশ্বেব মূল কয়েকটি উপদেশেব আলোচনা। এগুলি সবই পালি ভাষায় লেখা।

গৌতম বুন্ধের মৃত্যুর পর বাজগৃহে বৌন্ধদের প্রথম সভা হয়েছিল জানা যায় যে, সেখানে ত্রিপিটকের সংকলনগুলি তৈরি হয়। গল্প আছে যে, বুন্ধের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যবা দুঃখে কাতর হয়ে পড়েছিলেন। তখন সুভদ্র নামের একজন শিষ্য বলেন, এবাবে আমবা নিজেদের ইচ্ছামতো চলতে পারব। সবসময় বুন্ধের কথা মতো চলতে হবে না বুন্ধের আবেক শিষ্য ছিলেন মহাকাশ্যপ। তিনি সুভদ্রের কথা শুনে ভাবলেন, এখনই বৌন্ধ ধর্মের নিযমগুলি সংকলন কবতে হবে নযতো সবাই নিজেদের ইচ্ছামতো চলবে। তাতে বৌন্ধধর্মের ক্ষতি হবে। সেইমতো মহাকাশ্যপ বাজগৃহে সভা ডাকলেন সেইসভায় প্রথম দৃটি পিটক সংকলন কবা হলো



्रेवाखा वाथा

ত্রিরত্ন

জৈন ও বৌল্ধ— দুই
ধর্মেই ত্রিরত্ব বলে একটি
ধারণা আছে। তিনটি
বিষয়কে দুটি ধর্মেই
বিশেষ গুবুত্বপূর্ণ বলে
মনে কবা হয়। সেগুলিব
একেকটিকে বত্ব বলে
সংখ্যায় তিনটি তাই তা
একসজো ত্রিবত্ব। তবে
জৈন ধর্মেব ত্রিবত্ব থেকে
আলাদা।

সং বিশ্বাস, সং জ্ঞান ও
সং আচবণের উপরে
জৈনবা জোব দিতেন
এই তিনটিকে একস্পেলা
জৈন ধর্মে গ্রিবত্ম বলা
হতো বৌল্ধধর্মে
গৌতমবৃন্ধপ্রধান ব্যক্তি
তার প্রচার করা ধর্মই
বৌল্ধধর্ম। বৌল্ধধর্ম
প্রচাবেব দায়িত্ব বৌল্ধ
সংঘেব। এই তিন মিলে
হয় বৃন্ধ-ধন্ম-সংঘ। এই
তিনটি বৌল্ধধর্মের

বর্ধমান মহাবীরের সঞ্চো গৌতম বুন্ধের কয়েকটি মিল ছিল। তাঁরা দুজনেই ক্ষব্রিয় পরিবারের মানুষ ছিলেন। ব্রাস্থণ্য ধর্মের আচার অনুষ্ঠানের বিরোধিতাও করেছিলেন তাঁরা দুজনেই সমাজের সাধারণ মানুষের জন্য তাঁরা ধর্মপ্রচার করেছিলেন। সবার বোঝার সুবিধের জন্য ব্যবহার করেছিলেন সহজ সরল ভাষা। প্রাকৃত ভাষা ও সাহিত্য উন্নত হয়েছিল জৈন ধর্মেব হাত ধরে। বৌন্ধ ধর্মপ্রচাবের ভাষা ছিল পালি

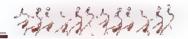
তবে মহাবীর কঠোর তপস্যাব উপরে জোর দিয়েছিলেন অন্যদিকে গৌতম বুষ্ধ মনে কবতেন কঠোর তপস্যা *নির্বাণ* বা মুক্তি লাভের উপায় নয়। আবার চূড়ান্ত ভোগ-বিলাসেও মুক্তির খোঁজ পাওয়া

যায় না। বুন্ধ তাই *মজবিম পতিপদা* বা মধ্যপন্থার কথা বলেছিলেন।

মহাবীর ও বৃন্ধ দুজনেই ধর্ম প্রচারের জন্য নগবগুলিতে বেশি যেতেন নগরে নানারকমের মানুষকে একসঙ্গো পাওয়া যায়। তুলনায় গ্রামে জনগণেব বেশিবভাগই ছিল কৃষক আবার ব্রাস্থাণ্য ধর্মে নগরে যাওয়া বা থাকা পাপ বলে ধবা হতো। তাই জৈন ও বৌন্ধধর্ম সেইসময়েব নগবগুলোতেই বেশি ছডিয়ে পডেছিল। একথা অবশ্য নব্যধর্ম আন্দোলন বিষয়েই খাটে। মূলত ঐ

জাতকের গল্প

তিপিটকেব মধ্যে জাতক নামে কিছু গল্প রয়েছে। মনে করা হয় গৌতম বৃষ্থ আগেও নানান সময়ে জন্মেছিলেন। সেই আগের এক একটি জন্মেব কথা জাতকের এক একটি গল্পে বলা হযেছে। প্রতিটি গল্পেব মধ্যে কিছু না কিছু উপদেশ রয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মপ্রচারের জন্যই জাতকের গল্পগুলি ব্যবহাব করা হতো। পাঁচশোবও বেশি জাতকেব গল্প রয়েছে গল্পগুলি পালি ভাষায় বলা ও লেখা হতো মানুষের পাশাপাশি পশুপাখিবাও জাতকের গল্পে চরিত্র হিসাবে উঠে এসেছে জাতকের গল্পগুলি থেকে সেইসময়ের সমাজ বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পারা যায়।



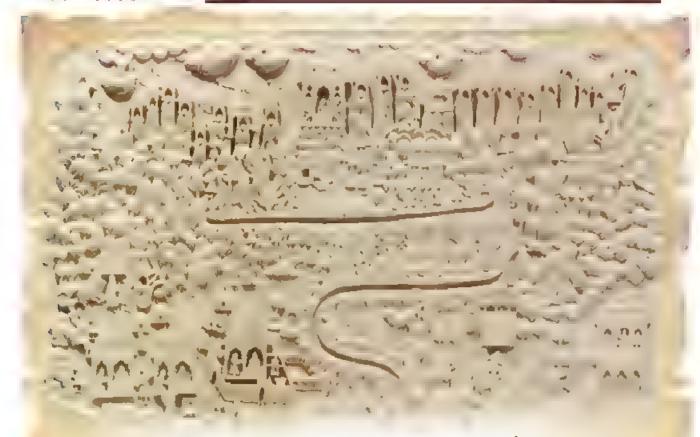
সেরিবান ও সেরিবা (সেরিবাণিজ-জাতক)

অনেক দিন আগে সেবিব নামে একটা বাজ্য ছিল। সেখানে থাকত সেরিবান ও সেবিবা নামে দুজন ফেরিওলা তারা পুবোনো জিনিস কিনত, আব নতুন জিনিস বেচত। সেরিবা সবাইকে ঠকাত। বেশি দামে জিনিস বিক্রি কবত কিন্তু সেরিবান কাউকে ঠকাত না উচিত দামেই সে জিনিস বিক্রি কবত

একদিন সেবিবা একটা বাডির সামনে গিয়ে খেলনা নেবে বলে হাঁক দিল। সে বাড়িতে একটা ছোটো মেয়ে তাব ঠাকুমাব সংখ্য থাকত তাবা খুবই গবিব। ছোটো মেয়েটা খেলনাব জন্য ঠাকুমাব কাছে বায়না ধবল ঠাকুমা তখন একটা ভাঙা থালা নিয়ে খেলনা কিনতে এল। সেবিবাকে বলল, এই থালাটার যা দাম হয় দাও নাতনির জন্য একটা খেলনা নেব সেরিবা ভালো করে দেখল খালাটা সোনাব। সে ফন্দি করে বলল, থালাটা ভাঙা, কানাকডিও এটাব দাম নয় এমনি দিলে তাও নিতে পাবি ঠাকুমা বলল, তাহলে থাক। সেবিবা ভাবল একটু ঘুবে আবাব একবার এখানে আসতে হবে। এমনিতে না দিলেও, দুটো পয়সা দিলে নিশ্চয়ই থালাটা দিয়ে দেবে। কোনোভাবেই এটা হাতছাড়া করা যাবে না।

খানিক পরেই সেবিবান সেই বাড়িতেই গেল ছোটো মেয়েটি আবার খেলনার জন্য ঠাকুমাব কাছে বায়না ধবল। ঠাকুমা আবাব সেই ভাঙা থালাটি সেবিবানকে দেখতে দিল। থালাটা দেখে সেবিবান বলল, এ তো সোনার থালা। অনেক দাম। আমাব এই থালা কেনার মতো ক্ষমতা নেই। তখন ঠাকুমা সেবিবানকে বলল, তুমি যা দিতে পাববে তাই দাও। বেশি চাই না। তুমি বলাব আগে জানতাম না এটা সোনার থালা। তাই এটা তুমিই নাও সেরিবান তখন তার সব মুদ্রা ঠাকুমাব হাতে দিল আব তার নাতনিকে দিল কয়েকটা সুন্দর খেলনা। ঠাকুমা





↑ ছবি ৫.৪. সামেত শিখৰ ভৈ

সামেত শিখর, জৈনদের পবিত্রতম তীর্থক্ষেত্র। মনে করা হয় ২৪ জন তীর্থক্ষেত্রের মধ্যে ২০ জন এই শিখরেই নির্বাণ লাভ করেছিলেন।



← ছবি ৫.৫

বৃষ্পপদ (গৌতম বৃষ্ণের পায়েব

ছাপ), পাথবে খোদাই কবা
ভাস্কর্য, অমরাবতী পায়েব

ছাপের মাঝে ধর্মচক্র রয়েছে

ভেবে দেখো



সঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূবণ করো :

- ১.১) মহাজনপদগুলি গড়ে উঠেছিল ————(খ্রি য়ষ্ঠ শতকে/খ্রি·পূ য়ষ্ঠ শতকে/খ্রি· মুষ্ঠ সহস্রাব্দে)।
- ১২) গৌতম বৃষ্ধ জন্মেছিলেন ——— (লিচ্ছবি/ হর্যজ্ক/শাক্য) বংশে।
- ১ ৩) পার্শ্বনাথ ছিলেন ——— (মগধের রাজা/বজ্জিদের প্রধান/জৈন তীর্থংকর)
- ১.৪) আর্যসত্য ——— (বৌষ্ধ/জৈন/আজীবিক) ধর্মের অংশ।

ক-স্তান্তের সঞ্চো খ-স্তন্ত মিলিয়ে লেখো :

	(4' उउ		
মগধের রাজধানী	বৌন্ধ ধর্ম		
মহাকাশ্যপ	রাজগৃহ		
দ্বাদশ অঙ্গ	প্রথম বৌন্দ সংগীতি		
হীন্যান-মহাযান	জৈন ধর্ম		

া নিজের ভাষায় ভেবে লেখো (তিন/চার লাইন) :

- ৩ ১) মগধ ও বৃজি মহাজনপদদৃটির মধ্যে কী কী পার্থক্য তোমাব চোখে পড়ে?
- ৩২) কী কী কাবণে মগধ শেষ পর্যন্ত বাকি মহাজনপদগুলিব থেকে শক্তিশালী হলো ? সেই কারণগুলিব মধ্যে কোনটি সবথেকে গুবুত্বপূর্ণ ছিল বলে তোমার মনে হয় ?
- ৩.৩) সমাজেব কোন কোন অংশেব মানুষ নব্যধর্ম আন্দোলনকে সমর্থন কবেছিলেন? কেন কবেছিলেন?
- ৩৪) জৈন ধর্ম ও বৌষ্ধ ধর্মে কী কী মিল ও অমিল তোমাব চোখে পড়ে?

৪। হাতেকলমে করো:

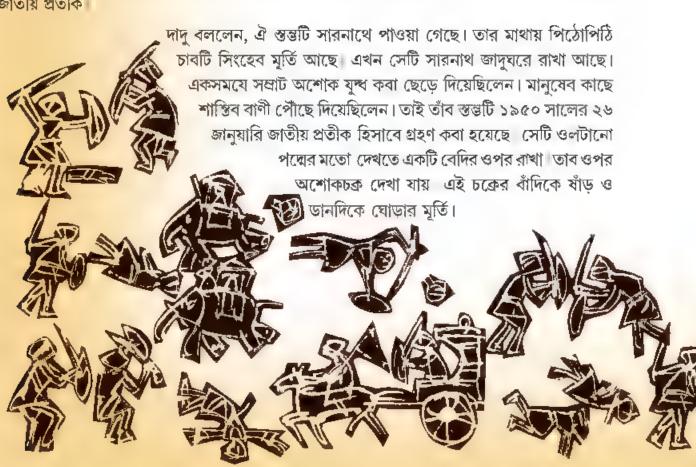
- ৪.১) জনপদ থেকে যোলোটি মহাজনপদ এবং তার থেকে মগধ রাজ্য কীভাবে হলো, তা পিবামিডেব আকারে দেখাও।
- ৪২) ৬৪ ও ৬৫ নম্বর পৃষ্ঠা জোডা ছবিটি দেখো। বৌন্ধ ধর্মে আর্যসতোর ধারণার সঞ্চো ঐ ছবিটিব কি কোনো মিল দেখতে পাচ্ছো?

4

সাম্রাজ্য বিস্তার ও শাসন

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম ভাগ

মিমের কাছে পুরোনো দিনের অনেকগুলো পয়সা আছে। ওর নানা ওকে দিয়েছিলেন। ১ পয়সা, ৫ পয়সা, ১০ পয়সা। কোনোটা টোকো, কোনোটা ফুলেব মতো। স্টিলের চকচকে ছোটো গোল দশ পয়সাগুলো সামিমের খুব প্রিয়। পুরোনো কয়েকটা ২ টাকার নোটও আছে ওর। একদিন সবগুলোই বস্থুদের আব রুবির দাদুকে দেখাতে নিয়ে গেল। দাদু সব দেখে বললেন, দারুণ তো। তোমবা আর কেউ কিছু জমাও নাকি? পলাশ বলল, আমি খেলনা জমাই। ছোটোবেলার সব খেলনা রয়েছে আমার। রাবেয়া বলল, আমিও খেলনা জমাই। দাদু বললেন, পুরোনো দিনের নানান জিনিস জমিয়ে বাখা ভালো। তাতে একসময়ে বোঝা যাবে সেই জিনিসগুলো কেমন ছিল পুরোনো দিনে। তাবপব বললেন, এই যে টাকায় বা পয়সায় সিংহের মুখওলা একটা ছাপ থাকে সেটা কী বলোতো? সবাই বলল, অশোকস্তম্ভ। দাদু বললেন, কেন ঐ স্তম্ভটা টাকা পয়সায় ছাপা থাকে জানো? রাবেয়া বলল, সম্রাট অশোকেব ঐ স্তম্ভটাই ভারতের জাতীয় প্রতীক।



সেদিন বাড়ি ফিরে পৃথার মনে খটকা লাগল। দাদু অশোককে রাজা না বলে সম্রাট বললেন কেন? তাহলে কী রাজা আর সম্রাট আলাদা? পরদিন ক্লাসে দিদিমণিকে সেই প্রশ্নই কবল পৃথা দিদিমণি বললেন, হ্যা, বাজা আর সম্রাট আলাদা। এবারে তাহলে তোমাদের সম্রাট আব সাম্রাজ্যের কথা বলা যাক।

৬.১ সাম্রাজ্য কী ? সম্রাট কে?

সহজ করে বললে, সাম্রাজ্য একটা বিবাট অঞ্চলকে বোঝায়। ধবা যাক, একটা বাজ্যে কয়েক হাজাব জনগণ থাকে তাহলে একটা সাম্রাজ্যে কয়েক লক্ষ জনগণ থাকবে। অনেকগুলো রাজ্য জুডে একটা বড়ো শাসন এলাকা হয়। সেই বড়ো শাসন এলাকাটাই সাম্রাজ্য।

সাম্রাজ্য শাসন করেন যিনি, তিনিই *সম্রাট* সম্রাট মানে বডো বাজা যে <u>রাজা অনেক জনগণ ও</u> অঞ্চলের শাসক তিনিই সম্রাট তাঁর শাসন এলাকায় তাঁব কথাই শেষ কথা তিনি <u>রাজাদেবও বাজা।</u> অর্থাৎ *বাজাধিরাজ* (রাজা+অধিরাজ) তবে সম্রাট যদি মহিলা হন, তখন তাকে বলা হয় সম্রাজী

সাম্রাজ্য তৈরি হয় যুশ্ব করে। ধরা যাক, একজন রাজা যুশ্ব করে অন্য রাজাদেব হাবিয়ে দিল। তারপর সব রাজ্যগুলো এক করে একটা বড়ো শাসন এলাকা তৈরি হলো। তাকেই সাম্রাজ্য বলা হয়। সেই জয়ী রাজা একটা বড়ো যজ্ঞ করে বিরাট উপাধি নিলেন। তখন তাঁর চেয়ে বেশি শক্তিশালী আর কেউ থাকল না। তিনি হয়ে গেলেন সম্রাট। সবক্ষেত্রে যদিও রাজা যজ্ঞ করে সম্রাট হতেন না।

৬.২ ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম সাম্রাজ্য তৈরি হলো কীভাবে?

যোলটি মহাজনপদের কথা তোমরা আগেই জেনেছ এই এক একটা মহাজনপদ ছিল এক একটা বাজ্য মগধ মহাজনপদে পরপর তিনটি বাজবংশ রাজত্ব করেছিল। সেইসব বাজাবা অন্যান্য মহাজনপদের বেশিরভাগকে নিজেদের দখলে আনেন। শেষপর্যন্ত মগধকে ঘিরেই ভারতের প্রথম সাম্রাজ্য তৈরি হয়। তার নাম মৌর্য সাম্রাজ্য।





টুকরো কথা

আলেকজান্ডারের ভারতীয় উপমহাদেশে অভিযান

খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দ নাগাদ হিন্দুকুশ পর্বত পেবিয়ে ভাবতীয় উপমহাদেশে পৌছেছিলেন গ্রিসের ম্যাসিডনের শাসক আলেকজান্ডার। উপমহাদেশের বিভিন্ন ছোটো-বড়ো শাসকদের সঞ্চো তাঁর যুন্ধ হয়েছিল। এর মধ্যে এলডার পোরোস বা রাজা পুরুর সঙ্গো তাঁব যুন্ধ খুব বিখ্যাত। পুরুর রাজত্ব ছিল ঝিলাম ও চেনাব নদী দুটিব মাঝের অঞ্চলে বিবাট সেনাবাহিনী নিয়ে পুবু আলেকজান্ডাবেব বিবুন্ধে যুন্ধে নামেন। কিন্তু গ্রিকবাহিনীব কাছে শেষ পর্যন্ত পুবু হেবে যান। তবু তাঁব বীবত্বকে গ্রিকরা সন্মান জানিয়েছিল।

প্রায় তিন বছর আলেকজান্ডার উপমহাদেশে ছিলেন আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫ অন্ধ-এ তিনি বাহিনী সমেত ফিরে যান পশ্চিম এশিয়া হয়ে গ্রিসে ফেরার পথে ব্যাবিলনে তাঁর মৃত্যু হয়।

ভাবতীয় উপমহাদেশে পাঞ্জাব পর্যন্ত আলেকজান্ডাব এগিয়েছিলেন। গঙ্গা উপত্যকাব দিকে তিনি এগোননি। তবে আলেকজান্ডাবেব

ছোটো শক্তিগুলির ক্ষমতা কমে গিয়েছিল।
তার ফলে খ্রিস্টপূর্ব ৩২০ অব্দ নাগাদ
চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পক্ষে সাম্রাজ্য গড়ে
তোলা সহজ হয়। পাঞ্জাব ও
উত্তব পশ্চিম অঞ্চলে অনেক সহজেই
মৌর্যদেব ক্ষমতা ছড়িয়ে পড়েছিল

অভিযানেব ফলে উপমহাদেশেব উত্তরে ছোটো

ছবি ৬ ১: আলেকজান্ডার ও তাঁর প্রিয় ঘোডা বুকেফেলাস

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কথা

উপমহাদেশে আলেকজান্তাবেব অভিযানেব সময় মগধেব সিংহাসনে ছিলেন নন্দ বাজারা। এঁবা যদিও প্রজাদেব প্রিয় ছিলেন না। চাণক্য নামেব এক পণ্ডিত নন্দবাজাদের বোষের মুখে পড়েন। চাণক্যের সাহায্যেই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নন্দরাজাদের বিবুদ্ধে যুদ্ধে নামেন শেষ নন্দবাজা ধননন্দ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কাছে হেরে যান এইভাবে মগধে মৌর্যদের শাসন শুরু হয়। নন্দদের সময়ে উত্তর ভাবতে মগধের ক্ষমতা ছড়িয়ে পড়েছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সেই ক্ষমতাকে আরও অনেক বাড়িয়ে তোলেন। আলেকজান্ডারের সহকারী প্রিক প্রশাসকদের বিরুদ্ধে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য যুদ্ধ করেন। সিন্ধু উপত্যকার দখল নিয়ে গ্রিকদের সঞ্চো চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সংঘাত বাধে। ঐ অঞ্চলের শাসক ছিলেন আলেকজান্ডারের সেনাপতি



সেলিউকাস নিকেটর। তাঁব সঞ্চো চন্দ্রগুপ্তের বিবাদ একটি চুক্তির মাধ্যমে মিটে যায়।দুই পক্ষেব মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়।দুজনেই একে অন্যকে নানান উপহাব ও সুযোগ-সুবিধা দেন। ভারতীয় উপমহাদেশে মৌর্য সাম্রাজ্যই প্রথম সাম্রাজ্য। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সেই সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাট (খ্রিস্টপূর্ব ৩২৫/ ৩২৪-৩০০ অব্দ) পাটলিপুত্র ছিল তাঁব রাজধানী।মৌর্য সাম্রাজ্য গড়ে তোলার প্রধান কৃতিত্ব চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যেরই।

प्रेकात्रा कथा

অর্থশাস্ত্র

প্রাচীন ভাবতের শাসন পবিচালনার বিষয়ে বেশ কিছু বই লেখা হয়। বাজ্যশাসন কেমন হওয়া উচিত তা নিয়ে আলোচনা থাকত ঐ বইগুলিতে। তেমনই একটি বই কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র। এব লেখক কৌটিল্য। অনেকে কৌটিল্য ও চাণকাকে একই ব্যক্তি মনে করেন কিন্তু একথা এখন প্রমাণিত যে, কৌটিল্য ও চাণকা আলাদা ব্যক্তি

ঠিক কবে অর্থশাস্ত্র লেখা হয়, তা বলা মুশকিল। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক নাগাদ এই বইয়েব কিছু অংশ লেখা হযেছিল তবে খ্রিস্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতক নাগাদ অর্থশাস্ত্র লেখাব কাজ সম্পূর্ণ হয়েছিল। সেই চেহারায় আজকে বইটি দেখা যায় তাই একা কৌটিল্য এই বইটি বোধহয় লেখেননি তবে এব মূল বিষয়গুলো তাঁর লেখা বলেই তাঁর নামে বইটি পরিচিত বইয়েব নামটি থেকে মনে হতে পাবে যে, বইটি বোধহয় শুধু টাকাকডি নিয়ে লেখা। আসলে কিন্তু তা নয়। অর্থশাস্ত্রেব মতে, রাষ্ট্রীয় শাসনকাজে প্রধান হলেন বাজা। তাঁব কথাই শেষ কথা এমনকি দরকাবে বাজাকে ছল-চাতুরিও করতে হতে পাবে বাজকাজেব সমস্ত বিষয়ে খুঁটিনাটি আলোচনা বয়েছে অর্থশাস্ত্রে। বইটিতে শাসকেব কী কী করা উচিত তাই বলা হয়েছে যদিও তাব সব উপদেশই যে মৌর্য শাসকেরা মানতেন তেমন প্রমাণ নেই। মৌর্য আমলের ইতিহাস জানাব জবুবি উপাদান অর্থশাস্ত্র।

মৌর্য সম্রাট অশোক

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যব পবে তাঁর ছেলে বিন্দুসাব সম্রাট হন (খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ থেকে ২৭৩ অব্দ)। বিন্দুসাবেব আমলে মৌর্য সাম্রাজ্য বিশেষ বাডেনি। বিন্দুসারেব ছেলে অশোক প্রায় চাব দশক শাসন করেন (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২৭৩ থেকে ২৩২ অব্দ)। গোড়ার দিকে নাকি অশোক খুব নিষ্ঠুব ছিলেন বলে জানা যায়।

299

ভেবে দেখো

অর্থশাস্ত্র বইটি একজন ব্যক্তির লেখা নয়। তেমনি তোমাদের জানা আর কোন কোন বইয়ের লেখক একজন নন? এইরকমভাবে অনেকে মিলে একটা বই লেখা হতো কেন বলে তোমাব মনে হয়? প্রয়োজনে পৃষ্ঠা ১১৪-র টুকবো কথাটিও আলোচনাব মধ্যে আনো।



ছবি ৬.২. সম্রাট অশোকের একটি ভাস্কর্য মূর্তি

ছবি. ৬৩:
মৌর্য আমলের মুদ্রা।
মুদ্রার আকারটি
খেষাল করো





সারা জীবনে মাত্র একটি যুন্থ করেন তিনি, ব্বলিঞ্চা যুন্থ। সেই যুন্থে অনেক মানুষ
মারা যায়। সেই হিংসাব জন্য পবে অশোক দুঃখ পান। জানা যায় যে, বৌন্ধ সন্ন্যাসী
উপগুপ্ত অশোককে বৌন্ধ ধর্মে দীক্ষা দেন। এই ঘটনা কলিঙ্গা যুন্থেব পরে পবেই
ঘটেছিল বৌন্ধধর্মের প্রভাবে হিংসা বন্ধ করেন অশোক। যুন্ধ কবাও ছেড়ে দেন
তিনি। পশুদেব মাবাও বন্ধ করে দেন। সব মানুষ যাতে ভালোভাবে থাকতে পারে
সেই ব্যবস্থা করেন তবে তার পাশাপাশি সাম্রাজ্যটাও ধরে রাখেন সম্রাট অশোক।
তাঁব সাম্রাজ্য উত্তবে আফগানিস্তান থেকে দক্ষিণে কর্ণটিক পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল।
পশ্চিমে কাথিয়াওয়াড থেকে পূর্বে কলিঙ্গাও এই সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিল। অশোকের
আমলেও মৌর্যদেব রাজ্ধানী ছিল পাটলিপুত্র।

সাম্রাজ্য চালানোর নানা দিক

কলিঙ্গা রাজ্য জয় করাব ফলে মৌর্য সাম্রাজ্যেব এলাকা আরো বাড়ল। এতবড়ো সাম্রাজ্য এর আগে দেখা যায়নি। তবে শুধু সাম্রাজ্য বাডলেই সম্রাটদের কাজ শেষ হয় না। ভালোভাবে শাসন কাজ চালানোব বিষয়টাও জবুরি। মৌর্য সম্রাটরা শাসন চালানোর বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন সাম্রাজ্যের সমস্ত বিষয়ে সম্রাটের হাতেই ছিল চূড়ান্ত ক্ষমতা। বিচারব্যবস্থারও মাথায় ছিলেন সম্রাটনিজে সম্রাটেব জাবি করা আদেশ প্রজারা মানতে বাধ্য থাকত তবে মৌর্য প্রশাসনে পুরোহিতদেব বিশেষ ভূমিকা দেখা যায় না। মৌর্য সম্রাটরা কোনো যজ্ঞ কবে নিজেদের ক্ষমতা দাবি কবেননি। তাঁবা দেবানগপিয় বা দেবতাদেব প্রিয় উপাধি ব্যবহাব করতেন। অশোক তার সঙ্গো পিয়দিস বা প্রিয়দর্শী উপাধিও যোগ কবেছিলেন। ফলে মৌর্য সম্রাটরা প্রজাব কাছে দেবতার মতোই সম্মাননীয় ব্যক্তি হিসেবে নিজেদের ভূলে ধবতেন।

বিবাট মৌর্য সাম্রাজ্যের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ছিল মগধ। অশোক নিজেকে মগধরাজ (রাজা মাগধে) বলে ঘোষণা কবেছেন উত্তব ভাবতের অনেকগুলি বাজ্য মৌর্যরা জয় করেছিল সেগুলো ছিল প্রধান প্রধান শাসন এলাকা। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও দাক্ষিণাত্যের এলাকাগুলো ছিল প্রান্তীয় অঞ্চল। তবে মগধ ও প্রধান শাসন এলাকাগুলোতেই মৌর্য শাসনের দাপট সবথেকে বেশি ছিল।

সম্রাটের পরেই ছিলেন রাজকর্মচারীরা। তাদের বলা হতো *অমাত্য*। অমাত্যদের সাহায্যেই সম্রাট শাসন চালাতেন। মৌর্যদেব সময়ে মন্ত্রী পরিষদ ছিল। তবে তাদের পবামর্শ মানতে সম্রাট বাধ্য ছিলেন না। অমাত্যদের মধ্যে তিনবকম পদেব ভাগ ছিল। তাদেব বেতনে পার্থক্য ছিল। সম্রাট অশোকেব

李子子 经

সময়ে অবশ্য অমাতাদের কথা জানা যায় না। তার বদলে মহামাত্ররা সবথেকে উঁচু পদগুলি পেতেন। সম্রাট অশোকের শাসন ব্যবস্থা অনেকটাই মহামাত্রদের ওপব নির্ভর করত। মহামাত্রদের মধ্যেও পদের নানা ভাগ ছিল। তাদের কাজের এলাকা আলাদা ছিল। মেয়েদেরও মহামাত্র হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হতো।

प्रेयाखा यथा

পাটলিপুত্র নগর পরিচালনা : মেগাস্থিনিসের চোখে

প্রিক শাসকসেলিউকাসের দৃত হয়ে মেগাস্থিনিস কান্দাহার থেকে পাটলিপুত্রেব বাজদরবারে যান। নিজের বই ইন্ডিকাতে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনের কথা লিখেছিলেন মেগাস্থিনিস যদিও ঐ বইটি এখন পাওয়া যায় না। তবে অন্যান্য প্রিক লেখকদের লেখায় বইটিব নানা অংশ রয়েছে। গ্রিক হিসেবে ভাবতীয় উপমহাদেশেব ভাষা ও সমাজ পুরোপুরি বুঝতে পারেননি মেগাস্থিনিস ফলে তাঁব লেখায় অনেক ভুল আছে তবু মৌর্য আমলেব ইতিহাস জানাব জন্য ইন্ডিকা জরুরি বিদেশি উপাদান।

মেগাস্থিনিসেব লেখা থেকে পাটলিপুত্র নগবের শাসন পবিচালনাব কথা জানা যায়। নগব পরিচালকদেব ছয়টি দল ছিল। প্রতিটি দলে ছিল পাঁচজন কবে লোক। ছ-টি দল মিলেই নগরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি দেখাশোনা কবত তারা মন্দিব, বন্দর, বাজারগুলির যত্ন নিত। আর ঠিক করত জিনিসপত্রের দাম নগব পরিচালনার কাজে সাহায্যের জন্য থাকত সেনাবাহিনী।

সাম্রাজ্য টিকিয়ে বাখতে মৌর্যদেব সেনাবাহিনীব দবকাব ছিল। সেনাবাহিনীব ওপব সম্রাটেব ক্ষমতা ছিল চূড়ান্ত জানা যায় যে, মৌর্যদেব সেনাবাহিনী ছিল বিরাট। ঘোড়া, রথ, হাতি, নৌকা প্রভৃতিব ব্যবহাব ছিল সেনাবাহিনীতে সঙ্গো ছিল পদাতিক সেনা, যাবা পায়ে হেঁটে যুন্ধ করত। মৌর্য সম্রাটবাই প্রথম গুপ্তচবদেব

সাম্রাজ্যের খোঁজখবব আনতে কাজে লাগান।
বিদেশি বা অচেনা সন্দেহজনক লোক
সবাব ওপবেই গুপ্তচবের নজব
থাকত রাজকর্মচাবী এমনকি
বাজপুত্রবাও চবদেব নজবেব
বাইরে যেতে পারত না।
সাম্রাজ্যের সব খবর চলে
যেত সম্রাটের কাছে

प्रेकास्य वन्था

মহাস্থানগড়

মহাস্থান বা মহাস্থান গড হলো বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া জেলাব একটি প্রত্নস্থাল। এখানে পাওয়া গেছে মৌর্য যুগের ব্রান্থী লিপিতে লেখা একটি লেখ। মৌর্য সম্রাট অশোকের লিপিব সঞ্চো এর মিল খুঁজে পাওয়া গেছে যার সময়কাল খ্রি পু. তৃতীয় শতক মহাস্থান লেখটি লেখা হয়েছিল প্রাচীন পুশুনগরেব (বর্তমান মহাস্থান) মহামাত্র -ব উদ্দেশ্যে। এই লেখটি আসলে ছিল মৌর্য বাজার আদেশ। যে আদেশে কীভাবে মৌর্য দুর্ভিক্ষেব রাজারা (প্রাকৃতিক বা অন্যান; কারণে যে জব্রি পবিস্থিতি তৈবি হয়) মোকাবিলা করবেন তাব প্ৰামৰ্শ দেওয়া আছে এই 'দুর্ভিক্ষ' ছিল তিন প্রকাব পঞ্চাপাল ফসল নষ্ট করার দুর্ভিক্ষ, দাবানলেব দুর্ভিক্ষ এবং বন্যাব ফলে দুর্ভিক্ষ



ুফিন্ত্রে কথা রাজা হওয়া কী সহজ কথা।

কৌটিল্য অর্থশান্ত্রে বলেছেন কুঁডে রাজার প্রজারাও কুঁডে হয়। রাজা যদি কাজ করেন তাহলে প্রজারাও কাজে ব্যস্ত থাকেন। তাই একজন রাজার রোজ কী কী করা উচিত, তার তালিকা দিয়েছেন কৌটিল্য। ২৪ ঘণ্টাকে দুটো ভাগে ভাগ কবা হয়েছে প্রতি ১২ ঘণ্টায় আটবকম কাজ রাজা করবেন। সূর্য ওঠার ঠিক প্রথিকে রাত পর্যন্ত সেইসব কাজ চলবে তালিকাটা খানিকটা এইবকম দাঁড়ায়

	থেকে ব্যক্ত পরস্ত সেহসব কাজ চলবে ত্যালকাটা খ্যানকটা গ্রহবক্তম দাদার							
	कि न			রাত				
Ì	5)	<mark>জমা খবচেব হিসাব পবীক্ষা কববেন। দেশে</mark> ব	5)	গুপ্তচবদেব সঞ্জে কথাবার্তা বলবেন।				
		সুবক্ষার খোঁজ খবর নেবেন :	২)	ন্নান খাওয়া ও পড়াশোনা করবেন				
	٤)	<mark>নগর ও গ্রামের জনগণের সুবিধা-অসুবিধার কথা</mark>	(ت	বাজনা শুনতে শুনতে বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম				
		শুনবেন।		নেবেন				
	©)	স্নান-খাওয়া ও পড়াশোনা কববেন	8)	ও ৫) ঘুমাবেন।(সবমিলিয়ে ৪½ <mark>ঘণ্টা ঘুম ববাদ্ধ</mark>				
	8)	নগদ বাজস্ব নেবেন বিভিন্ন মন্ত্ৰীদেব মধ্যে কাজ		বাজাব জন্য)				
		ভাগ করে দেবেন।	৬)	বাজনার শব্দ শুনে ঘুম থেকে উঠবেন। শাসনের				
۱	(e)	<mark>মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ নেবেন, চিঠিপত্র লিখবেন।</mark>		নানা পশ্বতি নিয়ে ভাববেন। কী কী কাজ করতে				
I		গুপ্তচরদের আনা গোপন খবব শুনবেন।		হবে তা নিয়েও চিস্তা কববেন।				
	৬)	বিশ্রাম নেবেন বা নিজেব খুশিমতো কাজ কবরেন।	۹)	মন্ত্রীদেব সঙ্গে আলোচনা করবেন। গুপ্তচবদেব				
		না হলে মন্ত্রীদেব সঙ্গো পরামর্শ করবেন।		বিভিন্ন কাজে পাঠাবেন।				
١	۹)	হাতি, ঘোডা, রথ, সৈন্য সামস্তদের অবস্থা	br)	পুরোহিতের আশীর্বাদ নেবেন। নিজের				
		খুঁটিয়ে দেখবেন		চিকিৎসকের সঞ্চো দেখা করবেন। প্রধা <mark>ন রাঁধুনি</mark>				
	b)	সেনাপতির সঙ্গে যন্থ ও সেনাবাহিনী নিয়ে		ও জ্যোতিষীর সংখ্য দেখা করবেন				



agasta credit

তোমবা সাবাদিনে কী কী কাজ কবো? সেইসব কাজের একটা তালিকা বানাও

3312333333

বিবাট সাম্রাজ্যের শাসন চালানোব জন্য সম্রাটবা কর নিতেন প্রজাদেব থেকে মৌর্যবাই প্রথম বাজস্ব বা কব ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজায়। রাজস্বেব বেশি ভাগটাই আসত কৃষি থেকে চাষি তাব ফসলের /ু ভাগ দিত রাজস্ব হিসাবে। বিলি ও ভাগ নামের দু রকম ভূমি বাজস্ব মৌর্য আমলেও চালু ছিল তবে সম্রাট চাইলে কর ছাড় দিতে পারতেন। গৌতম বুন্ধের জন্মস্থান লুন্ধিনী গ্রামের বিলি কব ছাড় দিয়েছিলেন সম্রাট অশোক কারিগর, ব্যবসায়ী, বিণিক সবাব থেকে কর আদায় কবত মৌর্য প্রশাসন। তবে পাটলিপুত্রে বসে বিরাট সাম্রাজ্য শাসন করা সম্ভব ছিল না। সেই সাম্রাজ্যের নানা প্রদেশেও শাসনকাজের দেখভাল কবার বিষয়ে সম্রাটদের ভাবতে হতো। প্রদেশের নীচে ছিল জেলা প্রশাসন জলা প্রশাসনকে আহাব বলা হতো। এইভাবে সম্রাট ও তাব নীচে রাজকর্মচাবীদের নানা স্তরভাগ দেখা যায় মৌর্য শাসনব্যবস্থায়। সাম্রাজ্যেব নানা অঞ্বলে জনগণের ভাষা ছিল আলাদা। সেই কথা মাথায় রেখেই সম্রাটের বন্ধব্য বিভিন্ন ভাষায় প্রচাব করা হতো। সাম্রাজ্যেব উত্তর অংশে ব্যবহার হতো পালি ভাষা। অন্যদিকে দক্ষিণ অংশে বন্ধব্য প্রচাবেব ভাষা ছিল প্রাকৃত।

শুধু কর্মচাবী, সেনা, গুপ্তচরদেব উপবেই মৌর্য সাম্রাজ্যেব ভিত দাঁড়িয়ে ছিল না মৌর্য সম্রাট অশোক তাঁব ধন্মনীতি বা ধর্মনীতি দিয়ে জনগণকে একজোট করতে চেষ্টা করেন।কলিঙ্গ যুম্বের পর আর যুম্ব করেননি অশোক। হিংসার বদলে শান্তির নীতি নেন তিনি। বৌদ্ব বীতিনীতি তাঁর ওপরে ছাপ ফেলেছিল। মানুষ ও পশুপাখিদেব ওপব হিংসা বন্ধের জন্য চেষ্টা কবেন অশোক। সাম্রাজ্যেব সব জায়গায় ধন্মের কথা পৌঁছে দেন তিনি।

টুবাব্রে বাথা অশোকের ধন্ম

অশোকের ধন্ম ও বৌন্ধ ধর্মেব মূল কথায় বেশ কিছু মিল দেখা যায় তবু ধন্ম বৌন্ধ ধর্ম নয়। কাবণ, অস্টাজ্ঞিক মার্গের মতো বিষয় অশোকের ধন্মে নেই। এমনকি তাতে নেই নির্বাণ লাভের কথাও। আসলে ধন্ম কতগুলো সামাজিক আচবণের ওপরেই বেশি জোর দেয়। হিংসা না করা এর মূল কথা। প্রাণীহতাা বন্ধ করার ওপরেও জোর দিয়েছিলেন অশোক এমনকি শিকার ও মাছ ধরার উপবেও তিনি নিষেধ জারি করেন। অশোক ঘোষণা করেন, এক প্রাণী অন্য প্রাণীর খাবার হতে পারে না। এর পাশাপাশি, দয়া, দান, সত্যকথন এইসব আচরণের কথা ধন্মে বলা হয়েছে। বাবা-মা, গুরুজনদের মেনে চলার কথাও ধন্মে বলা হয়েছে। এই উপদেশগুলো বিশেষ কাবো জন্যই নয় সব মানুষের জন্যই অশোক তাঁর ধন্মের কথা বলেন অশোক প্রজাদের নিজের সন্তান বলেছিলেন তাই মনে করা হতো প্রজারা পিতাব মতো সম্রাটকে মানবে। সম্রাটকে মেনে চলাই ছিল মৌর্য শাসনের মূল ভিত

प्रेवाखा यथा

মৌর্য্য শাসন ও জচ্চালের বাসিন্দা

মৌর্য শাসকরা বিভিন্ন ধরনেব লোকেদের একটি শাসনেব আওতায় আনতে চেয়েছিল। কিন্ত জঙ্গলের বাসিন্দাদের প্রতি তাদের মনোভার ভালো ছিল না। বনে যাবা থাকে তাদেব নীচ. অসভ্য ও বুনো বলে ধ্বা হতো। অটবি মানে বন বনে যাবা থাকে তাবা **আটবিক।** ভারা নাকি মৌর্য সাম্রাজ্যে নানান গোলমাল পাকাত আরেক দল বনবাসী ছিল অরণ্যচর তারা ছিল ভালো ও শাস্ত। তবে বনবাসীদের জনপদেব অংশ ধবা হত না। গপ্ত-চরেরা ঋষির ছদ্মবেশে বনবাসীদের উপর নজব রাখত। বন থেকে অনেক কিছু পাওয়া যেত। তাই বনেব উপব সম্রাটেব দখল কায়েম করার দবকার ছিল। গাছ কাটলে বা পশপাখিদের মাবলে বনবাসীদের শাস্তির কথাও বলেছিলেন সম্রাট অশোক



৬.৩ মৌর্য শাসনের শেষ দিক, কুষাণ ও সাতবাহন শাসন

সম্রাট অশোক মারা যাওয়ার পর মৌর্য সাম্রাজ্যে নানান রকম সমস্যা দেখা দেয়। যোগ্য সম্রাটের অভাবে ছোটো বাজারা স্বাধীন হওয়াব চেষ্টা কবে। এই সময় নানান বিদেশি জাতি ভারতে আসতে থাকে। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছিল। খ্রিস্টপূর্ব ১৮৭ অব্দ নাগাদ শেষ মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথকে সবিয়ে রাজা হলেন পুষ্যমিত্র সুঙ্গ।

মনে বেখো

মৌর্যদের পব মগধে শুরু হলো সুষ্গদেব শাসন। পুষামিত্র এবং অগ্নিমিত্র ছিলেন সুষ্গদেব দুজন প্রধান শাসক। সুষ্গদেব প্রায় পঞ্জাশ বছর পরে মগধের শাসক হন কাথবা। চারজন কাথ শাসকেব কথা জানা যায়। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকেব শেষভাগে কাথদেব শাসনও শেষ হয়ে গিয়েছিল।

এই সময় উপমহাদেশেব উত্তব-পশ্চিম সীমান্তে বাজনৈতিক অবস্থা বদলে যায়। ব্যাষ্ট্রিয়াব গ্রিকবা ও শক-পহুবরা অনেক অঞ্চলে শাসন শুরু করে। যদিও কুষাণরাই শেষপর্যন্ত সাম্রাজ্য তৈরি করেছিল।

টুকান্ত্রো কথা গঙ্গারিদাই

প্রিক ও রোমান সাহিত্যে মগধের পূর্বদিকে এক শক্তিশালী রাজ্যের কথা পাওয়া গেছে। তার নাম গঙ্গাবিদাই বা গঙ্গারিদ (গঙ্গাহ্দ)। এই বাজ্যের রাজধানী ছিল গঙ্গা বা গ্যাঙ্গো বন্দব-নগর। তলেমিব মতে, গঙ্গানদীব পাঁচটি মুখ বা মোহনাব সবটাই জুড়ে ছিল গঙ্গাবিদাই। নন্দবাজাদের আমলে এই বাজ্যের সঙ্গো মগধেব যোগাযোগেব কথা প্রিক লেখকবা লিখেছেন। আলেকজান্তাবেব আক্রমণেব সময় নাকি গঙ্গাবিদাইয়েব সেনাবাহিনী মগধেব সেনাবাহিনীর সঙ্গো যুক্ত ছিল এই রাজ্যের হস্তীবাহিনী ও যোশ্যাদের বীবত্বের কথা প্রিক ও রোমান লেখকবা লিখেছেন। মনে হয় যে, গঙ্গাবিদাই বাজ্যটিকেই পেরিপ্লাসের লেখক গঙ্গাদেশ বলে উল্লেখ করেছেন। এই রাজ্যেব নামেব মধ্যেই গঙ্গানদীকে ঘিবে তার অবস্থান বোঝা যায়, চিনা সাহিত্য ও কালিদাসের লেখার তুলনা কবলে আবো একটি বিষয় উঠে আসে। তা হলো,গঙ্গাদেশ বা গঙ্গাবিদাই ও বঙ্গোব অবস্থান একই জায়গায়। মগধ ও গঙ্গাবিদাই দুটি বাজ্যই তামালিতেস বা তাম্বলিপ্ত ও গ্যাভ্যেবন্দৰ দুটি ব্যবহাব করত প্রিক লেখক দিওদোরাস-এব মতে, ভারতবর্ষে বহুজাতির বাস। কিন্তু গঙ্গাবিদাই জাতি সবাব সেরা প্রত্নতাত্ত্বিকবা তাম্বলিপ্ত বা তমলুক, চন্দ্রকেতৃগড, দেগঙ্গা প্রভৃতি স্থানে অনেক প্রত্ন-উপাদান প্রেয়েছেন। সেইসব উপাদানেব সঙ্গো গঙ্গারিদাই এব সম্পর্ক আছে বলে মনে কবা হয়।

কুষাণ কারা ?

মধ্য এশিয়া থেকে কয়েকটি যায়াবব গোষ্ঠী পশ্চিম দিকে চলে যায়। এবা এখনকাব আফগানিস্তান ও ভাৰতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম সংশে পৌঁছোয়। এদেব মধ্যে ইউয়ে-ঝি গোষ্ঠীটি ছিল সবচেয়ে গুৰুত্বপূর্ণ, ঐ গোষ্ঠীব একটি শাখা ছিল কু এই যুয়াং। তারা ব্যাকট্রিয়াব ওপর অধিকাব কায়েম করেছিল। এরাই ভাৰতের ইতিহাসে কুষাণ নামে পবিচিত। ধীরে ধীরে কুষাণবা এক বিরাট সাম্রাজ্য তৈরি কবেছিলেন







ছবি ৬.৫: বিম কদফিসেসের সোনার মুদ্রা



ছাব ও ও: কনিষ্কের সোনার মুদ্রা



হুবিচ্ছের সোনার মূদ্রা

কুষাণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রধান কৃতিত্ব ছিল কুজুল কদফিসেস-এর। কাবুল ও কাশ্মীব এলাকা তাঁব দখলে ছিল। তারপব শাসক হন কুজুলেব ছেলে বিম কদফিসেস। সিন্ধু নদের অববাহিকা অঞ্চলে বিমের শাসন ছিল। বিবাট শক্তিশালী কুষাণ শাসক হিসাবে জমকালো উপাধি নিয়েছিলেন বিম। ভাবতীয় উপমহাদেশে সোনার মুদ্রা তিনিই প্রথম চালু করেন

বিমেব ছেলে প্রথম কনিষ্ক কুষাণদের সেবা রাজা। অস্তত তেইশ বছর বাজত্ব করেন কনিষ্ক। ৭৮ খ্রিস্টাব্দে শাসক হন তিনি সেই বছর থেকে শকাব্দ গণনা শুবু হয়। কনিষ্কেব আমলে কুষাণ শাসন গণ্গা উপত্যকার বিরাট অঞ্চলে ছডিয়ে পডেছিল। এখনকার পাকিস্তানের প্রায় পুবো অঞ্চলটাই কুষাণ শাসনের আওতায় ছিল মথুবা পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশে কুষাণ শাসন ছডিয়ে পডে। কনিষ্কর রাজধানী ছিল পুরুষপুর বা পেশাওয়ার। তবে, কুষাণদের প্রধান শাসনকেন্দ্র ছিল ব্যাকট্রিয়া বা বাহ্রিক দেশ

প্রথম কনিষ্কের পরে বাসিষ্ক ও হুবিষ্ক শাসক হন। আস্তে আস্তে কুষাণ শাসনের অবনতি দেখা দেয়। একসময় ব্যাকট্টিয়াও কুষাণদের হাতছাড়া হয়ে যায় ২৩০ খ্রিস্টাব্দের পরে কুষাণ শাসকদেব কথা বিশেষ জানা যায় না।

চুকান্ত্রে কথা কলিঙগরাজ খারবেল: হাতিগুম্ফা শিলালেখ

মৌর্য সম্রাট অশোকেব আমলে কলিঙ্গা মৌর্য সাম্রাজ্যেব অংশ ছিল। মৌর্যদেব পরে কলিঙ্গা আবাব স্বাধীন হয়ে যায়। চেদি বংশেব শাসকরা কলিঙ্গো শাসন শুরু করেন। ঐ বংশেব শাসক থাববেল কলিঙ্গোর প্রথম শক্তিশালী বাজা খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের শোষ ভাগে খাববেলের শাসন ছিল। হাতিগুক্ষা শিলালেখ থেকে খাববেলের বিষয়ে জানা যায়। ঐ শিলালেখতে ভাবতবর্ষ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল তবে সেখানে ভাবতবর্ষ বলতে সম্ভবত গঙ্গা উপত্যকাব একটা অংশ বোঝানো হয়েছিল তবে খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের প্রথম দিকেই চেদিদের শাসন শেষ হয়ে গিয়েছিল।

দক্ষিণ ভারতের সাতবাহন শাসন

মৌর্য সাম্রাজ্যেব পরে দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারতে সাতবাহন শাসন দেখা গিয়েছিল। ঐ সময় দাক্ষিণাত্যের উত্তর-পশ্চিম অংশে ও গুজরাট এলাকায় ছিল শকদের শাসন খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের দ্বিতীয় ভাগে দাক্ষিণাত্যে সাতবাহনদের শাসন শুরু হয়েছিল। আনুমানিক ২২৫ খ্রিস্টাব্দ বা তার কিছু পরে সাতবাহন শেষ হয়ে যায়।

李涛流动为

সাতবাহন বংশেব প্রথম শাসক সিমুক-এব সময় প্রতিষ্ঠান ও নানাঘাট অঞ্চলে সাতবাহন শাসন ছিল বাজা প্রথম সাতকর্ণি ছিলেন সাতবাহন বংশেব তৃতীয় বাজা। তাঁর আমলে সাতবাহনদের প্রভাব প্রতিপত্তি বেডে যায়। প্রায় সাবা দক্ষিণ ভারত জুডে ছডিয়ে পডেছিল তাঁর ক্ষমতা। তবে সাতবাহনদের প্রধান বিপক্ষ ছিল পশ্চিম ভারতেব শক-ক্ষত্রপ শক্তি। এই সময় দাক্ষিণাত্যের রাজনীতিতে শক-সাতবাহন লড়াই জবুরি হয়ে উঠেছিল। প্রথম দিকে এই লডাইয়ে শক শাসক নহপান সফল হয়েছিলেন

সাতবাহনদের ক্ষমতা ফিরে এসেছিল গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির আমলে। পশ্চিম উপকূল থেকে পূর্ব উপকূল পর্যন্ত সমস্ত দাক্ষিণাত্যে তাঁর শাসন ছিল। শক-ক্ষত্রপদের হারিয়ে গুজরাটের দক্ষিণ ও পশ্চিম অংশে এবং মালবেও গৌতমীপুত্রের অধিকার কায়েম হয়। তাঁর আমলের নাসিক লেখ ও কার্লে লেখ থেকে তাঁর রাজ্যবিস্তারের কথা জানা যায়।

অন্য একটি শক ক্ষত্রপ গোষ্ঠীব সঙ্গেও সাতবাহনদের লডাই বেধেছিল।
ঐ গোষ্ঠীর বিখ্যাত শাসক ছিলেন রুদ্রদামন। তিনি মহাক্ষত্রপ উপাধি
নিয়েছিলেন তাঁর কৃতিত্ব জানা যায় জুনাগড়ে পাওয়া একটি শিলালেখ থেকে।
শক-ক্ষত্রপ শাসকদের ক্ষমতা উজ্জয়িনী থেকে গুজবাট ও কাথিয়াওয়াড় পর্যস্ত ছডিয়ে পডেছিল।

শক-সাতবাহন লডাইয়েব পিছনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক — দুই দিকইছিল।বিশেষ কয়েকটি এলাকাব ওপর দুটি শক্তিই দখল কায়েম কবতে চেয়েছিল। তেমন একটি এলাকা ছিল পূর্ব ও পশ্চিম মালব পূর্ব মালবে কোসা এলাকায একটি হিবেব খনি ছিল। পশ্চিম মালবেব মধ্যে দিয়ে সমুদ্র-বাণিজ্য হতো। তাছাডা দাক্ষিণাত্যেব পশ্চিম উপকূল দিয়ে বোম-ভাবত বাণিজ্য চলত ফলে ঐ এলাকাগুলিব দখল নিয়ে শক ও সাতবাহনদেব লডাই চলেছিল।

ধীরে ধীরে দাক্ষিণাত্যে সাতবাহনদের শাসন শেষ হয়ে গিয়েছিল তার জায়গায় বেশ কয়েকটি ছোটো ছোটো বাজবংশ গড়ে উঠেছিল।

কুষাণ এবং সাতবাহন শাসন পদ্ধতি

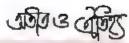
প্রাচীন চিনেব সম্রাটবা নিজেদেবকে দেবতার পুত্র বলতেন। কুষাণবা আদতে চিন থেকে এসেছিলেন। হয়তো সেজন্যই চিন সম্রাটদেব মতো তাঁবাও নিজেদেব দেবপুত্র অর্থাৎ দেবতাব পুত্র বলে যোষণা করতেন। বিম কদফিসেস দমঅর্ত বা বিশ্বব্রহ্যাণ্ডের কর্তা উপাধি নিয়েছিলেন। কনিষ্ক উপাধি নিয়েছিলেন মহাবাজা রাজাধিরাজ দেবপুত্র শাহী। কুষাণদেব মুদ্রায় সম্রাটেব মাথাব পিছনে এক বকমেব জ্যোতির্বলয় দেখা যায়। তেমন জ্যোতির্বলয় দেবতাদেব মাথাব পিছনেও খোদাই

प्रेकासा कथा

নাসিক লেখ মহাবাষ্ট্রেব নাসিক থেকে পাওয়া গেছে দু-টি লেখ। একটি গৌতমী পুত্র সাতকর্ণিব রাজত্বেব ১৮ বছরের, অন্যটি ২৪ বছরেব। শকদেবধ্বংস গৌতমীপুত্র সাতবাহন দেৱ হারিয়ে যাওয়া গৌবব ফিবিয়ে এনেছিলেন। মনে হয় যে তিনি নাসিক এলাকাব উপর ফেব শাসন কায়েম করেছিলেন। মুদ্রা থেকেও এই কথা প্রমাণ হয়। পশ্চিম উপকুল থেকে পূর্ব উপকৃল পর্যন্ত পুরো দাক্ষিণাত্য তিনি অধিকার করেছিলেন শকক্ষত্রপ নহপানের বিরুদ্ধে সফল হলেও, কার্দমক বংশের শক রাজা চষ্টনের কাছে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি

পবাজিত হয়েছিলেন।

731377533





কবা হতো। সম্রাট ও দেবতাদেব একই বোঝানোব জন্য শাসকবা নানান উদ্যোগ নিতেন। তেমনই একটি উদ্যোগ ছিল দেবকুল প্রতিষ্ঠা। বিশাল কুষাণ সাম্রাজ্যে নানাবকমের মানুষ বাস কবতো। তাদেব সবাইকে একজোট কবার জন্যই শাসককে দেবতাব মতো প্রচাব কবা হতো। দেবকুল মন্দিরেব মতোই একটা পুজোর জায়গা সেখানে কুষাণ সম্রাটের মূর্তিও রাখা হতো। মথুবায় একটি দেবকুল ছিল। সেখানে সম্রাট বিমেব সিংহাসনে বসা মূর্তি পাওয়া গেছে। সম্ভবত প্রথম কনিষ্কেব মাথা ভাঙা মূর্তিটি ঐ দেবকুলেই ছিল

কুষাণ শাসনে লক্ষ করাব মতো বিষয় হলো দুজনে মিলে বাজ্যপাট চালানো। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় বাবা ও ছেলে একসঙ্গে শাসন কাজ চালাতেন শাসন ব্যবস্থাব সুবিধেব জন্য সাম্রাজ্যকে ভাগ কবা হতো কতগুলি প্রদেশে। সেই প্রদেশেব শাসককে বলা হতো ক্ষত্রপ।

সাতবাহন শাসন ব্যবস্থায়ও প্রধান ছিলেন রাজা। তিনি আবার সেনাবাহিনীরও প্রধান ছিলেন। কুষাণদের মতোই সাতবাহন শাসকরা শাসনের সুবিধের জন্য বডো অঞ্চলকে ছোটো প্রদেশে ভাগ



করেছিলেন সাতবাহন শাসনে প্রদেশেব দায়িত্বে থাকত অমাত্য নামেব বাজকর্মচাবী। ভাগ ও বলি দু বকম করই নেওয়া হতো। উৎপন্ন ফসলের 🍾 অংশ ভাগ হিসাবে নেওয়া হতো। বাণিজ্যিক লেনদেনের থেকে কর আদায় কবা হতো। কুষাণ সাতবাহন আমলে বাণিজ্যেব খুব উন্নতি হয়েছিল। ফলে কারিগব ও বণিকদের থেকে শাসকবা কর আদায় কবতেন। বণিকদেব থেকে নগদ কব নেওয়া হতো সাতবাহন আমলে সাতবাহন শাসকরা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকৈ জমি দিলে তার কর নিতেন না। বিশেষ ক্ষেত্রে কোনো কেনো কর মকুব করা হতো। মৌর্যদের মতোই কুষাণ ও সাতবাহন শাসকরা নুনের ওপর কর বসিয়েছিলেন।

রাজতান্ত্রিক শাসনের পাশাপাশি অরাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর শাসনও ছিল। মধ্য ভারত ও পশ্চিম ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে অবাজতান্ত্রিক গণসংঘগুলি টিকে ছিল। এবা নিজেদেব তামাব মুদ্রা চালু কবেছিল। রাজশক্তিগুলির সঙ্গে গণসংঘগুলির লড়াই এই পর্যায়েও চলেছিল

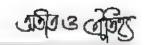
টুকান্ত্রে কথা কনিচ্ছের মূর্তি

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে মথুবাব কাছে একটি ক্ষেত থেকে একটি মৃতি পাওয়া যায়।
সেটার মাথা ও বাহু ভাঙা ছিল। দেখে সেটাকে একজন যোশা বাজাব মৃতিঁ
বলেই মনে হয়েছিল। মৃতিঁর ডান হাতে একটা রাজদণ্ড ধবা বয়েছে। বাঁ-হাতের
মুঠোয কাবুকাজ কবা তলোয়াবেব বাঁট লম্বা, হাঁটু পর্যন্ত কোট বয়েছে তাব গায়ে।
কোমরে বেল্ট লাগানো তার উপরে গোডালি অবধি একটা আলখাল্লা। মৃতিটার
পায়ে বুটজুতোও বয়েছে। মৃতিটির তলাব দিকে ব্রায়্মীলিপিতে লেখা বয়েছে তাব
থেকে জানা যায় সেটা কুষাণ সম্রাট প্রথম কনিষ্কেব মৃতিঁ

৬.৪ গুপ্ত সাম্রাজ্য

আনুমানিক ২৬২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ উত্তব ভারতে কুষাণ শাসন লোপ পেয়ে যায়। তারও প্রায় পঞ্চাশ বছবেরও বেশি পবে উত্তর ভারতে গুপ্তশক্তি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। প্রথমদিকে গুপ্ত শাসকবা মহারাজ উপাধি নিতেন। তবে সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময় থেকে গুপ্ত শাসকবা মহাবাজাধিরাজ উপাধি নিয়েছিলেন অর্থাৎ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময় থেকেই গুপ্তদের শাসন ক্ষমতা অনেক বেশি ছডিয়ে পডেছিল ৩১৯-৩২০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত শাসক হন ঐ সময় থেকেই গুপ্তাব্দ গোনা শুরু হয়। মধ্যগঙ্গা উপত্যকার ওপর ভিত্তি করেই গুপ্ত সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। সম্ভবত ৩৩৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রথম চন্দ্রগুপ্তব শাসন চলেছিল

পরবর্তী শাসক সমুদ্রগুপ্তের আমলে (আনুমানিক ৩৩৫ থেকে ৩৭৫ খ্রিস্টাব্দ) গুপ্ত সাম্রাজ্য সবথেকে বড়ো আকার পেয়েছিল। উত্তর ভারত বা আর্যাবর্তের নয়জন শাসককে হারিয়ে দেন সমুদ্রগুপ্ত। অরণ্য বা আটবিক রাজ্যগুলিও তাঁর অধীনে এসেছিল। এব ফলে পূর্বে রাঢ় থেকে পশ্চিমে গঞ্চ্গা উপত্যকার ওপরেব অংশ পর্যন্ত গুপ্ত শাসন ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ ভাবতেও বাবোজন রাজাকে হাবিয়ে দেন সমুদ্রগুপ্ত।



प्रेवाखा वाथा

এলাহাবাদ প্রশস্তি

দুর্গেব এলাহাবাদ ভিতরে একটি শিলালেখ লেখটি আছে। গৃপ্তযুগেব ব্রায়ীলিপিতে ও সংস্কৃত ভাষায় খোদাই করা। এলাহাবাদেব কৌশাম্বী গ্রামে লেখটি 'ছিল পরবর্তী সময়ে মুঘল সম্রাট আকবর প্রেটিকে তুলে আনিয়ে এলাহাবাদ দুর্গেব মধ্যে রাখেন। ঐ লেখটিতে প্রশস্তি খোদাই করা প্রশস্তিটি . আছে। হরিষেণের লেখা তিনি সম্রাট সমুদ্রগুপ্থেব সভাকবি ছিলেন লেখটিতে আদতে সমুদ্রগুপ্তেব গুণগান করা হয়েছে। সম্রাট হিসাবে সমুদ্রগুপ্তের যুষ্ধ, বাজ্যজয় প্রভৃতিব কথা লেখটিতে আছে পদ্য ও গদ্য দু-ভাষাতেই সেটি লেখা। যদিও সমুদ্রগুপ্তেবপ্রসক্ষো শুধু ভালো কথাই লেখটিতে বলা হয়েছে। তবুও ওই সময়েব ইতিহাস জানাব জন্য লেখটি জর্বি প্রতাত্ত্বিক উপাদান

সৃদূর দক্ষিণে তামিলনাডুর উত্তর-পূর্ব অংশ পর্যন্ত গুপ্ত শাসকের অধিকার কায়েম হয়েছিল। তবে দক্ষিণ ভারতে বাবো জন রাজাকে শেষ পর্যন্ত রাজত্ব ফিরিয়ে দেন সমুদ্রগুপ্ত উত্তব ভাবত থেকে দক্ষিণ ভাবতে শাসন টিকিয়ে বাখা সম্রাটের পক্ষে বোধহয় সম্ভব ছিল না সে সময়ের কয়েকটি বাজশক্তি সমুদ্রগুপ্তকে কব দিত তাদের বলা হতো কবদ রাজ্য।

সমুদ্রগুপ্তের ছেলে দিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ৩৭৬ খ্রিস্টাব্দ (৫৬ গুপ্তাব্দ) নাগাদ শাসক হন। গুজবাট অঞ্চল থেকে শক-ক্ষত্রপ শাসকদের উচ্ছেদ করেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। তাই তাঁকে বলা হয় শকাবি (শক + অবি (শত্রু) = শকাবি)। তাঁব আমলেই প্রথম বুপোব মুদ্রা চালু হয়। সম্ভবত শকদেব হারিয়ে দেওয়ার প্রতীক হিসেবে ৪১০ ৪১১ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ঐ রুপোর মুদ্রা চালু কবা হয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলেও গুপ্ত সাম্রাজ্যের আয়তন বেড়েছিল।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তেব পর সম্রাট হন প্রথম কুমার গুপ্ত (৪১৪–৪৫৪/৪৫৫ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁব শাসনকালে গুপ্ত সাম্রাজ্যেব আয়তন ও ক্ষমতা আগের মতোইছিল। তিনি সাম্রাজ্যে নানারকম মুদ্রা চালু করেছিলেন। তাঁব সময়েই নালন্দা মহাবিহার স্থাপিত হয়। প্রথম কুমাবগুপ্তের ছেলে স্কন্দগুপ্ত এরপব সম্রাট হন। আনুমানিক ৪৫৮ খ্রিস্টাব্দে উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম দিকে হুণরা আক্রমণ করে। স্কন্দগুপ্ত সফলভাবে সেই আক্রমণ রুখে দিয়েছিলেন। তিনি সম্ভবত শেষ গুপ্ত সম্রাট যাঁব শাসন এলাকা ছিল বিবাট। তাঁব পব থেকেই গুপ্তদেব শক্তিকমতে থাকে। ছোটো ছোটো স্থানীয় শাসকরা গুপ্ত শাসকদেব অমান্য কবতে থাকে। ফলে উত্তর ভারতে বেশ কিছু আঞ্চলিক শাসন দেখা দেয়।

দাক্ষিণাত্যে বাকাটক শাসন

উত্তর ভারতে গুপ্ত শাসনের সময়েই দাক্ষিণাত্যে বাকাটক শাসন শুবু হয়েছিল।
আনুমানিক ২২৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ বাকাটক শক্তি দাক্ষিণাত্যে বড়ো হয়ে দেখা
দেয়। সাতবাহন শাসন ততদিনে লোপ পেয়ে গিয়েছিল। খ্রিস্টায় চতুর্থ ও পঞ্চম
শতকে দাক্ষিণাত্য ও মধ্য ভারতের বড়ো এলাকা জুড়ে বাকাটক শাসন ছিল।
দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মেয়ে প্রভাবতীগুপ্তার বিয়ে হয়েছিল বাকাটক-বাজা দ্বিতীয়
বুদ্রসেনের সঙ্গে। তার ফলে দাক্ষিণাত্যেও গুপ্ত শাসনের প্রভাব তৈরি হয়েছিল।
দ্বিতীয় রুদ্রসেন মারা যাওয়ার পর প্রভাবতীগুপ্তাই বাকাটক শাসন
চালিয়েছিলেন।

অস্ত্রপ্রদেশের দক্ষিণ ভাগে ক্রমশই পল্লবদের শক্তি বাড়ছিল আনুমানিক সপ্তম শতকেব গোডাব দিকে দক্ষিণ ভাবতে চালুক্য ও পল্লববাই হয়ে উঠেছিল প্রধান শক্তি।মনে রেখো, দক্ষিণের পল্লববা কিন্তু পহুব বা পার্থীয়দেব থেকে আলাদা।



গুপ্ত ও বাকাটক প্রশাসন

খ্রিস্টীয় ৩০০ থেকে ৬০০ অন্দেব মধ্যে ভাবতীয় উপমহাদেশেব বাজনীতি ও শাসনব্যবস্থায় বেশ কয়েকটি বদল ঘটেছিল। পুবো উপমহাদেশ জুডে ছড়িয়ে পড়েছিল রাজতান্ত্রিক শাসন। অরাজতান্ত্রিক শক্তিগুলি কার্যত লোপ পেয়ে গিয়েছিল। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের প্রথম দিকে বৈশালী অঞ্চলে লিচ্ছবি গোষ্ঠীর গুবুত্ব ছিল। পরেব দিকে বৈশালী সবাসবি গুপ্ত সম্রাটদেব প্রাদেশিক শাসন



কেন্দ্রে পবিণত হয়। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের পর উত্তর ভারতে অরাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী প্রায় ছিলই না পাশাপাশি অরণ্য অঞ্চলেব আটবিক বাজ্যগুলিও সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক এলাকা হয়ে গিয়েছিল।

গুপ্ত শাসনেব কাঠামোয সম্রাটই ছিলেন প্রধান। বিবাট ক্ষমতা বোঝানোব জন্য তাবা বড়ো বড়ো উপাধি নিতেন বাকাটক রাজাবা অবশ্য শুধু মহারাজা উপাধিই ব্যবহার কবতেন। গুপ্ত সম্রাটবা অনেকেই রাজনৈতিক ক্ষমতা দেখানোব

प्रेकाखा कथा

চন্দ্ররাজার স্তম্ভ

দিল্লিৰ কুতুব মিনাৰের কাছে একটি উচু লোহাব ক্তম্ভ আছে। তার গায়ে একটি লেখ খোদাই করা হয়েছিল তাতে চন্দ্ৰ নামে এক শক্তিশালী বিষ্বভক্ত রাজার যুশ্বজয়ের বর্ণনা আছে। লেখটিতে কোনো সাল-তাবিখ নেই। ঐ চন্দ্ৰবাজা ঠিক কে তাও পবিষ্কাব করে বলা নেই। লেখটি সম্ভবত খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে খোদাই কবা হয়েছিল

এ চন্দ্রবাজাকে দ্বিতীয়
চন্দ্রগুপ্ত বলেই মনে করা
হয় লেখটিও তাঁরই
সমকালীন তাছাড়া
দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিশ্বুব
ভক্ত ছিলেন তবে
অনেক মিল সত্ত্বেও
লেখতে বলা সমস্ত অঞ্চল দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত
জয় করেননি ঐ বর্ণনা
অনেকটাই কাল্পনিক



জন্য বড়ো বড়ো যজ্ঞ কবেছিলেন। কুষাণদের মতোই গুপ্ত সম্রাটরাও নিজেদের দেবতার সঙ্গে তুলনা করতেন।

সম্রাটকে শাসনকার্যে সাহায্য করতেন বাজকর্মচারীরা। গুপ্ত ও বাকাটক শাসনে বিভিন্ন পদ ও মর্যাদার রাজকর্মচারী ছিল। অমাত্য বা সচিব ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজকর্মচারী গুপ্ত সাম্রাজ্য বেশ কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করা হয়েছিল। প্রদেশগুলিকে বলা হতো ভুক্তি, যেমন মগধভুক্তি। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশে ভুক্তির বদলে দেশ শব্দের ব্যবহার দেখা যায় প্রদেশের শাসনভার থাকত গুপ্ত বাজপুত্রদের হাতে। বাকাটক শাসনে প্রদেশগুলি বাজ্য নামে পরিচিত ছিল। বাজ্যের শাসকদের বলা হতো সেনাপতি

প্রদেশের থেকে ছোটো জেলা অঞ্বলগুলো গুপ্ত শাসনে বিষয় নামে পরিচিত হতো। বাকাটক শাসনে বিষয় শব্দের বদলে জেলা অঞ্বলগুলোকে বলা হতো পট্ট বা আহার গুপ্ত ও বাকাটক শাসনে সমস্ত শাসন ব্যবস্থাটা বেশ কয়েকটি স্তরে ভাগ করা ছিল জেলা ও গ্রামস্তরেব শাসন ব্যবস্থাব ক্ষেত্রে নানা জনপ্রতিনিধিব ভূমিকা ছিল গুবুত্বপূর্ণ। গুপ্ত সাম্রাজ্য শাসনে যুববাজ ও বানিদেবও বিশেষ ভূমিকা ছিল। তবে গুপ্ত শাসনেব শেষ দিকে সাম্রাজ্য শাসন ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

৬.৫ গুপ্তদের পর উত্তর ভারতের অবস্থা

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে গুপ্তদের ক্ষমতা ক্রমশ কমতে থাকল। একসময় গুপ্ত সাম্রাজ্য গেল ভেঙে। আর তার জায়গা নিল ছোটো ছোটো রাজ্য। একেকটা অঞ্চলকে নিয়ে গড়ে ওঠা সেই বাজ্যগুলিকে বলা হতোআঞ্চলিক বাজ্য।

পুষ্যভূতিদের রাজ্য: হর্ষবর্ধনের শাসন

গুপ্ত সাম্রাজ্যেব পর খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকেবডো সাম্রাজ্য দেখা যায়নি পুষ্যভৃতি বংশেব হর্ষবর্ধন সাম্রাজ্য গড়ার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। গোডায় পুষ্যভৃতিবা থানেসর বা স্থানীশ্বরের শাসক ছিলেন। প্রভাকরবর্ধনের সময় থেকে পুষ্যভৃতিদের ক্ষমতা বাডতে থাকে। ৬০৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ প্রভাকববর্ধন মাবা যান। তখন তাঁর বড়ো ছেলে রাজাবর্ধন শাসনের দায়িত্ব পান।

এদিকে কনৌজ মালব দ্বন্দ্বে কনৌজেব রাজা গ্রহবর্মা মারা যান। তাঁর সঙ্গো প্রভাকরবর্ধনেব মেয়ে বাজ্যশ্রীব বিয়ে হয়েছিল। রাজ্যবর্ধন তখন মালবের বিরুদ্বে যুদ্ধ শুরু করেন। মালবের রাজা দেবগুপ্তের সহযোগী গৌড়ের রাজা



শশাঞ্চেকর হাতে রাজ্যবর্ধনও মাবা যান তথন হর্ষ কনৌজ ও স্থানীশ্বব —
দুয়েরই শাসনভাব নেন। ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে হর্ষের সিংহাসনে বসার বছব থেকেই
হর্ষাব্দ গোনা শুরু হয়।

হর্ষবর্ধনের সঙ্গে সেই সময়ের অনেকগুলি রাজশন্তিব সংঘাত হয়েছিল।
মগধ জয় করে হর্ষ মগধরাজ উপাধি নিয়েছিলেন। শশাঙ্কের সঙ্গে হর্ষেব
বিবোধ ছিল অনেকদিনেব। কিন্তু শশাঙ্ককে কখনই হর্ষ সবাসবি হারাতে
পারেননি। চালুক্যশাসক দ্বিতীয় পুলকেশীর সঙ্গেও হর্ষর সংঘাত হয়েছিল।
পশ্চিম উপকুলের বাণিজ্ঞািক বন্দবের দখলের চেষ্টা দুজনেই করেছিলেন।
তবে যুদ্ধেব ফলাফল হর্ষের বিপক্ষে গেছিল। দ্বিতীয় পুলকেশীর সভাকবি
ববিকীর্তি আইহােল প্রশস্তি লিখেছিলেন। তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যুদ্ধে হর্ষের
হর্ষ (আনন্দ) স্লান হয়ে গিয়েছিল।

অনেক সামরিক অভিযান কবলেও হর্ষের সব অভিযান সফল হয়নি।
হর্ষকে সকলোত্তরপথনাথ (উত্তব ভাবতেব সমস্ত পথেব প্রভু) বলা হয়েছে।
কিন্তু আদতে সমস্ত উত্তর ভাবতে হর্ষের শাসন ছিল বলে মনে হয় না। তবে
উত্তব ভাবতে শেষ বড়ো অঞ্চলেব শাসক হিসাবে হর্ষবধনই সবথেকে বিখ্যাত।
তিনি শিলাদিত্য উপাধি নিয়েছিলেন।

শাসনব্যবস্থার প্রধান ব্যক্তি ছিলেন হর্ষবর্ধন নিজে তাঁকে সাহায্য করত মন্ত্রীপবিষদ। এছাড়াও অমাত্যদেব হাতে বাজকাজেব দাযিত্ব থাকত। টানা যুন্ধ করে চলার কারণে হর্ষের সেনাবাহিনীও ছিল বিরাট।

এই সমস্ত শাসনকাজের জন্য দবকারি সম্পদ আসত কর থেকে জমিতে উৎপাদিত ফসলের 🏒 অংশ কব নেওয়া হতো। তাছাড়া বণিকদের থেকে কব আদায় করা হতো। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে বিনা করে জমি দান কবা হতো।

প্রাদেশিক শাসনেব ক্ষেত্রে গুপ্ত শাসনেব কাঠামোই হর্ষেব আমলেও দেখা যায়। সম্ভবত শাসনের কাজ চালানোর জন্য মন্ত্রীদেব নিয়ে গড়ে ওঠা একটি পরিষদ তাঁকে সাহায্য কবত। দূরেব প্রদেশগুলি শাসন করতেন সামস্ত রাজা বা রাজাব কোনো প্রতিনিধি। প্রতিটি প্রদেশ বা ভুক্তি কয়েকটি বিষয় বা জেলায় বিভক্ত ছিল। শাসনব্যবস্থায় সবচাইতে নীচে ছিল গ্রামগুলি।

হর্ষের মৃত্যুর পর পুষ্যভৃতি শাসন লোপ পায়। বিভিন্ন ছোটো ছোটো শাসকবা হর্ষেব অধীনের বিভিন্ন এলাকা দখল করে নেয়।

प्रेवाखा यथा

বাণভট্টের হর্ষচরিত

বাণভট্ট হর্ষবর্ধনকে নিয়ে হর্ষচরিত কাব্য লেখেন এটি আদতে একটি প্রশস্তিকাবা অর্থাৎ এই কাবো হর্মের কেবল গুণগান কবা হয়েছে। পাশা পাশি প্যাড়তিদেব বাজত্ব ও ইতিহাস তার আলোচনা করেছেন বাণ হর্ষের গুণগান করতে গিয়ে তাঁর বিবোধীদের ছোটো করেছেন বাণ যেমন, বাজা শশাভককে অনেকভাবে থাটো করে দেখানোর চেম্বা হয়েছে। হর্ষবর্ধনের রাজাশ্রীকে বোন ফিবিয়ে নিয়ে আসাব ঘটনাব বর্ণনা দিয়ে হর্ষচরিত শেষ হয়েছে হর্ষচরিত আসলে হর্ষবর্ধনের আংশিক জীবনী। তবে শৃধ্ গুণগানের জন্য এটিকে নিরপেক্ষ বলে মেনে নেওয়া মুশকিল

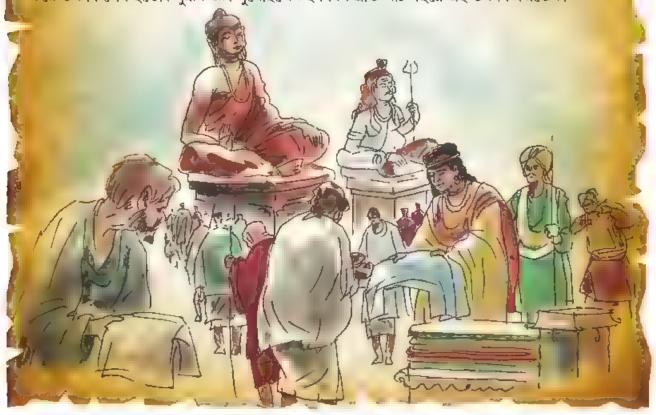
प्रेकाखा कथा

সুয়ান জাং-এর বর্ণনায় হর্ষবর্ধন, বৌন্ধ সম্মেলন ও প্রয়াগের মহাদান

সপ্তম শতকের প্রথমভাগে চিনা বৌন্ধ ভিক্ষু সূয়ান জাং ভারতীয় উপমহাদেশে এসেছিলেন।
সেই অভিজ্ঞতাব কথা লিখেছিলেন সি-ইউ-কি গ্রন্থে। সুয়ান জাং এব লেখায় হর্ষবর্ধনের ক্র্ প্রসঞ্জো অনেক কথা আছে। তবে হর্ষের প্রতি সুযান জাং এর পক্ষপাতিত্ব ছিল। হর্ষেব ক্রি নানা গুণগান করেছেন তিনি। তাঁর বেশ কিছু বর্ণনা বাস্তব বলে মনে হয় না।

সুয়ান জাং কনৌজে অনেকগুলি বৌল্ধবিহার দেখেছিলেন তার পাশাপাশি ছিল দেবমন্দিব। সুয়ান জাং হর্ষের বৌল্ধ ধর্মের প্রীতির কথাই বেশি বলেছেন অন্যদিকে বাণভট্টেব লেখায় হর্ষকে শিবভক্ত বলে বলা হয়েছে।

সুযান জাং লিখেছেন, হর্ষবর্ধন প্রতি বছব একটা বৌল্ধ সম্মেলন আয়োজন করতেন। সেখানে একুশ দিন ধরে আলাপ-আলোচনা চলত। যাবা ভালো কাজ করত তাদেব পুবস্কাব দেওয়া হতো। খাবাপ কাজের জন্য বাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হতো। প্রয়াগে হর্ষেব মহাদানক্ষেত্র ও উৎসব নিয়েও লিখেছেন সুয়ান জাং। মহাদানক্ষেত্রে বুল্ধেব ও শিবের মূর্তি বসানো হতো। আট দিন ধরে নানা জিনিস দান করা হতো। তার ফলে নাকি হর্ষেব পাঁচ বছরের জমানো সব সম্পদ শেষ হয়ে যেত। সব দান করে দিয়ে হর্ষ কেবল একটা পুরোনো পোশাক পরতেন। তারপর বুল্ধের পুজো করে উৎসব শেষ হতো। সুয়ান জাং শুনেছিলেন হর্ষবর্ধন প্রতি পাঁচ বছরে এই উৎসব করতেন।



ভেবে দেখো



১। নীচের বাক্যগুলির কোনটি ঠিক কোনটি ভূল লেখো :

- ১ ১) সেলকাস ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যেব মধ্যে চিবকাল শত্রতা ছিল।
- ১.২) মৌর্য আমলে মেয়েরাও মহামাতোর দায়িত্ব পেতেন।
- কুষাণরা এদেশেরই মানুষ ছিলেন।
- ১.৪) প্রথম চন্দ্রগুপ্ত গুপ্তাব্দ গোনা চালু করেন

২। নীচের বিবৃতিগুলির সঞ্গে কোন ব্যাখ্যাটি সবথেকে বেশি মানানসই বেছে বের করো:

২ ১) বিবৃতি অশোক তাঁব সাম্রাজ্যে পশৃহত্যা বন্ধ কবেছিলেন।

ব্যাখ্যা: ১- তাঁর রাজ্যে পশুব সংখ্যা বাড়ানোর জন্য।

ব্যাখ্যা : ২- ধন্মের অনুসবণ কবার জন্য।

ব্যাখ্যা : ৩- পশ্বাণিজ্য বাড়ানোর জন্য।

২.২) বিবৃতি কৃষাণ সম্রাটবা নিজেদেব মূর্তি দেবকুলে বাখতেন।

ব্যাখ্যা : ১- তাঁবা ছিলেন দেবতার বংশধর

ব্যাখ্যা ২- তাঁরা প্রজাদের সামনে নিজেদের দেবতার মতোই সম্মাননীয় বলে হাজিব করতেন।

ব্যাখ্যা : ৩- তাঁরা দেবতাকে থুব ভক্তি করতেন।

২.৩) বিবৃতি : গুগু সম্রাটরা বড়ো বড়ো উপাধি নিতেন।

ব্যাখ্যা : ১- উপাধিগুলি শুনতে ভালো লাগত।

ব্যাখ্যা : ২- উপাধিগুলি প্রজারা দিত।

ব্যাখ্যা ৩- সম্রাটরা এব মাধ্যমে নিজেদের বিরাট ক্ষমতাকে তুলে ধবতেন।

২ ৪) বিবৃতি সুয়ান জাং চিন থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে এসেছিলেন

ব্যাখ্যা: ১- ভাবতীয় উপমহাদেশে বেডানোর জন্য।

ব্যাখ্যা: ২- হর্ষবর্ধনেব শাসন বিষয়ে বই লেখার জন্য

ব্যাখ্যা : ৩- বৌশ্ব ধর্ম সম্পক্তি আরও পড়াশোনা কবার জন্য।

৩। নিজের ভাষায় ভেবে লেখো (তিন/চার লাইন):

- ৩ ১) কলিজাযুদ্থেব ফলাফলের সজেগ অশোকের ধন্মের কী সম্পর্ক ? ধন্ম তাঁর শাসনকে কতটা প্রভাবিত করেছিল ?
- ৩ ২) মৌর্য সম্রাটরা গুপ্তচর কেন নিয়োগ কবতেন?
- ৩৩) মৌর্য সম্রাট ও গুপ্ত সম্রাটদের মধ্যে ক্ষমতা ও মর্যাদার তুলনা কবো

৪। হাতেকলমে করো:

মৌর্য, কুষাণ ও গুপ্ত আমলের মুদ্রাগুলিব তুলনা করলে কী কী মিল-অমিল দেখা যাবে?

অর্থনীতি ও জীবনযাত্রা

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম ভাগ

জা সম্রাটদেব কথা শুনতে ভালো লাগে তবে খালি বাজাদের কাজকর্মেব কথাই শুনতে ভালো লাগে না বুবির। দাদুকে তাই পাকডাও করল সবাই। আজ ওদের স্বাইকে গল্প শোনাতে হবে। তবে বাজার বা রূপকথার গল্প নয় এমনি লোকজনের গল্প। দাদু বললেন, বেশ তাই হোক বলেই সটান বসে গন্তীর গলায় আবৃত্তি করলেন। ওরা চিরকাল/ টানে দাঁড, ধরে থাকে হাল / ওরা মাঠে মাঠে/ বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।/ ওরা কাজ করে/ নগরে প্রান্তরে। দাদুর মুখে আবৃত্তি শুনছে সবাই। আবাব বললেন দাদু, রাজছত্র ভেঙে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে,/ জযন্তন্ত মুঢ়সম অর্থ তার ভোলে,
—ওমা হঠাৎ গল্পের কথায় কবিতা চলে এল। এর মানে কী? দাদু বুঝিয়ে বললেন, এই কবিতায় ওরা মানে সাধারণ মানুষ। তারা চিরদিনই নিজেব নিজেব কাজ করে যায়। ক্ষেতে ফসল ফলায়। নৌকা চালায় নদীতে। নগর বা গ্রাম সব জাযগাতেই সাধাবণ মানুষের কাজকাববাব চলতে থাকে কিন্তু সাম্রাজ্য বেশি দিন থাকে না একজন শাসক হয়। বেশ কিছু বছব তাব শাসন চলে। তাবপব অন্যজন শাসক হয়ে বসে। একটা সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ে। অন্য সাম্রাজ্য তৈবি হয়। বাজছত্র সেই সাম্রাজ্যের প্রতীক। তাই রাজছত্র সাম্রাজ্যের সঙ্গেল্ট ভেঙে যায়। সাম্রাজ্য থাকলে যুম্বও থাকে। কিন্তু সেইসব যুম্বও একদিন থেমে যায়। রণডঙ্গা মানে যুম্বেব (বণ) বাজনা (ডঙ্কা)। সেসবেব শব্দ আব শোনা যায় না।

যুম্বে জিতে জয়ীরা উঁচু করে স্তম্ভ বানায়। সেই স্তম্ভও একসময় ভেঙে পড়ে। না ভাঙলেও তার জৌলুস কমে যায় অর্থাৎ সম্রাট, সাম্রাজ্য, যুম্ব, যুম্বে জয় সব একসময় ফিকে হয়ে আসে। কিন্তু, চাষি তার ক্ষেতে বীজ বোনে পাকা ফসল কাটে। সেই ফসল একসময়ে সম্রাটের পেট



এই বলে দাদু ফেব আবৃত্তি করলেন শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ— 'পবে/ওরা কাজ কবে।/—শেষে বললেন, আজ সম্রাটও নেই, সাম্রাজ্যও নেই। কিন্তু চাষি আছে, কাবিগব শিল্পীবা আছে এবাই সমাজ চালায। এবাই খাদ্য উৎপাদন কবে আমাদেব বোজকাব প্রযোজন মেটায়। আমবা সবাই এই 'ওবা'-ব ভিতবে পিড আমবা সাধাবণ মানুষ। কিন্তু আমাদের সবাব নাম বিখ্যাত নয়। বাজা সম্রাটদেব নাম অনেকেই জানে কিন্তু সম্রাট অশোকের বথ চালাতেন কে? তাব নাম কেউ জানে না। এসব শুনে অবুণ বলল, সত্যি এটা ভাবি অন্যায়। বাজাদেব কথা কত ফলাও কবে বলা হয় কিন্তু সাধারণ মানুষের কথা তো ঢাক পিটিয়ে বলা হয় না তাদেব নামও আমরা জানতে পাবি না। তখন সবাই মিলে ঠিক কবল স্কুলে গিয়ে স্যাবকে বলবে এসব।

পরদিন স্যার সব শুনলেন। বললেন, এবারে তাহলে প্রাচীন ভারতের সাধারণ মানুষের কথাই আলোচনা হোক। সাধারণ মানুষকে নিয়েই সমাজ তৈরি হয়। তাদের কাজকর্মের ফলেই সম্পদ তৈরি হয়। সেই সম্পদে চলত রাজার, সম্রাটের শাসন। এবারে তাহলে সেই সমাজ, অর্থনীতি ও সাধারণ মানুষের কথাই শুরু হোক তোমরা তো খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক নাগাদ ষোলোটা মহাজনপদের কথা জেনেছ। ঐ সময় থেকেই শুরু কবা যাক

৭.১ খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক : ষোড়শ মহাজনপদের আমল

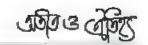
মহাজনপদগুলির আমলে ভারতীয় উপমহাদেশের অর্থনীতি ও সমাজও বদলে গিয়েছিল।জনপদ বলতে
কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ অঞ্চলকেও বোঝায়। ফলে জনপদ ও মহাজনপদে কৃষিজীবী জনবসতিও ছিল।
মহাজনপদগুলিতে রাজকর্মচারী ও যোদ্ধাদের ভরণ-পোষণের প্রয়োজনীয় সম্পদ কৃষি থেকেই আসত।
বেশিরভাগ মহাজনপদ গঙ্গা উপত্যকায় ছিল ঐ অঞ্চলের নদীগুলিতে বছরের বেশিরভাগ সময়ই জল
থাকত তার সঙ্গো ছিল যথেষ্ট পরিমাণ বৃষ্টি। এর ফলে ঐ অঞ্চলের উর্বর মাটি চাষের পক্ষে

কৃষিকাজ ছিল সেই সমযেব প্রধান জীবিকা। সেযুগেব বিভিন্ন লেখায় চাষেব কাজেব খুঁটিনাটি বিববণ পাওয়া যায়। উর্ববতা অনুষায়ী জমির নানাবকম ভাগ কবা হতো

বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন ফসল ফলানো হতো। ঋতু অনুযায়ী ফসলগুলিব আলাদা আলাদা নামও ছিল। কৃষিতে ধানই ছিল প্রধান ফসল। ধানেব মধ্যে সেরা ছিল শালি ধান। মগধ অঞ্জলে শালি ধানের চাষ বেশি ছিল। কৃষিজ ফসলের মধ্যে গম, যব ও আখের ফলনও হতো।

> আগের মতো জমির উপব সবাব সমান অধিকার আর ছিল না। কিছু সংখ্যক মানুষেব হাতে অনেক জমিব

অধিকাব ছিল। এর পাশাপাশি ছিল জমিহীন কৃষক। কৃষিব পাশাপাশি পশুপালনও হতো। কৃষির জন্য গবাদি পশুব প্রয়োজন ছিল। সেজন্য খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকের পব থেকে গবাদি পশু বলি দেওয়া কমতে থাকে।



টুকান্ত্রে কথা

উত্তর ভারতের কালো চকচকে মাটির পাত্র

গৌতম বৃন্ধেব সময়ে একবকম মাটিব পাত্র বানানোব শিল্প খুব উত্রত হয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকবা যেগুলিকে উত্তর ভারতের কালো চকচকে মাটির পাত্র বলেন এই পাত্রগুলি আগেব আমলের ধূসব পাত্রগুলিব মাটিব থেকেও উন্নত। খুব ভালো মানেব মাটি দিয়ে এই পাত্রগুলি তৈবি হতো . কুমোরের চাকাব ব্যাপক ব্যবহাবের ফলে এই পাত্ৰ বানানো সহজ হয় পাত্রগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, সেগুলি আয়নাব মতো চকচকে মাটির পাত্রগুলিকে ভালো চুন্নির আঁচে পুডিয়ে কালো করা হতো পোডানোর পব পাত্রগুলি পালিশ করা হতো। এই মাটিব পাত্রের নজিব হিসাবে থালা ও নানা বক্ষেব বাটি পাওয়া গেছে

এই সময়ে কাবিগবি শিল্প ও নানাবকম পেশাব বিবরণও পাওয়া যায় এই সময়েব লোহার জিনিসপত্র প্রত্নতাত্ত্বিকেরা পেয়েছেন। এগুলির মধ্যে বেশিরভাগই ছিল যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র। তাছাডা দা, কুডুল, কুঠার ও কিছু লাঙলের ফলাও পাওয়া গেছে। লোহাব কুডুল ও কুঠাব দিয়ে সহজেই ঘন জঙ্গল কাটা যেত। তার ফলে বসতি ও কৃষি জমি বাডানো সহজ হয়। মহাজনপদগুলি যুদ্ধের কাজে লোহার অস্ত্রের ব্যবহার করতো। মধ্যগঙ্গা উপত্যকায় বেশ ক্ষেকটি অঞ্চলে আকরিক লোহা পাওয়া যেত। দক্ষিণ ভারতে লোহার জিনিসপত্র কৃষিকাজে ব্যবহার হতো। তবে লোহার তৈরি লাঙলের ফলার ব্যবহার দক্ষিণ ভারতে এই সময় হযনি। বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্র হিসেবে খুব বিখ্যাত ছিল বাবাণসী। গয়না বানানোর শিল্পও এইসময় লক্ষ কবা যায়। দামি ও আধাদামি নানাবকম পাথর ও পুঁতিব গয়না বানানোর কাজে ব্যবহাব হতো

কৃষি ও পশুপালনেব পাশাপাশি বাণিজ্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ জীবিকা। এই সময়ে বাণিজ্যের উন্নতি হয়। মুদ্রা ব্যবস্থাব বিকাশ তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ। ধনী বণিকদের পাশাপাশি ছোটো দোকানদার ও ব্যবসায়ীও ছিল। অনেক গোরুরগাড়ি বোঝাই করে দূবদূরান্তে বাণিজ্যে যেতেন কিছু বণিক। গোরু ও ঘোডার বাণিজ্য চলত। উত্তর ভারতে স্থলপথে ও নদীপথে বাণিজ্য করা সহজ ছিল সেই তুলনায় সমুদ্রপথে বাণিজ্য হতো কমা ব্যবসা করতে গেলে ধার দেওয়া-নেওয়াছিল জরুরি। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মে তাব জন্য ছাড় দেওয়াও হযেছিল তবে ধার নিয়ে তা শোধ দেওয়া উচিত বলে মনে কবা হতো বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে এই সময় ধাতুব মুদ্রাব ব্যবহাব দেখা যায়। কার্যাপণ ছিল বহু প্রচলিত এক ধবনেব মুদ্রা। গোল ও টোকো আকৃতির অনেক রুপোব মুদ্রাও পাওয়া গিয়েছে। মুদ্রা ব্যবস্থাব বিকাশ থেকে বোঝা যায় ব্যবসাবাণিজ্যও এইসময় বেড়েছিল। তবে বিন্ধ্য পর্বতেব দক্ষিণে এই সময়ের মুদ্রা খুঁজে পাওয়া যায়নি।

প্রাচীন ভাবতের ইতিহাসে প্রথম নগর দেখা গিয়েছিল হরপ্পা সভ্যতায়।
তাই তাকে বলে প্রথম নগরায়ণ। তার প্রায় হাজার বছরেরও পরে আবার নগর
গড়ে উঠতে দেখা যায়। এই নগবায়ণ মূলত হয়েছিল উত্তর ভারতে বিশেষত
গঙ্গা উপত্যকায়। খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ নাগাদ হওয়া এই নগবায়ণ দ্বিতীয়
নগরায়ণ বলে পবিচিত। সেযুগেব লেখায় গ্রাম ও নগবের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য
দেখা যায়। বেশিরভাগ মহাজনপদেব বাজধানীগুলিই ছিল বিখ্যাত নগব।
নগবগুলি ছিল পাথব, মাটি বা ইট দিয়ে বানানো প্রাকার দিয়ে ঘেবা।

নগরগুলি গ্রামীণ বসতির তুলনায় আকারে বড়ো ছিল। শাসন ও ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত লোকেবা প্রধানত নগরে থাকত। এবা কেউই নিজেরা নিজেদের

部的特殊

খাদ্য উৎপাদন করত না ফলে এদের জন্য নিয়মিত খাদ্য আসত গ্রাম থেকে তাই নগরগুলো গড়ে উঠত গ্রামীণ এলাকার কাছাকাছি। নতুন নগর তৈরি হওয়ার ফলে বেশ কিছু নতুন জীবিকারও খোঁজ পাওয়া যায। এই সময় উত্তর ভাবতে ধোপা, নাপিত ও চিকিৎসকেব (বৈদ্য) জীবিকা খব পবিচিত ছিল।

পবিবাব ও সমাজে নাবীব অবস্থান ছিল পুবুষের পবে নাবীদেব শিক্ষাব সুযোগ ক্রমেই কমে গিয়েছিল। বালিকা বয়সে মেয়েদেব বিয়ে দেওয়াব প্রবণতা সমাজে বেড়ে যায়। তবে নাবীদেব প্রতি বৌন্ধধর্মেব দৃষ্টিভঙ্গি ব্রায়ণ্য ধর্মের তুলনায় কিছুটা উদার ছিল।

৭.২ আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষ ভাগ থেকে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের প্রথম ভাগ: মৌর্য আমল

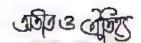
মৌর্য আমলেও সমাজে ধনী ও দবিদ্র এবং অন্যান্য ভেদাভেদ ছিল। নাবীদের সাধাবণ অবস্থা মৌর্য আমলেও আগেব মতো ছিল। তবে ঘরকল্লাব কাজেব বাইরেও নাবীবা কয়েকটি পেশায় যোগদান কবতে পাবতেন। সুতো উৎপাদনের কাজে নাবী শ্রমিকদেব কথা জানা যায় গুপ্তচব ও বাজকর্মচাবী হিসাবেও নাবীদেব নিয়োগ করা হতো।

মৌর্য আমলেও অর্থনীতি মূলত কৃষির উপবেই নির্ভব করত। বহু নদী থাকাব জন্য ও বছরে অন্তত দু বাব বর্ষার ফলে জমি উর্বব থাকত। নানাবকম ও পবিমাণে অনেক ফসলেব কথা জানা যায়। সমাজের বেশিরভাগ মানুষ কৃষিকাজের সঞ্চো যুক্ত ছিলেন আবাদি এলাকা বাড়ানোব দিকেও সেযুগো নজব দেওয়া হতো

কারিগর ও বণিকদের কাজের তদারকি করত রাষ্ট্র। খনি ও খনিজ সম্পদের উপর রাষ্ট্রেব অধিকার ছিল একচেটিয়া। খনিগুলির দেখভালের জন্য বাজকর্মচারী বহাল করা হতো। নুনকেও খনিজ দ্রব্যের মধ্যে ধরা হতো। সুতো ও মুদ্রা তৈরির শিল্পেও রাষ্ট্রের তদারকি চলত। তবে সবক্ষেত্রে এই তদারকি একই রকম ছিল না।

ব্যবসার নানা দিক সম্পর্কে খোঁজখবর রাখার জন্য আলাদা রাজকর্মচারী থাকত। মৌর্য আমলে রাজধানীব সঙ্গে সাম্রাজ্যের নানা এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছিল। নিয়মিত রাজপথের দেখাশোনা করার জন্য রাজকর্মচারী থাকত। পথের পাশে দূরত্ব ও দিক বোঝানোর ফলক লাগানো হতো। সেগুলিছিল অনেকটা আজকের মাইল ফলকের মতো।





प्रेकाखा कथा

মেগাস্থিনিসের চোখে ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ

মেগাস্থিনিস ভাবতীয় উপমহাদেশেব সমাজেব চাবটি বর্ণেব কথা জানতেন না তবে পেশাদার বা বৃত্তিজীবী নানা জাতি তিনি দেখেছিলেন। তাঁব মতে, ভাবতেব জনসমাজ সাতিটি জাতিতে বিভক্ত ছিল। যেমন— ব্রায়ণ বা পণ্ডিত, কৃষক, পশুপালক ও শিকারি, শিল্পী ও ব্যবসায়ী, যোন্ধা, গুপ্তচর বা পর্যটক এবং সচিব বা মন্ত্রী। মেগাস্থিনিস বলেছেন যে, ভারতে দাসপ্রথা ছিল না। মেগাস্থিনিসের মতে, প্রাচীনকালে ভারতবাসীরা নগরে বাস করত না তারা কখনও অন্য কোনো জাতিকে আক্রমণ করে না অপব জাতিবাও ভারতবাসীদেব আক্রমণ করত না। আলেকজান্ডারই একমাত্র যিনি ভাবতবর্ষ আক্রমণ কবেন। মেগাস্থিনিসের মতে, ভারতে কখনও দুর্ভিক্ষ হয়নি। তবে মেগাস্থিনিসের সব কথাগলি কিন্তু ঠিক নয়।

999

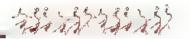
ভেবে দেখো

বৈদিক সমাজেব সঞ্চো মৌর্য আমলেব সমাজেব কী কী মিল ও অমিল খুঁজে পাওয়া ষায় ? মৌর্য আমলে সাধাবণ পুরুষেবা অনেকটা আজকেব ধুতি চাদবেব মতো পোশাক পরতেন।মহিলাবা পোশাকেব উপর চাদব বা ওড়না ব্যবহার কবতেন। ধনী ও রাজপরিবারের নারী-পুরুষ দামি পোশাক পরতেন। সুতির কাপডের চাহিদা সাধাবণ মানুষেব মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছিল পশম ও রেশমেব কাপডের ব্যবহার ছিল বলেও জানা যায়। পুরুষেবা অনেকেই মাথায় পাগড়ি পরতেন। দামি পাথর ও সোনার তৈরি গয়না পরতেন ধনীবা।

মাটি, পাথর, ইট বা কাঠ দিয়ে তৈরি হতো ঘরবাডি। ঘরের ভিতরে ও বাইবে পলেস্তারা লাগানো হতো। অনেকে ঘবের দেয়ালে ছবি আঁকাতেন। আসবাবপত্রের মধ্যে খাট বা চৌকি, মাদুর, তোশক, চাদর, বালিশ প্রভৃতির ব্যবহার ছিল।

৭.৩ আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত : কুষাণ আমল

অর্থনীতি ও সমাজের নিরিখে এই পাঁচশো বছরে বেশ কিছু বদল লক্ষ কবা যায়।বিশ্য পর্বতের দক্ষিণে কৃষিকাজ ছড়িয়ে পড়েছিল এই সময়। উত্তব ভারতে আগেব মতো কৃষিই ছিল প্রধান জীবিকা। ধান, গম, যব, আখ, কার্পাস ছিল প্রধান ফসল দাক্ষিণাত্যের কালোমাটিতে তুলোর চাষ বেশি হতো। কেবালায় গোলমরিচের ফলন ছিল বিখ্যাত। কৃষিকাজে নানান রকমের উপকরণের



ব্যবহার এই সময় দেখা যায়। মাটি খুঁডে লোহার লাঙল, কোদাল, কুঠার, দা প্রভৃতি পাওয়া গেছে। এই সময়ে সমস্ত জমির উপব সম্রাটের মালিকানা ছিল না। বরং অনেক জমিরই মালিক ছিলেন নির্দিষ্ট কোনো বাক্তি।

प्रेकाता यथा

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের জলসেচ ব্যবস্থা

<mark>কৃষিকাজের উন্নতির জন্য প্রয়োজন ভালো সেচ ব্যবস্থা। প্রাচীন ভাবতীয় উপমহাদেশের শাসকবা সেদিকে</mark> নজব দিতেন। নদীব জল সেচেব মাধ্যমে ক্ষেতে পৌঁছে দিতে নানান উদ্যোগ নেওয়া হতো। জলসেচ <mark>প্রকল্পগুলিকে সেতৃ</mark> বলা হতো। এই সেতু ছিল দু ধরনেব। এক ধরনের সেতু প্রাকৃতিক জলেব উৎসকে ভিত্তি করে থাকত আবার কৃত্রিম উপায়ে অন্য এলাকা থেকে প্রয়োজনীয় জল আনিয়েও সেতু বানানো <mark>হতো। সেতৃর জল ব্যবহার করাব জন্য কৃষকদের জলকরও দিতে হতো। ধনী ব্যক্তিরাও নিজেদের উদ্যোগে</mark> জলসেচ প্রকল্প তৈবি কবতেন।

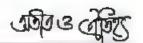
কুষাণ আমলে সেতৃর ক্ষতি কবলে শাস্তি দেওয়ার কথাও জানা যায়। কুপ বা জলাশয় বানিয়ে দেওয়া ভালো কাজ বলে ধরা হতো সেচকাজে একধবনের যন্ত্রের ব্যবহাব শুবু হয়। যন্ত্রটি চাকাব মতো, তার গায়ে ঘটি লাগানো থাকত। বড়ো কুপ বা জলাশয়ে যন্ত্রটি বসানো হতো। চাকাটি ঘুবিয়ে ঘটিগুলো দিয়ে <mark>কুপের জল বাইরে আনা হতো। ঐ যন্ত্র বানানো ও সাব্যনোর কারিগরও ছিল</mark>

<mark>গুপ্ত আমলে কৃষিকাজ বাডার সঙ্গের সেচব্যবস্থার উন্নতির যোগাযোগ দেখা যায় তাল্রলেখগুলিতে গ্রামে</mark> পুকুর বা তড়াগ খোঁড়ার কথা পাওয়া যায়। সেচের উন্নতিতে রাজা নজর দিতেন। পাশাপাশি ধনী ব্যক্তিবাও নিজেদের উদ্যোগে জলসেচের ব্যবস্থা করে দিতেন।

সুদর্শন হুদ

<mark>প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে রাজকীয় উদ্যোগে জলসেচ ব্যবস্থার একটা প্রধান উদাহরণ সুদর্শন হুদ।</mark> মৌর্য আমল থেকে গুপ্ত আমল পর্যন্ত ঐ হ্রদের ব্যবহার ছিল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনকালে কাথিয়াওয়াড <mark>অঞ্জলে ঐ হ্রদটি বানানো হয়েছিল। ওয়াড</mark> কথার মানে শহর। এটি একটি নদীভিত্তিক বড়ো মাপের সেচ প্রকল্প (সেতু) অশোকেব শাসনকালে সেচ প্রকল্পটিতে কয়েকটি সেচ খালও যোগ কবা হয়। <mark>শকশাসক</mark> বুদ্রদামন ঐ হ্রদটিব সংস্কার করেন (১৫০ খ্রিস্টাব্দ)। বাঁধটিকে আরো বড়ো ও শক্ত কবা হয় এই পুরো <mark>কাজেব বর্ণনা বুদ্রদামন জুনাগড়ে একটি শিলালেখতে খোদাই করিয়েছিলেন গুপ্ত সম্রাট স্কন্দগুপ্তেব শাসনেব</mark> প্রথম বছরেই আবার হুদটি মেরামতির দরকার হয় (১৩৬ গুপ্তাব্দ বা ৪৫৫/৪৫৬ খ্রিস্টাব্দ) খ্রিস্টপূর্ব <mark>চতুর্থ শতক থেকে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত সদর্শন হুদের টানা ব্যবহার হয়েছিল।</mark>

এই পাঁচশো বছরে উপমহাদেশের ভিতরে ও বাইরে বাণিজ্যেব বিকাশ দেখা যায়। বাণিজ্যের উন্নতিতে জলপথ ও স্থলপথগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বিদেশের বাজারে উপমহাদেশের মসলিন ও অন্যান্য কাপড়ের চাহিদা ছিল। তাছাড়া হিরে, বৈদুর্য, মুক্তো ও মশলাব কদর বিদেশের বাজারে ছিল। চিনের 🞾



রেশম ছিল আমদানি দ্রব্যের মধ্যে প্রধান কাচের তৈরি জিনিসপত্রও বিদেশ থেকে আমদানি করা হতো। এই আমলে কারিগরি শিল্প ও পেশার বৈচিত্র্য অনেক বেডেছিল। বারাণসী ও মথুরা দামি কাপড় তৈরির জন্য বিখ্যাত ছিল প্রাচীন বাংলার সূক্ষ্ম সুতির কাপড মসলিনেব কদর ছিল।

ু কুরারা কথা নতুন নতুন নগর

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে প্রধানত উত্তর ভারতে নগরায়ণ দেখা গিয়েছিল। অন্যদিকে এই আমলে প্রায় পুরো উপমহাদেশ জুডে নতুন নগর গড়ে ওঠে তক্ষশিলার সিরকাপ-এ প্রত্নতাত্ত্বিকরা মাটি খুঁডে একটি নগরের খোঁজ পেয়েছেন। তার থেকে দেখা যায় খ্রিস্টপূর্ব ২০০ থেকে ৩০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নগরগুলি বেশ উন্নত ছিল। কুষাণ আমলে গঙ্গা যমুনা দোয়াবে প্রাকাব ঘেবা মথুরা ছিল বিখ্যাত নগর। ঐ নগরে কাদামাটিব ইট ও পোডানো ইটেব ব্যবহার দেখা যায়। এই সময় মথুবা খুব গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও বাণিজাকেন্দ্র ছিল। মথুবার ভাস্কর্য ও অন্যান্য শিল্প ছিল বিখ্যাত।

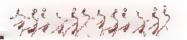
মৌর্য আমলে প্রাচীন বাংলাতে মহাস্থানগড় ও বাণগড়ে নগর ছিল বলে জানা যায়। অন্যদিকে এইসময় তাম্রলিপ্ত, চন্দ্রকৈতৃগড় প্রভৃতি নগবও গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন ওড়িশা এলাকাব শিশুপালগড়ে নগরের খোঁজ পাওয়া গেছে দাক্ষিণাতা ও দক্ষিণ ভারতেও এই সময় নতুন নতুন নগর গড়ে ওঠে কাবেরী নদীব বদ্বীপে কাবেরীপট্টিনম ছিল বিখ্যাত বন্দব-নগর।

এই আমলে বর্ণাশ্রম ও চতুবাশ্রম প্রথা ছিল কঠোব। পশ্চিম ও মধ্য এশিয়াব থেকে অনেক গোষ্ঠী এই সময় ভাবতীয় উপমহাদেশে এসেছিল। ধীবে ধীবে এদেব অনেকেই ভাবতীয় সমাজে মিশে যায়।

মৌর্য আমলের মতো এই সময়েও অবসব সময় কাটানোব নানান উপায় ছিল। নাচ, গান ও অভিনয়ের

প্রচলন ছিল বলে জানা যায়।
পাশাপাশি জাদুর খেলা ও
নানান রকম দড়ির
কসরত সাধারণ মানুষকে
আনন্দ দিত। পাশা খেলা,
শিকার, রথেব দৌড়, কুস্তি
প্রভৃতি ছিল ধনী মানুষদের
অবসর কাটানোর উপায়
বড়ো বড়ো উৎসবে সমস্ত
মানুষের মধ্যে বিনা
প্রসায় খাবার ও পানীয়
বিলি কবা হতো।





সমাজ জীবনের ভিত্তি ছিল পরিবার বাবা ছিলেন পরিবাবের প্রধান দক্ষিণ ভাবতে অবশ্য কিছু ক্ষেত্রে মায়ের নাম সন্তানের নামের সঙ্গে যুক্ত হতো। সাতবাহন শাসকদের অনেকের নামই তার প্রমাণ। কিন্তু, সমাজে নারীর অবস্থান ছিল পুরুষের নীচে। পবিবারে মেষের বদলে ছেলে জন্মালে আনন্দ বেশি হতো। শিক্ষার ক্ষেত্রেও মেয়েবা পিছিয়ে ছিল। অল্পবয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার কথা বলা হতো



সাতবাহন আমলের মৃদ্রা

प्रेकाखा यथा

সাতবাহন আমলে দক্ষিণ ভারতের গ্রাম-জীবন

খ্রিস্টীয় প্রথম অথবা দ্বিতীয় শতক নাগাদ সাতবাহন-বাজা হাল একটি বই সংকলন কবেন। প্রাকৃত ভাষায় লেখা ঐ বইটিব নাম গাথা সপ্তশতী (সাতশোটি গাথার সংকলন) এই বইতে সেই সময়ের দাক্ষিণাতোব গ্রাম জীবনের নানান দিক সম্পর্কে জানা যায়। বইয়ের সমস্ত চরিত্রই গ্রামের সাধারণ মানুষ।

গ্রামবাসীরা ছিল মূলত কৃষিজীবী। ধান, তেলের বীজ, কার্পাস ও শন ছিল প্রধান ফসল। গ্রামেব বাড়িগু<mark>লি</mark> খড দিয়ে ছাওয়া ও পাঁচিল দিয়ে ঘেরা থাকত। পুকুর, ফুলেব বাগান, ও বটগাছ সব গ্রামেই দেখা যেত।

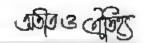
<mark>গ্রামে নানাবকম গৃহপালিত পশু-পাখি ছিল।</mark>

গ্রামে চওডা ও সর্— দু-রকম রাস্তাই ছিল বর্ষায়
রাস্তাগুলি কাদায় ভরে যেত। গ্রামের শাসন ছিল
গ্রামণীর হাতে। চুরি-ডাকাতি থেকে টাকা প্যসা
বাঁচাতে অনেকে সেগুলি মাটির নীচে পুঁতে
বাখত। বিভিন্নরকম বাজনা ও ছবি আঁকার চল
ছিল গ্রামগুলিতে উৎসবের সময় গ্রামের
লোকেরা নাচ, গান ও বাজনায় মেতে উঠত।
সূর্য, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাব পুজো হতো মন্দিরে
গ্রামে বৌশ্ধ ধর্মেরও প্রচলন ছিল।



৭.৪ আনুমানিক খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতক থেকে সপ্তম শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত: গুপ্ত ও গুপ্ত-পরবর্তী আমল

এই সময়কালেও কৃষিই ছিল প্রধান জীবিকা। ধান ছিল প্রধান ফসল আখ, তুলো, নীল, সবয়ে ও তৈলবীজেব চাষ হতো। দক্ষিণ ভাবতে সুপুবি, নারকেল ও নানাবকম মশলা চাষেব কথা জানা যায়। সেসময় বিভিন্ন লেখায় জমির নানারকম ভাগ পাওয়া যায়। আবাদি জমিকে বাস্তুজমি ও অরণ্য থেকে আলাদা করে চিহ্নিত কবা হতো। এইসময় প্রাচীন বাংলায় জমির মাপ ও আয়তনের বিভিন্ন হিসেবের কথা জানা যায়।



টুকাস্ত্রো বাখা

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে কারিগর

প্রাচীন ভারতীয় উ পমহাদেশে নানা বকম কাবিগবি শিল্পেব প্রমাণ পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক পর্যন্ত বিভিন্ন কারিগরি শিল্পের বিকাশ হয়েছিল কারিগররা অনেক একেকটা অঞ্জে জমায়েত হয়ে বাস করতেন ক্ষাণ আমলে কারিগরি শিল্পের বৈচিত্র্য বেডেছিল কুমোর, কামার, ছুতোর ও তাঁতির কথা জানা যায় পাশাপাশি অন্যান্য কারিগরও ছিল যেমন, সোনার গয়না বানাত স্বৰ্ণকার হাতির দাঁতে র জিনিসপত্র বানাত দন্তকার তাঁতিরা কাপড় বুনতো। কাপড রং করত রঙগকার পোশাকে সৃচিশিল্পেব কাজ কবত সূচিকার

গুপ্ত আমলে বাংলায় পাওয়া তাম্রলেখগুলিতে জমি কেনাবেচাব কথা জানা যায়। বহু ক্ষেত্রে একটি জমি প্রথমে কেনা হতো। তারপরে ঐ জমি ব্রাপ্ত্বণ বা বৌল্ববিহারকে দান করা হতো। ঐ দান করা জমিগুলি সাধাবণত করের আওতায় পড়ত না। গুপ্ত ও গুপ্ত-পরবর্তী আমলে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে এই জমিদানকে অগ্রহার ব্যবস্থা বলা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে জমিতে ব্যক্তি মালিকানা আরো বেড়েছিল। দান পাওয়া জমিতে কৃষিশ্রমিক নিয়োগ কবা হতো। ঐ জমির উৎপাদন থেকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের থবচা চালাতেন ব্রাপ্ত্বণ ও বৌল্ধরা। অনেক অনাবাদি জমিকে দান হিসেবে দেওয়া হতো। সেই জমিগুলিতে কৃষিশ্রমিক নিয়োগ করা হতো। তার ফলে সেগুলি আবাদি জমি হয়ে উঠত। অর্থাৎ অগ্রহার ব্যবস্থার ফলে কৃষিকাজ বেড়েছিল।

এই সময়ে লোহাব জিনিস তৈবিব শিল্প খুব উন্নত ছিল। দিল্লিব কুতুব মিনাবের পাশে একটা লোহাব স্তম্ভ আছে। সেটা খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে তৈবি। অথচ আজও সেটাতে মবচে পড়েনি। তাছাড়া এই আমলে লেখক বা কবণিক ও চিকিৎসক পেশার কথা জানা যায়।

গুপ্ত আমলে দূরপাল্লাব বৈদেশিক বাণিজ্যে খানিক ঘাটতি দেখা যায়। এব একটা কাবণ ছিল হুণ আক্রমণ (এই বিষয়ে নবম অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে)। এব ফলে বোমের সঞ্চো ভারতেব বাণিজ্যে ভাটা পড়ে। তবে এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অংশের সঞ্চো উপমহাদেশেব বাণিজ্য জারি ছিল। পূর্ব উপকৃলেব তাম্রলিপ্ত বন্দরেব খ্যাতি এই সময়ে আবো বাড়ে। তামিলনাড়ুর কাবেবীপট্টিনম বন্দবেও নিয়মিত দূরপাল্লাব বাণিজ্য হতো।

টুকান্ত্রে কথা কারিগর ও ব্যবসায়ীদের সংঘ

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকেই ব্যবসাবাণিজ্য অনেক বেড়ে গিয়েছিল। পাশাপাশি তৈরি হয়েছিল ব্যবসায়ী ও কারিগবদেব সংঘ সংঘগুলি কারিগরি ও ব্যবসা সংক্রান্ত বিবাদ মেটাত। তাছাডা পেশাগত নিরাপত্তাব দিকেও খেয়াল বাখত সংঘগুলি। জিনিসের গুণমান ও দাম ঠিক রাখাও সংঘের কাজের আওতায় পডত। সংঘগুলি শ্রেণি, গণ ইত্যাদি নামেও পরিচিত ছিল

কুষাণ যুগে এক একটি পেশাকে কেন্দ্র করে আলাদা গ্রাম গড়ে উঠেছিল। শ্রেণি বা সংঘগুলি নিজস্ব আইন মোতাবেক চলত। তবে গুরুতর গোলমাল দেখা দিলে রাজা বা সম্রাটরা ব্যবস্থা নিতেন। শ্রেণি বা সংঘগুলি নিয়মিতভাবে নগদ অর্থেব লেনদেন করত সমাজের বিভিন্ন মানুষ সেখানে আমানত অর্থ জমা বাখত। নগদ অর্থ ছাডাও জমি, গাছ ইত্যাদি স্থায়ী আমানত হিসেবে বাখা হতো সেই জমা আমানতেব উপব সৃদও দেওয়া হতো। ঐ আমানত অর্থ বিভিন্ন শিল্পে মূলধন হিসেবে দেওয়া হতো। এইভাবে শ্রেণি বা সংঘগুলি এক ধরনের ব্যাংকেব মতোই কাজ কবত নর্মদা নদীর উত্তরের হিবেব খনি নিয়ে কুষাণ, সাতবাহন এবং শক ক্ষত্রপদের মধ্যে লড়াই চলেছিল।

গৃপ্ত ও তাব পববতী আমলে সংঘগুলির অর্থনৈতিক গুরুত্ব আরও বেডেছিল। শ্রেণিব কাজকর্মের তদাবকিব জন্য বেশকিছু কর্মচাবী বহাল কবাব তথ্য পাওয়া যায় নগরের নানা শাসনকাজেও ধনী বণিকদের ভূমিকা বাডতে থাকে, এই আমলে বণিকরাও কারিগরদের মতো সংঘ বানাতে শুরু করেন। বণিকদের নিজস্ব সংগঠনকৈ বণিকগ্রাম বলা হতো।

গুপ্ত আমলে অনেক সোনাব ও বুপোব মুদ্রা পাওয়া গেছে। গুপ্ত রাজাদের
চালু করা সোনার মুদ্রাকে দীনাব ও সুবর্গ বলা হতো। সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের
শাসনকালে রুপোর মুদ্রা প্রথম চালু কবা হয়। তার নাম ছিল রুপক। সোনার ও
রুপোর মুদ্রা ব্যবসা–বাণিজ্যের কাজে বেশি ব্যবহার হতো রোজকার কাজেকর্মে
ব্যবহাবের জন্য তামার মুদ্রাও চালু কবেন গুপ্ত শাসকরা তবে গুপ্তদেব সময়েই
দক্ষিণেব বাকাটক শাসকরা কোনো মুদ্রা চালু কবেননি। ফলে ভাবতীয়
উপমহাদেশেব সব জায়গায় মুদ্রাব লেনদেন সমান ছিল না। তাছাড়া সমাজে
কৃষিকাজ বাড়ায় ব্যবসা–বাণিজ্যের হাব কমেছিল। এই সবের ফলে নগবগুলিও
আগেব থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে।

সমাজে বর্ণাশ্রম চালু ছিল। তবে সবাই কঠোবভাবে সেসব মানত না।
কিন্তু নীচুতলাব মানুষদের প্রতি ব্রায়ণদেব মনোভাব বিশেষ বদলায়নি। একই
অপবাধেব জন্য ব্রায়ণ ও শৃদ্রেব আলাদা শান্তি হতো ধাব কবলে শৃদ্রকে অনেক
চড়া হাবে সুদ দিতে হতো তবে এই আমলে শৃদ্ররা কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য
কবতে পাবত। অবশ্য সবথেকে খাবাপ অবস্থা ছিল চণ্ডালদেব। তাবা গ্রাম বা
নগরেব মধ্যে থাকতেও পাবত না। এমনকি ব্রায়ণবা তাদেব ছোঁয়াছুয়ি এডিয়ে
চলত

এই আমলেও পরিবারের প্রধান ছিলেন বাবা। মেয়েদেব কম বয়সে বিয়ে দেওয়াব বীতি চালু ছিল এই সময়ে অবশ্য মেয়েরা বিয়ের সময় কিছু সম্পদ পেতেন। ঐ সম্পদের উপবে কেবল ঐ মেয়েরই অধিকার ছিল। একে স্ত্রীধন বলা হতো মেয়েরা নিজের ইচ্ছামতো ঐ সম্পদের ব্যবহার করতেন। তবে স্ত্রীধন প্রথা সমস্ত বর্ণের মধ্যে চালু ছিল না।



রয়েছে। সেটি কোনটি?

प्रेवाखा वथ्या

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের খাবার-দাবার

প্রাচীন ভাবতীয় উপ মহাদেশে চাল, গম, যব ও শাকসবজি ছিল প্রধান খাবাব ধনীদেব মধ্যে মাংস খাওয়ার প্রচলন বেশি ছিল মধ্যবিত্ত সমাজে দৃধ ও দুধেব তৈবি নানান বকম খাবারের ব্যবহাব ছিল গবিৰ মানুষেবা ঘিয়েব বদলে তেল ব্যবহার করত। তাছাডা মটব. তিল, মধু, গুড, নুন প্রভৃতি খাবারেব উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে নিবামিষ খাওয়া দাওয়াকে বেশি গুবুত্ব দেওয়া হতো এমনকি সববকম মাছ খাওযাব উপরেও বিধিনিষেধ •ছিল। দৃধ ও নানান বকম ফলেব বস থেকে তৈবি পানীয়েব ব্যবহাব ছিল

प्रेयात्वा यथा

ফাসিয়ান-এর লেখায় ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ

গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে ফাসিয়ান চিন থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে এসেছিলেন। তাঁর লেখায় উপমহাদেশের মানুষ ও সমাজ বিষয়ে নানান কথা পাওয়া যায়। তবে তাঁর লেখায় কোথাও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কথা বলেননি তিনি। ফাসিয়ান লিখেছেন, উপমহাদেশে অনেকগুলি নগব ছিল মধ্য দেশের নগবগুলি ছিল উন্নত। সেখানে জনগণ সুখে বাস কবত তবে চণ্ডালবা নগবের বাইবে থাকত বলে তিনি জানিয়েছেন। যারা দুষ্ট প্রকৃতির লোক তাদেরকেই চণ্ডাল বলা হতো। এদেশের লোকেরা অতিথিদের যত্ন কবত। বিদেশিদের যাতে কোনো কষ্ট না হয তাব দিকেও তাবা খেয়াল রাখত। পাটলিপুত্র ছিল দেশের সেবা নগর। সেখানকাব লোকেবা ছিল সুখী ও সম্পদশালী। ধনী বৈশারা নগরের বিভিন্ন স্থানে দাতব্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিতেন বিনামূল্যে সেখান থেকে ওয়ুধ দেওয়া হতো গরিবদেব খাওয়ার ও থাকাব ব্যবস্থা সেখানে ছিল।

সুয়ান জাং-এর লেখায় ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ

সুযান জাং-এর লেখায় ভারতবর্ষ ইন-তু নামে পরিচিত হয়েছে তাঁর মতে ইন তু ব লোকেরা নিজেদেব দেশকে বিভিন্ন নামে ডাকে। দেশটিব পাঁচটি ভাগ উত্তব, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্য। ইন তু তে আশিটি বাজ্য আছে। প্রতিটি বাজ্যে নিজস্ব বাজা থাকলেও তাবা বড়ো সম্রাটেব অনুগত ছিল।

সুষান জাং ইন তুকে মূলত গরমের দেশ বলেছেন। সেখানে নিয়মিত বৃষ্টি হয়।
উত্তব ও পূর্ব অঞ্চলের মাটি খুবই উর্বর। দক্ষিণ অঞ্চল বনে ঢাকা। পশ্চিম
অঞ্চলের মাটি পাথুরে ও অনুর্বর। ধান ও গম প্রধান কৃষিজ ফসল জনগণেব
মধ্যে জাতিভেদ ছিল।

শহরেব বাড়িগুলি ইট ও টালি দিয়ে তৈবি হতো। বাড়িব বাবান্দা তৈরি কবা হতো কাঠ দিয়ে। গ্রামের বাড়িগুলিব দেয়াল ও মেঝে ছিল মাটির। নানান রকম দামি ধাতু ও পাথরের ব্যাবসা চলত শাসকবা জনগণের সুযোগ সুবিধের কথা মাথায় রাখতেন।

999

ভেবে দেখো

তোমবা সে আমলের খাবারেব একটা তালিকা তৈবি কবো। পাশাপাশি তোমবা এখন যেসব খাবার খাও তারও একটা তালিকা বানাও। সেই তালিকা দৃটির তুলনা করো।

ভেবে দেখো



১৷ নীচের বিবৃতিগুলির সঞ্গে কোন ব্যাখ্যাটি সবথেকে বেশি মানানসই বেছে বের করো:

১ ১) বিবৃতি মৌর্য-পরবতীযুগে অনেকগুলি গিল্ড গডে উঠেছিল

ব্যাখ্যা ১ রাজারা ব্যবসাবাণিজ্য বাডানোব জন্য গিল্ড গড়ে তুলেছিলেন

ব্যাখ্যা : ২- কারিগর ও ব্যবসায়ীবা গিল্ড গড়ে তুলেছিলেন।

ব্যাখ্যা ৩- সাধারণ মানুষ টাকা লেনদেন ও গচ্ছিত রাখার জন্য গিল্ড গড়ে তুলেছিলেন.

১.২) বিবৃতি: দাক্ষিণাত্যে ভালো তুলোর চাষ হতো

ব্যাখ্যা · ১- দাক্ষিণাতোর কালো মাটি তুলো চাষের পক্ষে ভালো ছিল

ব্যাখ্যা : ২ দাক্ষিণাত্যের সমস্ত কৃষক শুধু তুলোর চাষ কবতেন।

ব্যাখ্যা : ৩- দক্ষিণাত্যের মাটিতে অন্য কোনো ফসল হতো না

মঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

- ২ ১) জনপদ হলো (কৃষিভিত্তিক/শিল্পভিত্তিক/শ্রমিকভিত্তিক) গ্রামীণ এলাকা।
- ২.২) মৌর্য আমলে অর্থনীতি মূলত —— (শিল্পের/কৃষির/ব্যবসাবাণিজোর) উপরে নির্ভর করত।
- ২.৩) গুপ্ত ও গুপ্ত পববর্তী আমলে ধর্মীয় উদ্দেশ্যে জমিদানকে বলা হয় সোমন্ত/বেগাব, অগ্রহার) ব্যবস্থা

৩। নিজের ভাষায় ভেবে লেখো (তিন/চার লাইন):

- ৩.১)প্রথম নগরায়ণ (হরপ্পা) এবং দ্বিতীয় নগবায়ণ (মহাজনপদ) এর মধ্যে কোন ধরনেব পার্থক্য তোমাব চোখে পড়ে ?
- ৩ ২) প্রাচীন ভাবতে জলসেচ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল কেন? সেযুগেব জলসেচ ব্যবস্থাব সঞ্চো আজকের দিনের জলসেচ ব্যবস্থার কোন পার্থক্য তোমার চোখে পড়ে কি?
- ৩ ৩) খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্যস্ত সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর ও দক্ষিণ অংশে কৃষিব পশ্বতি ও উৎপাদিত ফসলের মধ্যে কী কী তফাৎ দেখা যায়?

৪। হাতেকলমে করে।:

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত সময়ে কোন কোন পেশাব মানুষদের কথা তুমি জানতে পাবলে, তাব তালিকা তৈরি করো তার মধ্যে কোন কোন পেশা আজও দেখা যায়? বৈদিক সমাজে চালু জীবিকাগুলির সঙ্গে এইসময়ের পেশাগুলির কী কী মিল-অমিল দেখা যায়?



প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কৃতিচর্চার নানাদিক

শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্প

ব বললেন, তোমরাতো সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিষয়ে অনেক কিছু জেনেছ দেখেছো যে, শুধু খেয়ে পবে বেঁচে থাকাতেই মানুষ খুশি ছিল না। নানা কিছু তৈবি কবে চারপাশকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে তোলাব চেম্বা করল তাবা গুছিয়ে ভালো ভাষায় নিজেব ও অন্যেব কথা লিখল। এভাবেই শিল্প, সাহিত্যেব শুরু হলো। তার পাশাপাশি চাবপাশেব নানা কিছু নিয়ে প্রশ্ন তৈবি হলো তাদেব মনে সেইসব

প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে শুরু হলো বিজ্ঞানচর্চাব। প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশেও সেভাবেই শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পেব চর্চা শুরু হলো। এখানে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পেব চর্চা নিয়ে আলোচনা কবা যাক

৮.১ প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের শিক্ষাচর্চা

পৃথার মনে প্রায়ই একটা প্রশ্ন আসে। আজ ক্লাসে ও সেটা স্যারের কাছে জানতে ঢাইল। পড়াশোনা আর লেখাপড়া কি একই স্যাব ? স্যার বললেন, একটু আলাদা। আব্বাস বলল, কীবকম আলাদা? স্যার বললেন, পড়াশোনার মধ্যে পড়া আর শোনার কথা আছে।



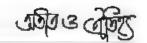
কিন্তু লেখার কথা নেই অন্যদিকে লেখাপড়ার মধ্যে লেখা আর পড়াব কথা আছে। আজকাল তোমবা পড়া, শোনা ও লেখা তিনটেই করতে পাবো। কিন্তু ধবো, যখন লেখাব চল ছিল না, তখনতো শুনে শুনেই মনে বাখতে হতো হবগ্গায লিপি ছিল, কিন্তু সাহিত্য ছিল কিনা জানা যায় না, অবুণ বলল, জানি স্যাব, হবগ্গার লিপি আমরা এখনো পড়ে উঠতে পাবিনি সেলিম বলল, স্যাব অনেকদিন আগে পড়াশোনা ও লেখাপড়া তাহলে কেমনভাবে হতো?

পববর্তী বৈদিক যুগের পড়াশোনার প্রথা খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক নাগাদও প্রচলিত ছিল।
তবে তাব পাশাপাশি বৌদ্ধবিহারগুলিতে এক নতুন ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি শুরু হয়েছিল। এই সময় বিভিন্ন ধরনের লিপির ব্যবহার শুরু হয় ফলে মৌখিক শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন লিপিগুলিও ছাত্রদের শিখতে হতো। বৈদিক শিক্ষা ছিল ব্যক্তিগত। অর্থাৎ গুরু শিষ্য সম্পর্ক-কেন্দ্রিক। তাকে গুবুকুল ব্যবস্থা বলা হতো। অন্যদিকে বৌদ্ধরা লেখাপড়া শিখত বিহার বা সংঘে। ছাত্রদের সেখানে থেকে পড়তে হতো। নতুন কতগুলি বিষয় এই সময় পড়াশোনার সঙ্গো যুক্ত হয়। কৃষি, চিকিৎসা, বাজ্য শাসন প্রভৃতি বিষয়ও পড়তে হতো। এই সময় আশ্রম নামে শিক্ষাকেন্দ্রের বিকাশ ঘটে। সেখানে বিভিন্ন বিষয় পড়ানো হতো

বৌন্ধবিহাবগুলিতে ধর্মীয় বিষয়গুলি ছাডাও অন্যান্য বিষয়েও পডাশোনা হতো। সেখানে তির ও তববাবি চালানো, কুস্তি ও নানাধরনের খেলাধুলো শেখানো হতো। শ্রমণ ও ভিক্ষুদেব সুতোকাটা, কাপড় বোনা শিখতে হতো। বিহাবগুলিতে ছাত্রদের থাকাব জন্যে আলাদা ঘর থাকত। ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে মেধা যাচাই কবেই নেওয়া হতো। পডাশোনার জন্য বেতন দিতে হতো। গরিব ছাত্রদের সুবিধার জন্য বৃত্তি দেওয়া হতো।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক নাগাদ বিভিন্ন বিষয়েব পড়াশোনাব কথা জানা যায় বেদের পাশাপাশি ছন্দ, কাব্য, ব্যাকবণ পড়ানো হতো। তাব সঙ্গো জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষ, গণিত, বসায়ন প্রভৃতিও পড়তে হতো। তবে মূলত ব্রায়ণবাই ঐ বিষয়গুলি চর্চা করতেন। ক্ষব্রিয়দেব ব্যাজকার শাসন চালানোব জন্য কিছু বিষয় পড়তে হতো যেমন, যুদ্ধ ও শিকার, মুদ্রা ও নথিপত্র পবীক্ষা। বৈশ্য ও শূদ্রদেব ব্যবসাবাণিজ্য, কৃষি ও পশুপালন বিষয়ে পড়াশোনা করতে হতো। এব থেকে বোঝা যায় জীবিকাব সঙ্গো পড়াশোনাব একটা যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল। এই সময় থেকেই কাবিগবি বিষয়ে পড়াশোনার কথা বেশি করে জানা যায়। কাবিগবি শিক্ষাব ক্ষেত্রেও গুবুব ভূমিকাই ছিল প্রধান। অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে ছাত্ররা কোনো দক্ষ কাবিগরেব কাছে যেতেন। কাবিগব-গুবুব বাড়িতেই ছাত্রবা থাকত। তাঁর কর্মশালাতেই কাজ শিখত। কাজ শেখার শেষে অনেকেই গুবুব কর্মশালাতেই কাজ করত। কেউ কেউ গুবুব অনুমতি নিয়ে নিজের আলাদা কর্মশালা তৈবি কবত

গুপ্তযুগেব শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা লক্ষ কবা যায়। তবে গুবুব বাডিতে থেকে পড়াশোনা কবাব পুবোনো পন্ধতিবও চল ছিল। এই সময় বিভিন্ন বাজাবা বিদ্যালয় তৈবি কবেছিলেন। পাঠ্য বিষয়েব মধ্যে লিপি ও ভাষা এবং বৈদিক সাহিত্য ছিল প্রধান। পাশাপাশি কাব্য, ব্যাকবণ, জ্যোতিষ,



्रेकासा कथा

প্রাচীন ভারতের শিক্ষক

আচার্য ও উপাধ্যায়

ছিলেন প্রাচীন ভারতের বৈদিক শিক্ষার সঞ্জো যুক্ত দৃ-ধরনের শিক্ষক আচার্যের বাডিতেই ছাত্ৰবা থাকত ও খেত আচার্যবা বিনা বেতনে ছাত্রদেব পড়াতেন। এব বিনিময়ে ছাত্র আচার্যকে নানা কাজে সহায়তা েকরত। নারীবাও আচার্য হতে পাৰতেন তাঁদেব বলা হতো আচাৰ্যা উপাধায়রা এক একটি নিৰ্দিষ্ট বিষয় পড়াতেন পড়ানোর বিনিময়ে তাঁরা বেতন নিতেন। নারী উপাধ্যায়কে বলা হতো উপাধায়ে। বৌশ্ধ শিক্ষায় উপাধ্যায়দের গৰত ছিল বেশি তাঁৰা বৌষ্ধ বিহারগুলিতে থেকেই পড়াতেন বৌন্ধ ছাত্রদেব বৃন্ধ, ধন্ম ও সংঘের নিয়ম মেনে চলার শপথ করতে হতো।

নাটক, আইন, রাজনীতি ও যুল্ধবিদ্যাও পড়ানো হতো। পেশাভিত্তিক শিক্ষার ওপবেও এ সময়ে জোব দেওয়া হয়।

কিছু কিছু বৌশ্ববিহারকে মহাবিহার বলা হতো। দেশেব ও দেশের বাইবের বিভিন্ন ছাত্র ঐ মহাবিহারগুলিতে পড়তে আসত। নালনা, ৩ক্ষশিলা, বিক্রমশীল ও বলভী মহাবিহাবগুলি খুবই বিখ্যাত ছিল। রাজাবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে জমি ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন। ক্ষেকটি বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র ছিল পাটলিপুত্র, কনৌজ, উজ্জ্বিনী, মিথিলা, তাঞ্জোর, কল্যাণ প্রভৃতি নগরে।

নালন্দা মহাবিহাবে যে-কোনো ধর্ম ও বর্ণেব ছাত্রবা পড়তে পারত। তবে তাদেব কঠিন পবীক্ষায় পাশ করে সেখানে ভর্তি হতে হতো সেখানে থাকা, খাওয়া ও পড়াব জন্য কোনো খরচ লাগত না। লেখাপড়া শেষ হবাব পর নালন্দাতে রীতিমতো পরীক্ষা দিতে হতো। চিন, তিব্বত, কোরিয়া, সুমাত্রা, জাভা থেকে ছাত্ররা নালন্দায় পড়তে আসত। নালন্দাতে সেই সময়ের অনেক বিখ্যাত পশ্তিত পড়াতেন।

ুফান্ত্রে কথা তক্ষশিলা মহাবিহার

গব্দাব মহাজনপদেব বাজধানী ছিল তক্ষশিলা গ্রিক, পাবসিক, কুষাণ, শক নানা বিদেশি শক্তি নানা সময়ে তক্ষশিলা দখল কবে।ফলে সেখানে নানা দেশেব মানুষ ও পণ্ডিত লোকের আনাগোনা ছিল। বৌশ্বধর্ম তক্ষশিলায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল খীবে ধীবে শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে তক্ষশিলা বিখ্যাত হয়ে ওঠে।

দেশেব বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ছাত্রবা তক্ষশিলায় যেত উচ্চশিক্ষার জন্য। ষোলো থেকে কুডি বছর বয়সের ছাত্ররা সেখানে ভর্তি হতে পাবত ধর্ম বা বর্ণ নয় ববং যোগ্যতা যাচাই করেই ছাত্রদের নেওযা হতো। মোটামুটি আটবছর তাবা সেখানে লেখাপড়া করত বাজা ও ব্যবসায়ীরা এই মহাবিহার চালানোর জন্য টাকাপয়সা বা জমি দান করতেন

এখানে পরীক্ষার পশ্বতি ছিল বেশ সহজ। মনে হয় লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল না তবে লেখাপড়ার মান ছিল বেশ ভালো। এই মহাবিহারের ক্যেকজন বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন জীবক, পাণিনি এবং চাণক্য।

গুপ্তযুগেব পরবর্তীকালে অনেকটা আজকেব দিনেব হাতেখডিব মতো একটি অনুষ্ঠান শুবু হয়েছিল । তার নাম বিদ্যারস্ত (বিদ্যা + আবস্ত) পাঁচ বছব বয়সে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই অক্ষর পরিচয় হতো। এই পর্যায়ে ছাত্রকে একটি পাঠ্য বই ও গণিত পড়ানো হতো।



৮.২ প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের সাহিত্য চর্চা

ভাষার ব্যবহার হয় কথা বলতে গিয়ে। আবার লিখতে গিয়েও ভাষা লাগে। তবে মুখের ভাষা আর লেখাব ভাষায় অনেক তফাত থাকে। মুখেব ভাষায় থাকে আঞ্বলিক টান। কিছু লিখতে গিয়ে সেসব ব্যবহাব করা হয় না। তখন সবাই যাতে পড়ে বুঝাতে পাবে তেমন ভাষাতেই লেখা হয়। প্রাচীন ভাবতেও মুখের ভাষা ও লেখাব ভাষা আলাদা ছিল। ঋকবেদেব ভাষা ছন্দস্ বা ছান্দস্ ছিল বলে মনে কবা হয়। সেই ভাষাতেই সবাই কথা বলত। কিন্তু ধীবে ধীরে ভাষায় নানা অঞ্বলের টান মিশে যেতে শুরু কবে তাতে নানা অঞ্বলের ভাষা তৈরি হতে থাকে। তাই ভাষা ও তার ব্যবহাবকে নিয়মে বাঁধা দরকার সেই নিয়ম থেকেই তৈরি হয় ব্যাকবণ। পাণিনি নামের এক পশুত তেমনই একটা ব্যাকরণ লিখলেন। তার নাম অস্তাধ্যায়ী। সেখানে পাণিনি ভাষার নানান নিয়ম তৈরি করলেন। তার ফলে ভাষার সংস্কার হলো সংস্কার হয়ে যে ভাষাটা তৈরি হলো তারই নাম সংস্কৃত।

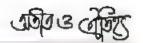
বিভিন্ন অঞ্চলে একই ভাষা নানাভাবে উচ্চারণ হতে শুরু হয়। সেই ভাষাগুলোকে প্রাকৃত বলা হতো।প্রকৃত বা আসল থেকে প্রাকৃত কথাটা এসেছে। ফলে পাণিনির সংস্কার কবা ভাষা থেকে প্রাকৃত ভাষা আলাদা। অন্যদিকে ছন্দস্ থেকে ভেঙে ভেঙে তৈরি হলো পালি ভাষা।প্রাকৃত ও পালি ভাষাগুলি সাধাবণ মানুষেব মুখেব ভাষা হলো। তবে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে পালি ও প্রাকৃত ভাষায় লেখালেখি শুবু হয়। জৈন (প্রাকৃত) ও বৌল্খ (পালি) ধর্মেব সাহিত্য লেখা হলো ঐ ভাষাগুলিতেই

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে ব্যবসাবাণিজ্য বাডতে থাকে। ফলে সমাজে বৈশ্যদের মর্যাদা বেড়ে যায় নতুন তৈরি হওয়া নগরগুলোয়জাতি ও বর্ণের কডাকড়ি কমতে থাকে। তাই পুরোনো জাতি ও বর্ণ ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করে সংস্কৃত ভাষায় ধর্মশাস্ত্র লেখাব চল শুবু হয়। ব্রায়ণরাই যে শ্রেষ্ঠ, সে কথাটাই ধর্মশাস্ত্রগুলিতে নানাভাবে মনে কবিয়ে দেওয়া হতো এব পাশাপাশি স্মৃতিশাস্ত্র বলে এক ধরনের লেখালেখি শুরু হয় সেগুলিতে সম্পত্তিব অধিকার ও বোজকার জীবনেব নানান দিক নিয়ে আলোচনা করা হতো ধর্মশাস্ত্রগুলিতে বাজনীতি নিয়েও কিছু কথা থাকত। তবে ধর্ম ও স্মৃতিশাস্ত্রগুলি লেখাব কাজ পববর্তী সময়েও চলেছিল তাছাড়া রাজনীতি বিষয়ে বই লেখাব প্রচলন এই সময় হয়েছিল সেগুলিব মধ্যে বিখ্যাত হলো কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র।

प्रेवाखा वाथा

মোগলমারি বৌদ্ধবিহার

ফাসিয়ান ও স্যান জাং এব লেখা থেকে জানা যায় বাংলায় অনেকগুলো বৌদ্ধ-বিহাব ছিল । তার মধ্যে একটি ছিল পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতন শহরের কাছে মোগল-মারিতে।প্রত্নতাত্ত্বিক ড অশোক দত্ত ঐ বৌন্ধ বিহারটি আবিষ্কার করেন। এই বৌদ্ধ-বিহারটি নালনা বিশ্ব বিদ্যালয়েব সম্যেবই পশ্চিমবজ্গে আবিষ্কৃত বৌশ্ব-প্রতুস্থলের মধে। এখনও এটি সবথেকে বড়ো তবে এই বৌন্ধবিহাবটিব নাম কী ছিল তা এখনো জানা যায়নি অনেকে মনে কবেন, সূবর্ণরেখা নদী এই বিহাবটির খুব কাছ দিয়ে বয়ে যেত। মগধ থেকে তাম্রলিপ্ত বন্দব যাওয়ার পথের মধ্যেই বিহাবটির অবস্থান তাই এই বিহারটিতে বণিকদের ভূমিকা বেশ গুরুত্পূর্ণ ছিল মনে হয



्रेवासा वथा

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের লিপি

ভাষা যখন লিখতে হয তখন লাগে বৰ্ণ বা লিপি প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে দ্-বক্ষেব লিপির চল ছিল খরোষ্ঠী ও ব্রান্থী।খরোষ্ঠী লিপি ডান দিক থেকে বাঁদিকে লেখা হতো ব্ৰায়ী লেখা হতো বাঁদিক থেকে ডান দিকে উত্তব ভারতে ব্রাগ্রী লিপি (थरकई शीरत शीरत দেবনাগরী লিপি তৈরি হয় ধর্মীয় কাজে বা দেবতাব কাজে নগবেব ব্রায়ণরা ঐ লিপির বাবহাব করতেন। তাই তাব নাম দেবনাগরী ব্রান্থী লিপির ব্যবহার খুব বেশি ছিল। সম্রাট অশোকের শিলালেখ গ্লিতে বেশিরভাগ ব্রাস্থী লিপি ব্যবহার করা হয়েছে. খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের আগেই ব্রাথী লিপিব ব্যবহার শুরু হয় ধীরে ধীরে এই লিপির নানা বদল ঘটেছিল

ব্যবসাবাণিজ্য বাড়াব ফলে বিভিন্ন অঞ্চলেব মধ্যে যোগাযোগ তৈরি হচ্ছিল।
নদী ও সমুদ্র পাবাপারের সময় গ্রহ-নক্ষত্র বিষয়ে জানাবোঝার দবকার হতো।
ফলে এই সময় গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে ও গ্রহ-নক্ষত্র বিষয়ের লেখালেথি
দেখা যায়।

ুফুরো কথা রামায়ণ ও মহাভারত

বামকে নিয়ে লেখা হয়েছে যে প্রাচীন মহাকাব্য তাই রামায়ণ রামায়ণের কবি হিসাবে বাল্মীকির নাম পাওয়া যায়। রামায়ণে মোট চবিবশ হাজাব প্লোক বয়েছে। পুবো মহাকাব্যটি সাতটি কান্ডে (ভাগ) ভাগ কবা। এব মধ্যে প্রথম ও সপ্তম কান্ডটি সম্ভবত বাল্মীকির লেখা নয়। সে দুটি পরে বামায়ণে যোগ করা হয়েছিল বামায়ণের প্রধান চবিত্র রাম, সীতা ও রাবণ। রাম রাবণের যুদ্ধকে ঘিবেই রামায়ণের মূল গল্প। অবশ্য পরবতী সময়ে রামায়ণের নানারকম অনুবাদ হয়েছিল। সেগুলোতে গল্পের মধ্যে বেশ কিছু বদলও দেখা যায়। ঠিক কবে মূল বামায়ণ রচনা হয় তা বলা মুশকিল। তবে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় দিতীয় শতকেব আগেই রামায়ণ রচনা হয় বলে মনে হয়। কাবণ খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক নাগাদ পালি সাহিত্যে বামায়ণের গল্প দেখা যায়।

মহাভারত মহাকাব্য আসলে ভরত গোষ্ঠীব জীবন ও কাজকর্মের গল্প। মহাভাবতে আদিতে আট হাজাব আটশো শ্লোক ছিল। বলা হয় কৃষ্ণুদ্বৈপায়ন ব্যাস কুবুপাশুবেৰ যুদ্ধের কথা নিয়েই মহাভারত রচনা করেন। ঐ যুদ্ধে পাশুবদের জয় হয়েছিল। মহাভারতের আদিনাম ছিল জয়কাব্য বৈশম্পায়ন তাতে আরো শ্লোক যোগ করে তার নাম দেন ভারত সৌতি পবে আবো শ্লোক জুড়ে মহাভারত নাম বাখেন অর্থাৎ মহাভাবত কোনো একজনেব রচনা নয়।

ষ্ট্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের আগে মহাভাবতেব কথা বিশেষ জানা যায না।

ষ্ট্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকেব মধ্যে মহাভাবত সংকলন

হয়েছিল। মহাভাবতের চর্চা কবলে বেদ্যর্চাব মতোই সুফল হবে বলা হতো।

তাই মহাভাবতকে পঞ্জমবেদ বলা হয়েছে

মহাভাবতের মূল বিষয় কৌরব ও পাশুবদের যুন্ধ তার পাশাপাশি ভূগোল, বিজ্ঞান, বাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ বিষয়েও অনেক আলোচনা রয়েছে পুরো মহাভাবত আঠাবোটি সর্গ বা ভাগে ভাগ করা খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতক নাগাদ মহাকাব্য দটি আজকের চেহারা পায়।

প্রাচীন ভারতীয়ত্ত পমহাদেশের অংস্কৃতিচর্চার নানা দিক

有的方式的

সংস্কৃত ব্যাকবণেব পাশাপাশি বিভিন্ন অভিধান লেখাব কথা জানা যায় নাটক ও অভিনয় ছিল উঁচুতলার মানুষের বিনোদনের মাধ্যম। ফলে নাটক ও অভিনয় বিষয়ে বিভিন্ন লেখালেখি শুরু হয়েছিল। যেমন, ভরতের *নাট্যশাস্ক্র* র কথা বলা যায়।

খ্রিস্টপূর্ব ২০০ থেকে খ্রিস্টীয় ৩০০ অব্দের মধ্যে বিভিন্ন ভাষায় নানা রকমেব সাহিত্য লেখা হয়েছিল তখন আস্তে আস্তে সংস্কৃত ভাষা রাজদরবারে গুরুত্ব পাচ্ছিল। এই সময়ে পতঞ্জলি মহাভাষ্য নামে সংস্কৃতে ব্যাকবণ বই লেখেন এই পর্যায়ের দুজন বিখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন অশ্বঘোষ এবং ভাস পাশাপাশি সংস্কৃত ভাষায় বৃদ্ধের কাহিনি লেখা হয়েছিল

জৈনবা অর্ধ-মাগধী ও প্রাকৃত দুই ভাষাতেই সাহিত্য লিখত। এই সময়ে বেশির ভাগ লেখমালা প্রাকৃত ভাষায় লেখা। সাধারণত শাসনকাজ চালানো হতো প্রাকৃত ভাষাতেই। সাতবাহন রাজা হালের লেখা গাহা সওসঈ বা গাখা সপ্তশতী প্রাকৃত ভাষাব একটি বিখ্যাত কবিতা সংকলন।

দক্ষিণ ভারতে তামিল ভাষায় সাহিত্য লেখার প্রচলন এই সময়েই শুরু হয় জানা যায় যে, মাদুরাই নগরীতে তিনটি সাহিত্য সম্মেলন হয়েছিল। এই সম্মেলনগুলি সঙ্গম নামে পবিচিত সঙ্গম মানে এক জায়গায় জড়ো হওয়া। তাই তামিল সাহিত্যকে সঙ্গম সাহিত্য বলা হয়। প্রাচীন সঙ্গম সাহিত্যের অন্যতম সেবা উদাহরণ একটি কবিতা সংকলন। সেই কবিতাগুলিতে অনেক সাধারণ মানুষেব কথা পাওয়া যায়। কৃষকেব জীবন, গ্রামেব ছবি ও নগবেব নানা কথা ঐকবিতাগুলিতে পাওয়া যায় তামিল ভাষার ব্যাকবণ চর্চাও এই সময় শুরু হয়েছিল।

চিকিৎসার নানা দিক নিয়েও গ্রন্থ রচনা শুরু হয়েছিল। ব্রাগ্রণ ও বৌশ্বদের লেখায় নানাবকম ওষুধ ও অস্ত্রোপচাবের কথা পাওয়া যায়। চরক-সংহিতা ও শুশ্রুত-সংহিতা চিকিৎসা নিয়ে লেখা দুটি বিখ্যাত বই। সেই সময় সমাজে চিকিৎসার গুরুত্ব এতটাই ছিল যে, চিকিৎসা শাস্ত্রকে উপবেদ বলা হতো। তাছাডাও অন্যান্য বিষয়েও বই লেখা হয়েছিল

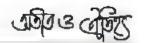
প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের সাহিত্যের ইতিহাসে খ্রিস্টীয় ৩০০ থেকে ৬৫০ অব্দ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। গুপ্ত ও গুপ্ত-পরবর্তী যুগে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের খুবই উন্নতি হয়েছিল। তবে এই সময়ে সাহিত্য যাঁরা লিখতেন ও যাঁবা পডতেন তারা সবাই উঁচুতলাব মানুষ ছিলেন। ফলে সাধাবণ মানুষেব জীবনেব ছবি ঐ লেখাগুলি থেকে বিশেষ পাওয়া যায় না। সম্রাট ও বাজাদের দববারে সংস্কৃত সাহিত্যেব চর্চা হতো। দু-একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে এই পুবো সময়কালে মহিলা সাহিত্যিকের কথা জানা যায় না।

प्रेवाखा वन्या

পুরাণ

পুরাণ শব্দটির একটি
অর্থ পুবোনো। পুরাণে
সেই পুবোনো দিনেব
কথাই থাকে। পুরাণ
সংখ্যায় আঠারোটি
মোটামুটিভাবে খ্রিস্টপূর্ব
পঞ্চম বা চতুর্য শতকের
আগেই ক্যেকটি পুরাণ
রচিত হয়েছিল বাকি
পুরাণগুলি খ্রিস্টীয়
দিপ্তম শতকের মধ্যে
বচনা করা হয়

বাজবংশগুলিব ইতিহাস পুরাণের একটি প্রধান আলোচনার বিষয় তাছাডা কৃষি, পশুপালন, বাণিজ্য, ভূগোল, জ্যোতিষ প্রভৃতিব কথাও পুবাণে বয়েছে। পুরাণ গুলিব সঙ্গে অনেক সময়েই ইতিহাস শব্দটিও যুক্ত বয়েছে প্রাচীন ভাবতে পুরাণ ও ইতিহাসের তফাত निर्मिष्ठ ছिल ना करल পুরাণ হলো এমন গল্পকথা যাতে কিছু কিছু ইতিহাসেব উপাদানও মিশে বয়েছে।



्रेयाता यथा

অশ্বঘোষ ও ভাস

সাধারণভাবে মনে কবা হয় অশ্বঘোষ কনিষ্কেব সময়ের সাহিত্যিক ছিলেন। নিজেব বচনায় নিজের সম্পর্কে প্রায বলেননি কিছই , অশ্বযোষ কেবল এইটক নিশ্চিতভাবে জানা যায় ,যে, তিনি ছিলেন বৌন্ধ সন্যাসী তাঁব বিখ্যাত বচনা হলো বৃদ্ধচরিত কাব্য। গৌতম বৃন্ধেব জীবন ও বন্তবাই বৃষ্ধচবিত কাব্যেব মধ্যে ধবা আছে।

খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় বা তৃতীয়
শতকেব নাট্যকাব
ছিলেন ভাস তাঁব
কয়েকটি নাটক
মহাভাবত ও বামায়ণেব
বিষয় নিয়ে লেখা।

মূর্তি, চিত্র ও স্থাপত্য শিল্পের বিষয়েও সংস্কৃতে বই লেখা হয়েছিল। কিন্তু কারিগরি শিল্পের উপরে আলোচনা কোনো বইতে দেখা যায না। গুপুযুগেও নাটক, অভিধান ও বিজ্ঞান বিষয়ে নানান লেখাপত্রের কথা জানা যায়। কবি এবং নাটাকার কালিদাস ছিলেন এই সময়ের সবথেকে বিখ্যাত সাহিত্যিক। শূদ্রক, বিশাখদত্ত এবং ভাববি প্রমুখও ছিলেন এই পর্যায়ের বিখ্যাত লেখক।

টুকান্ত্রে কথা শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকম

শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকম প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের একটি বিখ্যাত নাটক মৃচ্ছকটিকম কথাটির মানে হলো মাটির তৈরি ছোটো গাড়ি মৃৎ মানে মাটি আর শকটিকা মানে ছোটো শকট বা গাড়ি। এই দুয়ে মিলে মৃচ্ছকটিকম এই নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র চাবুদত্ত তার ছেলে ছোট্ট বোহসেন প্রতিবেশী বণিকের ছেলের সোনার তৈরি খেলনাগাড়ি দেখে। এ বকম একটি খেলনাগাড়িব জন্য বায়না ধরে রোহসেন। তথন তাকে ভোলানোর জন্য একটা মাটির খেলনাগাড়ি দেওয়া হয়। কিন্তু রোহসেনের বায়না ও কাল্লা তাতে থামে না এই নাটকের আবেক প্রধান চরিত্র বসস্তসেনা। রোহসেনের কাল্লা দেখে সে কম্ব পায়। রোহসেনের খেলনাগাড়ি বানিয়ে দেওয়ার জন্য বসস্তসেনা নিজের সোনার গ্রুমা দিয়ে দেয়। এই নাটকেব চরিত্রগুলি সব সাধাবণ মানুষ তাদেব জীবনেব সুখ দুঃখই নাটকটিতে ফুটে উঠেছে।

বিশাখদত্তের লেখা দুটি নাটক খুব বিখ্যাত। মুদ্রারাক্ষস ও দেবীচন্দ্রগুপ্তম।
নন্দরাজা ধননন্দকে হারিয়ে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সিংহাসন দখলই মুদ্রাবাক্ষসের
বিষয়বস্তু। গুপ্তবংশেব রাজা রামগুপ্ত ও চন্দ্রগুপ্তিব সঙ্গে শকবাজার যুন্ধকে
নিয়ে লেখা হয়েছিল দেবীচন্দ্রগুপ্তম নাটক। এর থেকে বোঝা যায় সেকালে
ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়েও সাহিত্য লেখা হতো।

গুপ্তযুগে সংস্কৃত ভাষায় গদ্য লেখাব প্রচলন দেখা যায় তবে সেই গদ্যগুলি পালি ভাষায় লেখা গদ্যেব মতো সরল ছিল না। দণ্ডীর লেখা দশকুমার চবিত সংস্কৃত গদ্যে লেখা একটি বিখ্যাত বই। ভর্তৃহরি ছিলেন এই সময়েব বিখ্যাত ব্যাকবণবিদ ও সাহিত্যিক অমরসিংহেব সংকলন কবা অমরকোষ এই সময়ের একটি বিখ্যাত অভিধান। সম্রাট ও রাজারাও লেখালেখিব চর্চা করতেন জানা যায় যে, বাজা হর্ষবর্ধন নিজেও তিনটি নাটক লিখেছিলেন। সেগুলি হলো নাগানন্দ, রত্মবলী ও প্রিয়দর্শিকা।

প্রাচীন ভারতীয়ত্ত পমহাদেশের অংষ্ণৃতিচর্চার নানা দিক

李结本教学结合

চিকিৎসা বিষয়েও বই লেখা গুপ্তযুগে চালু ছিল। বাগভট্ ছিলেন এই সময়ের বিখ্যাত লেখক। পশু চিকিৎসা নিয়েও কয়েকটি বই লেখা হয়েছিল গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বই গুপ্তযুগে লেখা হয়েছিল।

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী নাগাদ তামিল অঞ্চলে আর্য প্রভাব বিশেষভাবে খেয়াল করা যায় এব ফলে তামিল ভাষাতেও সংস্কৃতের মতো দীর্ঘ কবিতা লেখার চল শুরু হয়। ঐ দীর্ঘ কবিতাগুলিকে তামিল সাহিত্যে মহাকাব্য বলা হতো। এমনি দুটি মহাকাব্য ছিল শিলগ্লাদিকাবম ও মণিমেখলাই তামিল কবিরা রামায়ণেরও নানান অনুবাদ করেছিলেন। কম্বনের রামায়ণের কথা এ প্রসঙ্গে বলা যায়। তবে কম্বন তাঁর রামায়ণে অনেক নতুন গল্প যোগ করেছিলেন। সেখানে রামেব থেকে রাবণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

টুকন্ত্রে কথা সাহিত্যে নীতিশিক্ষা

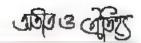
ঠিক ভুল বিচার শেখানোর জন্য পুরোনো আমলে একধরনের বই লেখা হতো।
সেই বইগুলিতে মানুষ ও বিভিন্ন পশুপাখির চরিত্র থাকত তাদেব কথাবার্তার
মধ্যে দিয়েই গল্পগুলো তৈরি হতো। বিভিন্ন ঘটনায় কেমন আচরণ করা উচিত,
সেটাই গল্পগুলোর মূল কথা হতো। তাই এইধরনের গল্পের বইগুলিকে
নীতিশিক্ষার সংকলন বলা যেতে পারে।

সংস্কৃত ভাষায় লেখা পঞ্চতন্ত্র তেমনই একটি নীতিগল্পেব সংকলন সম্ভবত খ্রিস্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতক নাগাদ এর গল্পগুলি সংকলন করা হয়েছিল। পঞ্চতন্ত্রের মূল রচনাটি পাওয়া যায়িন জানা যায় যে, একজন রাজা তাঁব ছেলেদের বোকামিতে দুঃখ পেয়েছিলেন। তথন পঞ্চিত বিষুশর্মার কাছে ছেলেদেরকে পাঠান পড়াশোনার জন্য। বিষুশর্মা বিভিন্ন নীতিগল্পের মধ্যে দিয়ে ছয়মাসেই রাজাব ছেলেদের শিক্ষা দিয়েছিলেন। আদতে গল্পগুলো ছোটোদেব জন্য লেখা হয়েছিল। তবে সেগুলিব ভেতরে সবার জন্যই নানান বন্ধব্য রয়েছে। পঞ্চেন্তেরের মতেই বিভিন্ন গল্পসংকলনে নীতিশিক্ষা দেওয়া হতো। জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যেও এধবনের নীতিশিক্ষামূলক বচনাব চল ছিল। বৌদ্ধজাতকগুলি এর বড়ো উদাহবণ। তামিল সাহিত্যেও নীতিশিক্ষার কথা পাওয়া যায়।

प्रेकाखा कथा

কালিদাস

ভারতীয় প্রাচীন উপমহাদেশের বিখ্যাত সাহিতিক ছিলেন কালিদাস তবে তিনি কোন সময়ের মানুষ .ছিলেন, তা নিয়ে বিতৰ্ক রয়েছে , মোটামটিভাবে মনে করা হয় তিনি গুপ্তযুগের সাহিত্যিক ছিলেন কালিদাসেব জীবন নিয়ে অনেক গল্পকথাও প্রচলিত রয়েছে কাব্য ও নাটক -- দুই-ই লিখেছেন কালিদাস মেঘদূতম, কুমাৰসভ্তৰম তাঁব লেখা দৃটি বিখ্যাত কাব্য অভিজ্ঞান শকুন্তলম,মালবিকা-গ্নিমিত্রম প্রভৃতি তাঁব বিখ্যাত নাটক। তাঁব বচনায় সেই সময়েব সমাজ ও প্রকৃতির নানাদিক ফটে উঠেছে।

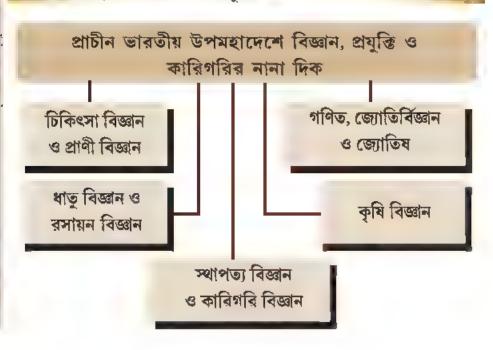


৮.৩ প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে বিজ্ঞানচর্চা

বিজ্ঞানকথাব মানে কোনো বিষয়ে বিশেষভাবে জ্ঞান অর্জন কবা। প্রযুক্তি কথাব মানে প্রয়োগ করা বিজ্ঞানেব নানা কিছু জ্ঞান রোজকাব জীবনে প্রয়োগ কবা দরকাব হয় যেমন, বাড়ি বানাতে জ্যামিতিব ধারণা প্রয়োগ কবতে হয় তাই বাডি বানাবার কাজটা প্রযুক্তির অংশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গো সমাজের যোগ আছে। এক এক সমাজে এক এক রকম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দরকার হয় ধরা যাক, একটা সমাজের মানুষ ধাতুর ব্যবহার জানে না। ঐ সমাজে ধাতু বিজ্ঞান ও ধাতু প্রযুক্তির দরকার হবে না। প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশে হরপ্পা ও বৈদিক সমাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চা ছিল। সেসব আলোচনা আগেই হয়েছে। এবারে খিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক নাগাদ থেকে আলোচনা শুবু করা যেতে পারে।

টুকান্ত্রে কথা লক্ষ্মণের শক্তিশেল

বামায়ণে একটা গল্প রয়েছে রাবণেব সঞ্চো যুন্থে শক্তিশেল অস্ত্রেব আঘাতে লক্ষ্মণ অজ্ঞান হয়ে পড়েন বৈদ্য সুষেণ বলেছিলেন ক্ষতস্থানে বিশল্যকরণী লাগিয়ে দিলেই লক্ষ্মণ সুস্থ হয়ে উঠবেন বিশল্যকরণী একটি ঔষধি গাছ ঔষধি খুঁজতে হনুমান গেলেন গন্ধমাদন পর্বতে কিন্তু বিশল্যকরণী চিনতে না পেরে পুরো পর্বতটাই তুলে নিয়ে এলেন্ হনুমান বিশল্যকরণী লাগানোর ফলে লক্ষ্মণ সুস্থ হয়ে উঠেলেন। বিশল্যকরণী কথাব মানে বিশেষ রূপে শল্যকরণের পর (অস্ত্রোপচারের পর) যে ওষুধ লাগানো হয়। আদতে এটা গল্প হলেও, চিকিৎসার প্রসঞ্জাটা জবুবি



প্রাচীন ভারতীয়ত্ত পমহাদেশের সংস্কৃতি চর্চার নানা দিক

431.735.731.735

পরবর্তী বৈদিক ও বৌদ্ধ সাহিত্যে বিভিন্ন ঔষধ ও অস্ত্রোপচারের কথা বয়েছে। চরক সংহিতায় প্রায় সাতশো ঔষধি গাছপালার কথা পাওয়া যায়। এই বইতে রোগের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা আছে। একটি আদর্শ হাসপাতাল কেমন হওয়া উচিত তার বিবরণ চবক সংহিতায় পাওয়া যায়। হাড় ভেঙে গেলে, বা নাক, কান ইত্যাদি কেটে গেলে তা জোড়াব কাজে শল্য চিকিৎসকরা ছিলেন অত্যন্ত পটু। এই বিদ্যায় বিখ্যাত ছিলেন শুগ্রুত।

টুকান্ত্রো কথা জীবক

জীবক ছিলেন বুন্ধের সময়কালের বিখ্যাত চিকিৎসক। তিনি ছিলেন বিশ্বিসারের বাজবৈদ্য। তাঁর জন্ম বাজগৃহে হলেও, তিনি তক্ষশিলায় গিয়ে গুবু আত্রেয়র কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেন।

শিক্ষা শেষ হবাব পর গুবু তাঁব শিষ্যদেব আদেশ দেন আশেপাশেব এলাকা থেকে ভেষজগুণহীন গাছপালা জোগাড় করে আনতে। নির্দিষ্ট সময়ের পর জীবক বাদে অন্য সবাই নমুনা জোগাড় করে ফিরে আসে। অনেক পরে জীবক খালি হাতে ফিবে এলে গুবু অবাক হন। এব কারণ জানতে চাইলে জীবক বলেন, ভেষজগুণহীন কোনো গাছ তাব নজরে পড়েনি। এই উত্তরে গুরু খুশি হন। তিনি বুঝতে পারেন ভেষজ উদ্ভিদ বা ঔষধি সম্বন্ধে জীবকের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে। জীবক বাজা বিশ্বিসার ও গৌতম বুন্ধকে বেশ কয়েকবাব কঠিন বোগ থেকে সারিষে হলেছিলেন।

জাতিভেদ প্রথা কঠোব হবার ফলে চিকিৎসাবিজ্ঞানচর্চায় সমস্যা তৈবি হয়েছিল। বলা হতো আগের জন্মে পুণ্য করলে পরের জন্মে বোণের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। এধবনেব কথা চিকিৎসাবিজ্ঞানেব বিরোধী ছিল। বোণ সাবাতে গেলে নানান বকম খাদ্যের কথা বলা ছিল অথচ সেই খাদ্যের অনেকগুলি ধর্মশাস্ত্রের মতে খাওয়া বারণ ছিল। ফলে ধর্মশাস্ত্রেব সঙ্গে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন সময় বিরোধ তৈরি হয়েছিল। শুশ্রুত সংহিতায় চিকিৎসাবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল শবব্যবচ্ছেদ বা মড়াকাটা। অথচ ধর্মশাস্ত্রের মতে শব বা মৃতদেহ ছোঁয়া নিষেধ ছিল। ফলে মড়াকাটা নিষিম্প হওয়ার জন্য শারীববিদ্যা ও শল্যচিকিৎসার চর্চা ধীবে ধীবে কমে গেল বাগভট্-এব পর থেকে শল্যচিকিৎসার ব্যাপারে তেমন উৎসাহ ছিল না তাছাডা চিকিৎসকরা বোগী ব্রাত্মণ না শুদ্র তাব বিচাব করতেন না। ফলে প্রচলিত বর্ণশ্রেম প্রথাব সঙ্গে চিকিৎসাবিদ্যার বিরোধিতা তৈবি হয়।

222

ভেবে দেখো

বৌষ্ধ মতে চবক প্রথম কনিষ্কেৰ আমলের লোক ছিলেন তাহলে চরক সংহিতা কি চরক নামে কোনো বাঙিব লেখা? চরক কথাটিব মানে যাবা ঘরে বেডায়। বেদের একটি শাখায় চারণ-বৈদ্য বা ঘুবে বেডানো চিকিংসকদের কথা পাওয়া যায়। তাহলে কী চবক সংহিতা ঐ বকম ঘবে বেডানো চিকিৎসক অভি জ্ঞতার দের সংকলন ?

শৃশুত কোন সময়েব লোক ছিলেন তা নিশ্চিত ভাবে জানা যায় না। শৃশুত কথাটিব মানে যিনি বা যাঁবা ভালো করে শৃনেছিলেন। তাহলে শৃশুত সংহিতাও কি ঐরকম চাবণ-বৈদ্যদেব অভিজ্ঞতাব সংকলন? প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত ও জ্যোতিষচর্চা দীর্ঘদিন একসঞ্চের চলেছিল। জৈন ও বৌন্ধরাও গণিতের চর্চা কবতেন। তাঁদেব ধর্মগ্রন্থ থেকে সে বিষয়ে অনেক আলোচনা পাওয়া যায় পাটিগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতি মিলিয়ে বৌন্ধদের গণিতবিজ্ঞান তৈবি হয়েছিল। জৈনরা তাকেই বলতেন সংখ্যাযন। সেই সময়ে পড়াশোনায় গণিতের স্থান ছিল সামনের সারিতে। মহাবীর ও গৌতম বুন্ধ দুজনেই গণিতেব চর্চা করেছিলেন। খ্রিস্টীয় প্রথম শতকে বিখ্যাত বৌন্ধ পণ্ডিত নাগার্জুন ছিলেন একজন গণিতবিদ।

গুপ্তযুগে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও গণিতের অনেক উন্নতি হয়েছিল। যদিও গুপ্ত যুগে জ্যোতির্বিজ্ঞান অনেকটাই জ্যোতিষচর্চাব কাজে ব্যবহাব হতো। আর্যভট্ট গণিতকে একটি আলাদা চর্চার বিষয় কবে তুলেছিলেন। *আর্যভটীয়* বইতে গণিত, সময় ও গ্রহ-নক্ষত্র বিষয়ে আলোচনা করেছেন আর্যভট্ট। সেই বইতে সংখ্যা হিসাবে শূন্যের ব্যবহার করেন তিনি। সেই চর্চা থেকেই দশমিকেব ধারণাও শুরু হয়েছিল। আর্যভট্ট বলেছিলেন, পৃথিবী গোলাকার ও নিজের অক্ষের উপর পৃথিবী ঘুরছে তাঁর মতে, পৃথিবীব ছায়া চাঁদের উপব পডাব ফলে চন্দ্রগ্রহণ হয়।

আর্যভট্টেব পববতীকালে বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন ববাহমিহিব। সূর্যসিম্খান্ত ও পঞ্জসিম্খান্তিকা বইতে বরাহমিহিব পুরোনো ধাবণাব অনেক

বদল কবেছিলেন। বৃষ্টিপাতের পবিমাণ ও তার আগাম লক্ষণ কী কী, তা নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। আবার ভূমিকম্পের আগে বিভিন্ন প্রাকৃতিক লক্ষণ বিষয়ক আলোচনাও ববাহমিহিবেব লেখায় পাওয়া যায়। বরাহমিহিরের পববতী সময়ে ব্রম্নগুপ্ত ছিলেন বিখ্যাত গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তাঁর হাতেই প্রাচীন ভারতের গণিত সবথেকে বেশি বিকশিত হয়েছিল। বহুসিম্পান্ত তাঁব একটি বিখ্যাত বই।

প্রাচীন ভাবতে খনি ও ধাতু বিজ্ঞানও ছিল যথেষ্ট উন্নত বিভিন্ন ধাতুব অস্ত্রশস্ত্র, মুদ্রা, গ্রহানা ও মূর্তি এর প্রমাণ ধাতু বিজ্ঞানের উন্নতির উদাবহণ মেহরৌলির লোহার স্তম্ভটি। স্তম্ভটিতে আজও মরচে পড়েনি তবে ধাতৃ

ছবি. ৮.১ [•] মেহরৌলির লোহার স্তম্ভ



প্রাচীন ভারতীয়ত্ত পমহাদেশের সংস্কৃতিচর্চার নানা দিক

বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাচীন লেখাপত্র বিশেষ পাওয়া যায়নি ধাতু গলানোর কাজ বসায়নেব জ্ঞান ছাড়া সম্ভব নয় বিভিন্ন ঔষধ তৈবিতেও রসায়ন বিজ্ঞানেব ব্যবহার হতো পাশাপাশি সুগন্ধি দ্রব্য ও খাদ্য তৈবিতেও বসায়ন বিজ্ঞানের বাবহার ছিল।

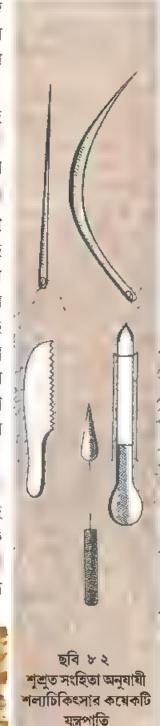
প্রাচীন ভাবতীয় সমাজে কৃষিই ছিল বেশিরভাগ মানুষের জীবিকা তাই কৃষিকাজ ও গাছপালা নিয়ে আলোচনাও বিজ্ঞানচর্চাব আওতায় পডেছিল কৃষিবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা কবা হয়েছিল *কৃষিপরাশব প্রন্থে* কৃষিব পাশাপাশি পশুপাখি নিয়েও বৈজ্ঞানিক আলোচনা প্রাচীন ভাবতে হতো বলে জানা যায়।

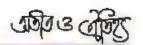
ইট, পাথব ও ধাতৃব ব্যবহাব প্রাচীন ভারতেব প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানচর্চাব নানা ক্ষেত্রে দেখা যায় তার স্ঞো ছিল নানা রকম যন্ত্র তৈরির কৌশল তার থেকেই কারিগরি বিজ্ঞানের উন্নতির দিকটাও স্পষ্ট হয়। অস্ত্রোপচারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি চিকিৎসকরা নিজেরা তৈরি করতেন না দক্ষ কারিগরদের বিশেষ করে কামারের উপর তাদের নির্ভর করতে হতো। শুশ্রুত সংহিতায় বলা হয়েছে দক্ষ কামারের সঙ্গো চিকিৎসককে আলোচনা করতে হবে।প্রয়োজনীয় যন্ত্র কেমন হবে তা কারিগবকে বৃঝিয়ে দিতে হবে। সেই মতো কাবিগর যন্ত্র তৈবি করে দেবেন খাতৃ ও দামি পাথবেব বিচাব ও পবখ কবাও বিজ্ঞানের অংশ বলে ধবা হতো খনি ও পাথবেব বিষয়ে চর্চা ছিল বিজ্ঞানের আওতায় বিভিন্ন ধাতু মেশানো এবং আলাদা কবার চর্চাও হতো।

শুশ্রত সংহিতায় কারিগরদেব ও হাতের কাজকে প্রশংসা কবা হয়েছে বলা হয়েছে হাতই প্রধানতম যন্ত্র। অথচ ধর্মশাস্ত্রে কারিগরদের কাজকে নেহাতই হেয় করা হয়েছে। তাব ফলে ধীবে ধীরে কারিগরি শিল্পচর্চা বিজ্ঞানচর্চা থেকে আলাদা হয়ে গেল। যদিও স্থাপত্য বানানোর কারিগরি শিল্প নম্ট হয়ে যায়নি ধর্মীয় প্রয়োজনেই বেশিব ভাগ স্থাপত্য বানানো হতো। ফলে সেগলি ছিল মন্দিব ও মঠ। উত্তব ও দক্ষিণ ভারতে সে ধবনের স্থাপত্য তৈবি হয়েছিল।

টুফস্ত্রে ফখা প্রাচীন ভারতে পরিবেশ চিন্তা

<mark>প্রাচীন ভা</mark>রতীয় উপমহাদেশে পরিবেশ চিন্তার প্রধান বিষয় ছিলু বন, গাছপালা ও পশুপাথি। বন থেকে নানারকম সম্পদ পাওয়া যেত। ফলে বনের প্রতি শাসকদের বিশেষ নজর দিতে হতো অর্থশাস্ত্রে বিভিন্নরকম বন বিষয়ে আলোচনা বয়েছে। বনের ক্ষতি করলে কডা শাস্তিব কথাও বলা আছে সম্রাট অশোক বেশ কিছ পশপাখি মাবতে নিষেধ কবেছিলেন।





999

ভেবে দেখো

প্রাকৃতিক পরিবেশ নম্ভ হওয়ার জন্য কী কী বিষয় দায়ী বলে তোমার মনে হয় ? আজকের পরিবেশ বাঁচাতে তোমবা দল বেঁধে কী কী কাজ করতে পারো, তার তালিকা বানাও খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক নাগাদ কৃষিকাজ ও নগব বসতি বাড়তে থাকে। ফলে জন্ধাল
(অরণ্য) কাটা শুরু হয়। বৈদিক সাহিত্যে দেখা যায় গ্রাম হলো চেনাজানা অঞ্চল
অন্যদিকে জঙগল হল অচেনা। জঙগলে থাকা মানুষজনও অদ্ভূত।
জঙগলবাসীদেব প্রায় সবসময়ই নীচু কবে দেখানো হয়েছে। মহাকাব্যে দেখানো
হয়েছে বাজপবিবাবেব কাউকে বিপদে ফেলার জন্য জঙগলে পাঠানো হতো
বনেব পশুপাখি শিকারের অনেক উদাহবণ লেখাগুলিতে আছে। জঙগল পুডিযে
ফেলার ঘটনাও সেখানে পাওয়া যায়। বাক্ষসরা অনেকে বনেই থাকতেন। তাবা
ক্ষিদেব উৎপাত কবতেন বাজাবা বাক্ষসদেব হাত থেকে শ্বষিদের বক্ষা করতেন।
নগর যত বাড়তে থাকে, জঙগল ততই কমতে থাকে তাই বিভিন্ন সময় গাছ
বাঁচানোর নানান উপায় তৈরি কবা হতো। যেমন, বট অশ্বর্থ গাছকে পুজো
কবাব চল শুবু হয়। তাই ঐসব গাছ তখন আব কাটা যেত না

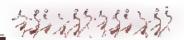
বোজকাব জীবনে, কৃষিকাজে ও নানা ধর্মীয় কাজে জল ছিল খুব জরুবি। তাই জল ধবে রাখা, জলসেচ ও জলাশয় তৈবিব নানান উদ্যোগ নেওযা হতো ধনী ব্যক্তিরা বিভিন্ন জলাশয় তৈবি কবিষে দিতেন। তবে আজকেব তুলনাষ সেযুগে জনসংখ্যা অনেক কম ছিল ফলে পরিবেশেব ওপর চাপও কম পডত

৮.৪ প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের শিল্পচর্চা

আদিম মানুষ একসময় গুহায় থাকতো। পরে এক সময়ে গুহার দেয়ালে ছবি আঁকত তারা। তাতে দেয়ালগুলো দেখতেও সুন্দর হতো। অনেক পরে মানুষ বাড়ি বানাতে শুরু করেছিল। প্রয়োজন মতো কাঠ, পাথর, মাটি, ইট দিয়ে নানারকম স্থাপত্য বানিয়েছে মানুষ। তার পাশাপাশি বানিয়েছে নানাবকম ভাস্কর্য। আব এঁকেছে ছবি। এইসব মিলিয়েই প্রাচীন আমলে শিল্পচর্চা চলতো। তার সঙ্গো হবেকরকম কারিগবি শিল্পের প্রচলনও ছিল।

প্রাচীন সমাজে স্থাপত্যগুলো মূলত দু-বকম কাজের জন্য বানানো হতো ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের জন্য স্থাপত্য বানানোব চল ছিল। ভাস্কর্য ও দেওয়ালে আঁকা ছবিগুলিতেও ধর্মীয় নানা বিষয় ফুটে উঠতো। তাছাড়া ছিল বাজনৈতিক ও সামাজিক প্রযোজনে বানানো স্থাপত্য। বিবাট ইমারত বানানো হতো শাসকের ক্ষমতা বোঝানোব জন্য। বাড়ি, প্রাসাদ প্রভৃতি স্থাপত্য ছিল ব্যক্তিগত ব্যবহাবের জন্য ধর্মীয় কারণে বানানো স্থাপত্যগুলি সব মানুষ ব্যবহাব করতে পাবতেন। বণিক, ব্যবসায়ীরাও স্থাপত্যের জন্য অর্থদান কবতেন। কথনো আবার সাধারণ মানুষ স্কৃপ বা মন্দির বানানোয় সাহায্য করতেন।

প্রাচীন ভারতীয়ত্ত পমহাদেশের সংস্কৃতিচর্চার নানা দিক



মৌর্য আমলের শিল্পচর্চা

হবপ্পা সভাতার পব ভাবতীয় উপমহাদেশে মৌর্য আমলেবই শিল্পের উদাহবণ পাওয়া যায়। মৌর্য শিল্পে পাথরেব ব্যাপক ব্যবহাব হয়েছিল। ঐ শিল্পের বেশিবভাগ নিদর্শন ভাস্কর্য, স্থাপত্যেব নজিব খুব অল্প

অশোক ও তার পরবর্তী মৌর্য
সম্রাটরা আজীবিকদের জন্য গুহাবাস
বানিয়ে দিয়েছিলেন। পাহাড় কেটে
কৃত্রিম গুহা বানানো হতো। সেই
গুহাগুলির ভিতরে মানুষ বাস কবত
বলে তাকে গুহাবাস বলা হতো।
জানা যায় সম্রাট অশোক
অনেকগুলি ভূপ বানিয়ে দিয়েছিলেন
বৌন্ধদের জন্য। শুরুর দিকে ভূপগুলি
মাটির তৈরি হতো। অশোকের সময়
অনেক ভূপের উপর ইটের ব্যবহার
শুরু হয়। ফলে ভূপগুলি অনেক
বেশি মজবুত ও স্থায়ী হয়েছিল।
অশোকের আমলেই সারনাথ ও
সাঁচীর ভূপগুলি ফের বানানো হয়।



ছবি. ৮.৩: খামেক ত্তৃপ, সারনাথ



মৌর্য শিল্পেব অন্যতম নজির অশোকের আমলে বানানো পাথরের স্তম্ভগুলি। স্তম্ভগুলির গায়ে কখনো কখনো লেখ খোদাই করা হতো। একটি পাথর থেকেই স্তম্ভগুলি তৈরি হতো। অশোকস্তম্ভ অনেকটা চক-খড়ির মতো দেখতে স্তম্ভের ভিত মাটিতে পোঁতা থাকত কোনো ঠেকা ছাড়াই স্তম্ভগুলো সোজা দাঁড়িয়ে থাকত। একটা মাত্র পাথর কেটেই তৈবি হতো বলে স্তম্ভগুলোকে মুলত

ভাস্কর্য বলা যেতে পারে। স্তম্ভের একেবারে ওপরে বসানো থাকত একটা প্রাণীর মূর্তি। সিংহ, হাতি, যাঁড় প্রভৃতি প্রাণীর মূর্তি সেক্ষেত্রে ব্যবহার হতো। এই জাতীয় পাথরের স্তম্ভ মৌর্য যুগের আগে দেখা যায়নি। এমনই একটি বিখ্যাত অশোকস্তম্ভ সারনাথে রযেছে।

মৌর্য যুগেব শিল্পে মানুষেব মূর্তি বিশেষ দেখা যায়নি। মৌর্য শিল্প মূলত শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় তৈবি হয়েছিল জনসাধারণেব জীবন যাপনেব সঙ্গে মৌর্য শিল্পেব বিশেষ যোগ ছিল না। তাই মৌর্য শিল্পেব ছাপ পববর্তী সমযেব শিল্পে বিশেষ দেখা যায় না।



অশোকস্তম্ভ, রামপূর্বা

সুজ্গ-কুষাণ-সাতবাহন আমলে শিল্পচর্চা

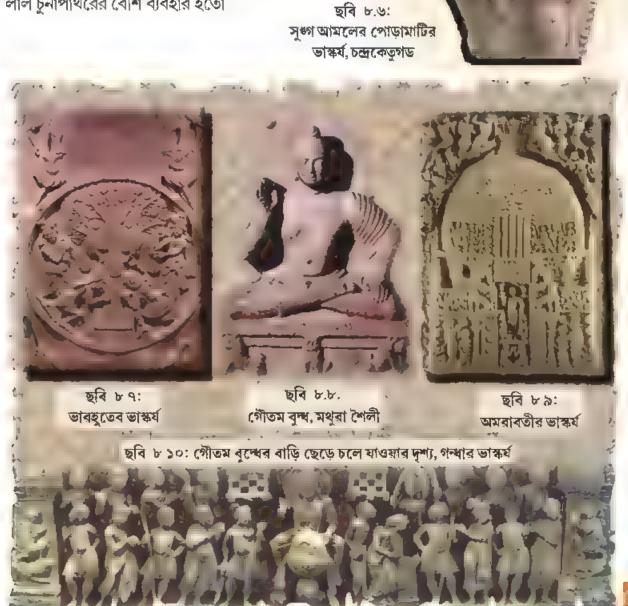
মৌর্যদের পরবর্তী যুগে ভাস্কর্য বানানোর কাজে পাথরের পাশাপাশি পোডামাটির ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। ফলে সেই সময় শিল্পচর্চা পুরোপুরি শাসকের অনুগ্রহের উপরে নির্ভবশীল ছিল না। সুঞ্চা, কুষাণ ও সাতবাহন আমলে সাধারণ জীবনের ছাপ শিল্পের উপর পডেছিল। তবে ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার সঞ্চোও শিল্পের যোগাযোগ ছিল। এই সময় ধর্মীয় স্থাপত্যের ক্ষেত্রে সেরা নজির স্তুপ, চৈত্য ও বিহার। প্রধানত বৌল্ধধর্মচর্চার সঞ্চোই এই স্থাপত্য শিল্পগুলি জড়িত। তবে জৈন ধর্মেও স্তুপ বানানোর নজির রয়েছে। ব্রাত্মণ্য ধর্মের স্থাপত্যের নজির এই আমলে খুবই সামান্য।

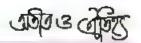
প্রাচীন ভারতীয়ত্ত পমহাদেশের মংস্কৃতি চর্চার নানা দিক

33333333

সুষ্ণা-কুষাণ যুগে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভাস্কর্যের বিষয় ছিল বুন্ধের জীবন ও বৌন্ধ ধর্ম এই আমলের শিল্পে রাজদরবারের সরাসরি প্রভাব বিশেষ দেখা যায় না। তবে প্রকৃতি এবং রোজকার জীবনের নানা দিক ভাস্কর্য শিল্পে ফুটে উঠেছে তোরণের ভাস্কর্যগুলি অনেক সময় যেন একটি টানা গল্প বলে চলেছে

শক-কুষাণ যুগে গন্ধাব ও মথুবাব শিল্পবীতি ছিল খুব বিখ্যাত। বুন্ধেবজীবনও বৌন্ধ ধর্ম এই দুই শিল্পবীতির মূল বিষয়। গন্ধার ভাস্কর্যে প্রধানত গ্রিক ও রোমান প্রভাব দেখা যায়। মথুবা রীতির ভাস্কর্যে লাল চুনাপাথরের বেশি ব্যবহার হতো





টুকস্ত্রো কথা স্তৃপ-চৈত্য-বিহার

জানা যায়, গৌতম বুন্ধ তাঁর দেহাবশেষের উপর স্থৃপ বানানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। <mark>অর্ধ-গোলাকার</mark> মাটির টিবিগুলোই ছিল মৌর্য যুগের আগেব স্থূপ। মৌর্য পরবর্তী সময়ে স্থূপ বানানো সংখ্যায় অনেক

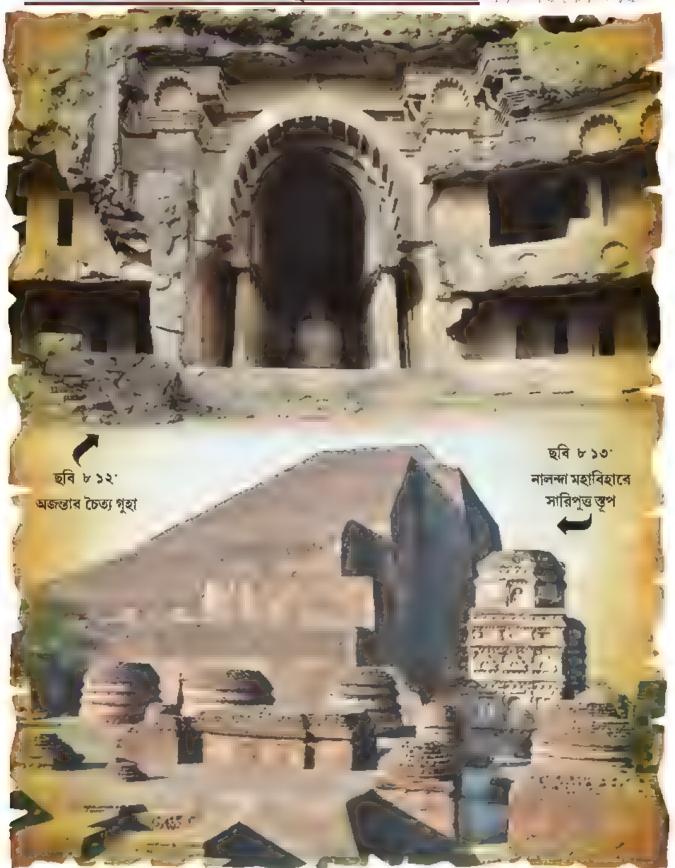


বেডে যায়। স্থূপের চাবদিকে চারটি বড়ো দরজা থাকত সেগুলিকে তোরণ বলা হয় তোবণগুলিতে ভাস্কর্য খোদাই করা হতো। স্থূপেব চারপাশে ঘুরে ঘুবে উপাসনা কবার জন্য পথও থাকত শাসক ও ধনী ব্যক্তিদের উদ্যোগে স্থূপগুলি তৈরি হতো ভারহুত, সাঁচী ও অমবাবতীর স্থূপগুলি স্থাপত্য হিসাবে বিখ্যাত স্থূপের সঙ্গো সঙ্গো বানানো হতো চৈত্য। সরাসবি পাহাড কেটে গুহাবাস হিসাবেই বেশিরভাগ চৈত্য

বানানো হতো চৈত্যের আকার হতো লম্বাটে ধরনের চৈত্যের শেষ প্রান্তে উপাসনার জন্য একটি স্থূপ থাকত। সাতবাহন যুগে নাসিক, পিতলখোবা, কার্লে প্রভৃতি অঞ্চলে চৈত্য বানানো হযেছিল

বৌন্ধ বিহার বা সংঘাবামগুলিও স্থাপত্য শিল্পের উদাহবণ। বৌন্ধ ভিক্ষুদেব থাকাব ও পড়াশোনার জন্যই বিহাবগুলি তৈরি হতো। বিহাবগুলি আদতে ছিল অনেকগুলি গুহাব সমষ্টি। পববতীকালে ইট দিয়ে বিহার তৈরি করা হতো।

প্রাচীন ভারতীয়ত্ত পমহাদেশের সংস্কৃতি চর্চার নানা দিক





গৃপ্ত ও পল্লব আমলের শিল্প চর্চা

গুপ্ত আমলেও শিল্পচর্চাব সঞ্চো ধর্মীয় ধ্যানধাবণাব যোগাযোগ দেখা যায়। পাথরেব পাশাপাশি পোড়ামাটিব ব্যবহারও এইসময় ভাস্কর্যে লক্ষ কবা যায়।

স্তুপ ও চৈতা বানানো গুপ্ত আমলেও চালু ছিল সারনাথের ধামেক স্কুপ প্রথমে ইট দিয়ে বানানো হয়েছিল। এই আমলে তার উপরে পাথরের আস্তরণ দেওয়া হয়। গুপ্ত আমলে প্রথম স্থাপত্য হিসাবে মন্দির বানানো শুরু হয়। মন্দির কখনো ইট কখনো পাথব দিয়ে তৈরি হতো। এই আমলের মন্দিরগুলির মধ্যে দেওঘবের দশাবতাব মন্দির বিখ্যাত। পাশাপাশি পাহাড় ও পাথব কেটে মন্দিব তৈবিব চল ছিল। পল্লব আমলে মহাবলীপুবমে পাথব কেটে বথেব মতো দেখতে মন্দিব তৈবি হয়েছিল। গুপ্তযুগের শিল্পেব সঞ্চো ধর্মের যোগাযোগ খুব স্পষ্ট।

গুপ্তযুগ ও পল্লবযুগের মন্দিরগুলির দেয়ালে নানা দেবদেবীর মূর্তি খোদাই করা হয়েছিল যেমন
কৈলাস মন্দিরে রামায়ণের প্যানেল, দশাবতার
মন্দিরের ভাস্কর্য। গুপ্তযুগের চিত্রশিল্পের
সবথেকে বিখ্যাত উদাহরণ মধ্য ভারতে
অজন্তা গৃহার ছবিগুলি। বিভিন্ন
গাছপালা ও মানুষের ছবি সেখানে
রয়েছে। নানাধবনের অজন্তা গুহাব
ছবিগুলিতে দেখা যায় রংগুলি
বিভিন্ন পাথর, মাটি ও গাছ
গাছড়ার উপাদান দিয়ে
তৈবি করা হতো। অজন্তা
ছাডাও ইলোরা এবং বাঘ
গৃহাতে বেশ কিছু ছবি

ছবি. ৮.১৪. দশাবতার মন্দির, দেওঘর

পাওয়া গেছে।

প্রাচীন ভারতীয়ত্ত পমহাদেশের সংস্কৃতি চর্চার নানা দিক







ছবি ৮ ১৫ বৌশ্ব ভিক্ষু, অজন্তা গুহাচিত্র

ছবি ৮ ১৬ ইলোবা গৃহাচিত্ৰ

টুকন্ত্রে কথা চন্দ্রকেতুগড়

পশ্চিমবংশাব উত্তব ২৪ প্রকানা জেলাব বেড়াচাঁপায় পাওয়া গেছে প্রাচীন বাংলাব প্রত্নন্থল চন্দ্রকেতুগড়েব ধ্বংসাবশেষ চন্দ্রকেতুগড় বিদ্যাধরী নদীব মাধ্যমে গংগাব সংখ্য যুক্ত ছিল। এটি ছিল একটি বাণিজাকেন্দ্র। আবার অন্যদিকে ছিল সমৃন্ধ জনপদ। এখানে মৌর্য আমলেব আগে থেকে (আনুমানিক খ্রিঃ পৃঃ ৬০০-৩০০ খ্রিঃ পৃঃ অন্ধ) পাল-সেন আমল পর্যন্ত (আনুমানিক ৭৫০-১২৫০ খ্রিঃ অন্ধ) সময় কালেব নানা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। যেমন নানা ধরনেব মাটির পাত্র, সিলমোহর, মূর্তি প্রভৃতি। এখানে টেবাকোটা বা পোডামাটিব তৈবি মূর্তি পাওয়া গেছে। যার মধ্যে নারীমৃতির সংখ্যা বেশি



ছবি ৮ ১৭: পোডামাটিব ভাস্কর্য, চন্দ্রকেতুগড



ভেবে দেখো



বেমানান শব্দটি খুঁজে বের করো:

- নালন্দা, তক্ষশিলা, বলভী, গাটলিপুত্র।
- ১২) ব্রান্মী, সংস্কৃত, খরোষ্ঠি, দেবনাগরী
- রত্নাবলী, মৃচ্ছকটিকম, অর্থশাস্ত্র, অভিজ্ঞান শকুন্তলম।

২। নীচের বাক্যগুলির কোনটি ঠিক কোনটি ভুল লেখো:

- ২.১) নালন্দা মহাবিহারে কেবল ব্রায়ণ ছাত্রবাই পডতে পারত।
- ২ ২) কম্বনের রামায়ণে বামকেই বড়ো করে দেখানো হয়েছে।
- ২.৩) বাগভট ছিলেন একজন চিকিৎসক।
- ২.৪) কুষাণ আমলে গন্ধার শিল্পেব বিকাশ ঘটেছিল

৩। ক-ন্তন্তের সঞ্চে খ-স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো:

মহাবলীপুরম কুষাণ যুগ
গন্ধাব শিল্পবীতি নাগার্জুন
গণিতবিদ তামিল মহাকাব্য
মণিমেখলাই গুহাচিত্র
অজন্তা বথেব মতো মন্দিব

8। নিজের ভাষায় ভেবে লেখো (তিন/চার লাইন):

- ৪ ১) প্রাচীনকালের বৌল্ধ শিক্ষাব্যবস্থার সঞ্জে আজকের শিক্ষাব্যবস্থার মিল-অমিলগুলি নিজের
 ভাষায় লেখে।
- ৪২) চবক সংহিতায় আদর্শ হাসপাতাল কেমন হবে, তা বলা আছে। তোমার মতে একটি ভালো হাসপাতাল কেমন হওয়া উচিত ?
- ৪.৩) একটি বিহার ও ক্তুপের মধ্যে পার্থক্যগুলি লেখো

৫। হাতেকলমে করো:

মাটি, থার্মোকল দিয়ে চৈত্য/বিহাব/স্তৃপের মডেল তৈরি করো।

2

ভারত ও সমকালীন বহির্বিশ্ব

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত

বির বাডি যেতে সবাই সবসময় বাজি। বুবিব দাদু এতরকম গল্প বলেন। মজাব মজাব থেলা শেখান।কয়েকদিন ধবেই দাদু ওদেব নিয়ে একটা মজাব খেলা খেলছেন। একটা ইয়া বড়ো পৃথিবীর



মানচিত্র মেঝেতে বিছিয়ে দেওয়া হয়। তাতে কত জায়গার নাম। তার সঙ্গো নদী-পাহাড সব কিছু। এবারে সবাই কয়েকটা দলে ভাগ হয়ে যায়। তারপর একদল অন্যদলকে একটা নাম বলে। যেটা খুঁজতে হয় মানচিত্রে। পারলে পয়েন্ট পাওয়া যায়। না পারলে পয়েন্ট কাটা যায় এভাবে চলতে থাকে খেলা। সবাই মশগুল হয়ে খেলে। আর খেলার শেষে বোঝে কত কিছু শেখা হলো, আবার খেলাও হলো।

একদিন খেলার মাঝে সুরাইয়া দাদুকে প্রশ্ন করল। আচ্ছা দাদু, এই যে মানচিত্রে এত দেশ, এসব কী

প্রাচীন যুগে ছিল ? দাদু বললেন, পৃথিবীব মানচিত্র বাববাব বদলেছে। যে দেশগুলো এখনকাব মানচিত্রে দেখছ প্রাচীন যুগে সেগুলো ছিল না। এখনকার অনেকগুলো দেশ বা অঞ্চল জুড়ে তৈবি হয়েছিল সে যুগেব একেকটা সভ্যতা। সেই সভ্যতাগুলির মধ্যে যোগাযোগও ছিল।প্রাচীন যুগে ভাবতীয় উপমহাদেশের সভ্যতাগুলিব কথা তো জেনেছ ঐ সময়ে পৃথিবীব নানা জায়গায় অন্যান্য সভ্যতার কথাও কিছুটা তোমাদেব জানা। সেই সভ্যতাগুলিব সঞ্চো ভাবতীয় উপমহাদেশেব সভ্যতাগুলির যোগাযোগ নানাভাবে গড়ে উঠেছিল।

প্রদিন ইতিহাস ক্লাসে পলাশ দিদিমণিকে দাদ্র কথাগুলো বলল। দিদিমণি বললেন, হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে ঐ সমযের অন্যান্য সভ্যতার যোগাযোগের কথা আগেই জেনেছ। সেই যোগাযোগ তার প্রবতী সময়েও ছিল তবে যোগাযোগের নানা রক্ম দিক ছিল এবারে দিদিমণি বোর্ডে একটা ছক

আঁকলেন।



প্রাচীন মেসোপটেমিয়া অঞ্জল ও সুমের, ব্যাবিলন প্রভৃতি সভ্যতা

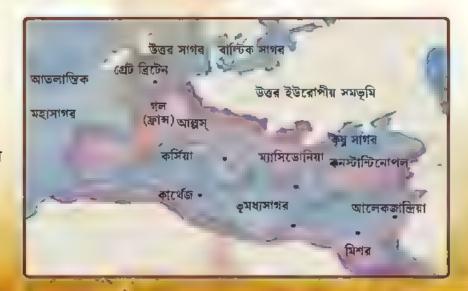


মিশরের নিম্নভাগ স্নের খাল আরব উপকৃল নীলানদ সাহারা মর্ভূমি মিশরের উজভাগ লোহিত সাগর

মানচিত্র.৯.১: প্রাচীন বিশ্বের

প্রাচীন মিশর অঞ্চল ও মিশরীয় সভ্যতা

প্রাচীন পারসিক সাম্রাজ্য





প্রাচীন চিন সভ্যতা

কয়েকটি সভ্যতা



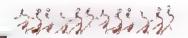
প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা



প্রাচীন রোমান সভ্যতা

্টুকস্ত্রে কথা এক নজরে প্রাচীন বিশ্বের বিভিন্ন সভ্যতা

□ টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীব মাঝখানেব অঞ্চলকে গ্রিকবা বলতো মেসোপটেমিয়া। ঐ শব্দটিব মধ্যবর্তী দেশ। □ প্রাচীনকালে এই অঞ্চলেব একটা অংশে ছিল সুমেবীয় সভাতা। □ সুমেবেব লিপি বলে কিউনিফর্ম। □ সুমেবেব লোকেবা গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও নানান জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করা লোকেবা প্রথম কাঠের চাকাব ব্যবহার শুবু করেছিল। □ সুমেব ছাডাও মেসোপটেমিয়ার আ সভ্যতা হলো ব্যাবিলনীয় সভ্যতা ব্যাবিলনেব বাজা হামুবাবি প্রথম লিখিত আইন চালু করে	াকে ইংরেজিতে ছ। □ সুমেরেব বেকটি বিখ্যাত
○ উত্তর পূর্ব আফ্রিকাষ নীল নদের তীর ববাবর ছিল প্রাচীন মিশবীয় সভাতা। গ্রিক ঐতিহাসিব মিশবকে বলেছিলেন নীলনদের দান। ○ মিশবের শাসকদের ফ্যারাও বলা হতো তাদের মৃত্যু পিরামিড বানানো হতো। ○ মিশবে প্যাপিবাস গাছের ছালে লেখা শৃরু হয়। প্যাপিবাস থেকেই কাশক পেপার এসেছে ○ বর্ণ ও ছবি মিলিয়ে মিশবে একবকম লেখার ব্যবহাব হতো তাকে মিশবী লিপি বলা হয ○ মিশবের ল্যাপিস লাজুলি পাথর ভারতীয় উপমহাদেশে আমদানি কবা হতো	দহ রাখার জনা গজেব ইংবেজি য হায়ারোগ্রিফ
 এশিয়া মহাদেশের পূর্বে হোয়াংহো ও ইয়াংসিকিয়াং নদীর অববাহিকায় ছিল প্রাচীন চিন সং কাগজ বানানোর ও কাঠেব হবফ বানিয়ে ছাপার কৌশলও চিনেই তৈরি হয়েছিল। ☐ বাইবের অ চিনেব শাসকরা পাঁচিল দিয়ে সাম্রাজ্য ঘিবে বেখেছিলেন সেই বিবাট পাঁচিলগুলিকে একসংখ্য বলা হয় ☐ চিনে বারুদের ব্যবহার হতো 	াক্রমণ ঠেকাতে
পাহাডে যেবা গ্রিসে অনেকগুলি ছোটো ছোটো বাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। সেগুলিকে বলা হতো নগব পলিসগুলিব মধ্যে বিখ্যাত ছিল এথেন্স ও স্পাটা। তাদেব সঙ্গো পাবসিক সাম্রাজ্যেব যুন্ধ হয়েছি কথা গ্রিক ঐতিহাসিক হেবোডোটাস এব লেখায় পাওয়া যায়। এথেন্স ও স্পাটা নিজেদেব মধ্যেও গ্রিক ঐতিহাসিক থুকিডাইডিস সেই যুন্ধের কথা লিখেছিলেন। প্রাচীন গ্রিক সভ্যতায় বিজ্ঞান, ইতি নানান জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা হতো। পাবসিক ও অন্যান্য সভ্যতার ছাপ গ্রিক সভ্যতায় পড়েছিল।	ল। সেই যুদ্ধেব যুদ্ধ কবেছিল।
পাবস্য উপসাগবেৰ উত্তবে গড়ে উঠেছিল বিবাট পাৰ্বসিক সাম্ৰাজ্য। সাম্ৰাজ্যেৰ সঙ্গে সঙ্গে পাৰ্ব্ছড়িয়ে পড়েছিল বিভিন্ন অঞ্বলে কুবুষ ও প্ৰথম দ্বায়বৌষ ছিলেন দুজন বিখ্যাত পাৰ্বসিক সং	, 2
ভূমধ্যসাগরেব ইটালিব উপকূল ঘিরে ছিল প্রাচীন রোমান সভ্যতা। ধীরে ধীরে রোমানরা বানিয়েছিল	ন, শিল্প-স্থাপত্য
এই সভ্যতাগুলির সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক, অ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল।	র্থনৈতিক ও



৯.১ ভারত ও বহির্বিশ্বের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম

প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের মানচিত্র খেষাল কবো। দেখবে যে, উত্তর-পশ্চিম দিকে বয়েছে বেশ কয়েকটি গিরিপথ উত্তর-পশ্চিমের ঐ গিরিপথগুলি ধবেই পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার সঙ্গে উপমহাদেশের যোগাযোগ ঘটত। অন্যদিকে হিমালয় পর্বতশ্রেণির গিরিপথ দিয়ে চিন ও তিব্বত-এর সঙ্গে যোগাযোগ বজায় ছিল। বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিমেব গিরিপথের মধ্যে দিয়েই বিদেশিরা উপমহাদেশে এসেছে। ঐ পথ ধবেই বিদেশি রাজনৈতিক শক্তিগুলি উপমহাদেশে ক্ষমতা কায়েম করেছে। আবার পাশাপাশি ঐ পথ ধরে ব্যবসাবাণিজ্যও চলেছে। সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানও হয়েছে তাছাডা সমুদ্রপথেও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিনিময় চলত।

৯.১.১ রাজনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যম

ভারতীয় উপমহাদেশে ইন্দো-ইরানীয়দের আগমন বিষয়ে আগেই আলোচনা হয়েছে। ভৌগোলিক কারণেই উত্তর-পশ্চিম অংশের স্থলপথ দিয়েই বেশিবভাগ বিদেশিজাতি ভারতীয় উপমহাদেশে এসেছিল। এদের মধ্যে অন্যতম ছিল পারসিকরা

ভারতীয় উপমহাদেশ ও পারস্যের যোগাযোগ

উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম দিকে ছিল গশ্বার গশ্বারের মধ্যে দিয়ে পারসিক সাম্রাজ্যের সঙ্গে উপমহাদেশের যোগাযোগ তৈবি হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয়ভাগে পারস্যের হখামনীষীয় শাসকবা গশ্বার অভিযান করেছিলেন। তাদের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন প্রথম দরায়বৌষ বা দরায়ুষ (খ্রিস্টপূর্ব ৫২২-৪৮৬ অব্দ)। তাঁর শাসন গশ্বার ছাডাও উপমহাদেশের বেশ কিছু অংশে ছড়িয়ে পডেছিল। তাঁর একটি লেখতে হিদুষ শব্দটি পাওয়া যায় সিন্ধু নদ থেকেই ওই শব্দটি তৈবি হয়েছিল। মনে হয় যে, নিম্ন সিন্ধু এলাকা দরায়বৌষের শাসনের মধ্যে ছিল।

গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের লেখা থেকে জানা যায় ইন্দুস বা ইন্ডিয়া ছিল পারসিক সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ বা স্যাট্রাপি। দরায়বৌষ নিম্ন সিন্ধু এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর দখল কায়েম করার জন্যই ঐ অঞ্চল জয় করেন। উত্তব-পশ্চিম ভারত ও উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশ পারসিক সাম্রাজ্যের সঞ্চো অনেকদিন যুক্ত ছিল।





পারসিক শাসক তৃতীয় দরায়বৌষ-এব (খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৬-৩৩০ অব্দ) সময়ে আলেকজান্ডার পারস্য অভিযান করেন। তাতে পারসিকরা হেরে যায়। ফলে হখামনীষীয় সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ে। গন্ধার ও নিম্ন সিন্ধু এলাকাতেও আর পারসিক অধিকার রইল না।



উপমহাদেশের সামান্য অংশেই পারসিক শাসন ছিল। কিন্তু ভাবতীয় উপমহাদেশেব রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে তার নানাবকম প্রভাব পরেও দেখা যায়। হখামনীষীয়বা প্রাদেশিক শাসক হিসেবে স্যাট্রাপদেব নিয়োগ কবতেন। পববর্তী সময় শক ও কুষাণ শাসকবাও স্যাট্রাপ ব্যবস্থা চালু বেখেছিলেন। তাদের সময় স্যাট্রাপবা হয়ে গিয়েছিল ক্ষত্রপ। তাছাড়া শাসকবা সবাসবি তাদের প্রজাদেব কাছে সবকারি আদেশ-নির্দেশ প্রচার কবতেন লেখর মাধ্যমে। পবে মৌর্য সম্রাট অশোক প্রায় একইভাবে সাম্রাজ্যে লেখর মাধ্যমে নিজেব বন্তব্য প্রচার কবতেন।

ভারতীয় উপমহাদেশ ও গ্রিসের যোগাযোগ

গ্রিক শাসক আলেকজান্ডার পৃথিবী জুড়ে এক বিরাট সাম্রাজ্য তৈরি করতে চেয়েছিলেন। তার জন্যই পারসিকদের সঞ্চো তাঁর যুন্ধ বাধে পারসিকদের হারিয়ে আলেকজান্ডার পৌছে যান ভারতীয় উপমহাদেশে উপমহাদেশে পারসিক শাসন শেষ হয় আলেকজান্ডারের অভিযানের ফলে। এবিষয়ে আগেই আলোচনা হয়েছে। আলেকজান্ডার বেশি দিন উপমহাদেশে ছিলেন না। ফলে ঐ অভিযানের প্রভাব ভারতীয় উপমহাদেশে খুব গভীরভাবে পড়েনি। আলেকজান্ডারের অভিযানের বিরুদ্ধে বেশ কিছু শাসক লডাই করেছিলেন। আবার অনেক শাসক গ্রিক বাহিনীকে সহযোগিতা করেছিল। তক্ষশিলার রাজা অন্তি আলেকজান্ডারেক সহযোগিতা করেন। তবে আলেকজান্ডারের অভিযানের ফলে ছোটো গেন্ডিগুলি নিশ্চিক্ত হয়ে গিয়েছিল। তার ফলেই মগধের ক্ষমতা বিস্তাব সহজ হয়





ছবি ৯ ৩: আলেকজান্ডাবেব একটি সোনাব মুদ্রাব দু পিঠ



ভারতীয় উপমহাদেশ ও মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ

মৌর্য শাসনের শেষ দিকেই ভারতীয় উপমহাদেশেব ইতিহাসে বেশ কিছু বদল ঘটেছিল পশ্চিম এশিয়া ও মধ্য এশিয়াব সঙ্গো উপমহাদেশেব বাজনীতি ও শাসন জড়িয়ে যাচ্ছিল উপমহাদেশেব উত্তব ও উত্তব-পশ্চিম অংশে গ্রিক, শক পহুবদেব শাসন দেখা গিয়েছিল। পুষ্যমিত্র সুঙ্গোব সময়েই গ্রিক বাজাবা বেশ কিছু অঞ্চল দখল কবেছিল। এই গ্রিক বাজাদের অনেকেই আদতে ব্যাকটিয়ার বাসিন্দা ছিলেন উপমহাদেশেব উত্তর পশ্চিম সীমান্তে ছিল বাহ্রীক দেশ বা ব্যাকট্রিয়া। এটি ছিল হিন্দুকুশ পর্বতমালার উত্তর-পশ্চিমে অর্থাৎ এখনকার

আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ।

সেই ব্যাকট্রিয়া খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকেব শেষ দিকে গ্রিক শাসক সেলিউকাসের অধীনে ছিল ব্যাকট্রিয়াব গ্রিক বাজাদেবই যবন বলা হয়েছে পুবাণ সাহিত্যে। উত্তব-পশ্চিম সীমাস্ত অঞ্চল, গন্ধাবের তক্ষশিলা পর্যন্ত ব্যাকট্রিয়াব গ্রিক শাসন ছিল। উপমহাদেশেব এই গ্রিক শাসকদেব বলা হয় ব্যাকট্রীয়-গ্রিক বা ইন্দো-গ্রিক শাসক



সেলিউকাসেব মুদ্রা

টুকন্ত্রে কথা মিনান্দার

<u>ঐ সময় ইন্দো-গ্রিক বাজাদের মধ্যে সবথেকে বিখ্যাত ছিলেন মিনান্দার। ব্যাকট্রিয়া এলাকায় তাঁব শাসন</u> ছিল প্রাচীন গন্ধাব ও কান্দাহাব অঞ্চলে মিনান্দাবেব শাসন ছিল ব্যাকট্রিয়াব কিছু অংশ ও উত্তব-প<mark>শ্চিম</mark> <mark>সীমান্ত এলাকা খানিকটা তাঁব অধীনে ছিল। বৌন্ধ সাহিত্যে তিনি মিলিন্দ নামে পরিচিত বৌন্ধ ভিক্ষ</mark> <mark>নাগসেনের প্রভাবে মিনান্দার বৌন্ধ ধর্ম নেন। নাগসেনকে মিনান্দার বেশ কিছু প্রশ্ন করেছিলেন সেই</mark> <mark>কথাবার্তা মিলিন্দপঞ্জহো বা মিলিন্দপ্রশ্ন</mark> বইতে রয়েছে। ঐ বই থেকেই জানা যায় মিনান্দারের বাজ<mark>ধানী</mark> ছিল সাকল বা এখনকাব পাকিস্তানেব শিয়ালকোট। তিনি বৌল্খধর্ম ছডিয়ে দেওয়ার উদ্যোগও নিয়েছি<mark>লেন।</mark>



ছবি ৯ ৫ গ্রিক শাসক মিনান্দাবেব মূদ্রা





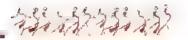


খ্রিস্টপূর্ব ১৩০ অব্দ নাগাদ মধ্য এশিয়াব যাযাবব গোষ্ঠীর আক্রমণে ব্যাকট্রিয়াব প্রিক শাসন শেষ হয় ঐ গোষ্ঠীব মধ্যে প্রধান ছিল স্কাইথীয়বা। উপমহাদেশে তারা সেক বা শক নামে পবিচিত ছিল। আব ছিল ইউয়ে-বি৷ বা কুষাণ। মধ্য এশিয়াব তৃণভূমি থেকে পশ্চিম দিকে এগিয়ে তারা ব্যাকট্রিয়ায় পৌঁছেছিল কাশ্মীব, সিন্ধু নদেব পশ্চিম তীবের এলাকা ও তক্ষশিলা শকদেব দখলে ছিল অন্যদিকে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকেব গোডাব দিকে কাবুল এলাকা পার্থীয়দেব হাতে চলে যায়। পার্থীয়রা ইবান থেকে উপমহাদেশে এসেছিল। পার্থীয়রাই উপমহাদেশে পত্রব নামে পরিচিত ছিল

শক শাসনের বাধা ছিল পহুব শাসকরা। পহুব রাজা গভোফারনেস আনুমানিক ২০ বা ২১ খ্রিস্টাব্দে শাসন শুবু কবেন। সম্ভবত শকদের হারিয়ে প্রাচীন গন্ধারের এক অংশ তিনি দখল করেন উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে পাঞ্জাবের কিছু অংশ এবং পুরো সিন্ধু উপত্যকা গভোফাবনেসের অধীনে ছিল। ফলে বিরাট অঞ্চলের শাসক হিসেবে তিনিও নিজের মুদ্রায় বাজাধিবাজ উপাধি ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর আমলে সেন্ট থমাস খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য উপমহাদেশে এসেছিলেন। কুষাণ শাসন শুরু হওয়ার ফলে শক ও পহুবদের ক্ষমতা কমে গিয়েছিল মূলত পশ্চিম ভারত ও দাক্ষিণাতোর উত্তর-পশ্চিম অংশে শক শাসন টিকে ছিল।

উপমহাদেশ ও বাইবের পৃথিবীর মধ্যে যোগাযোগের আরেক মাধ্যম ছিল দৃত বিনিময় মুলত মৌর্য সম্রাটদেব সময় থেকেই সেই দৃত বিনিময় শুরু হযেছিল। সেই দৃতেরা অনেকেই তাঁদের অভিজ্ঞতা লিখে রেখেছিলেন।





প্রিক শাসক সেলিউকাসের দৃত মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সভায় গিয়েছিলেন। ঐ একই সময়েই সেলিউকাসের দৃত হয়ে মৌর্য দরবারে গিয়েছিলেন ডায়ামাকাস। মিশরের শাসক টলেমি ডায়োনিসিয়াসকে পাঠিয়েছিলেন দৃত হিসেবে মৌর্যদের কাছে। মৌর্য সম্রাটরাও তাঁদের দৃত পাঠাতেন বিদেশি শাসকদের সভায়।

বিন্দুসাবেব সঙ্গে সিরিয়াব শাসক প্রথম অ্যান্টিওকস-এর যোগাযোগ ছিল।
বিন্দুসাব নাকি থ্রিক বাজার কাছে কয়েকটি জিনিস ও একজন পশুত চেয়েছিলেন। সিবিয়াব শাসক সব জিনিস পাঠালেও পশুত পাঠাননি। এই ঘটনা কতটা বাস্তব তা নিয়ে প্রশ্ন বয়েছে। তবে বোঝা যায় পশ্চিম এশিয়াব খ্রিকদেব সঙ্গে মৌর্যরা ভালো সম্পর্ক বজায় বাখার চেষ্টা কবেছিল।

সম্রাট অশোক উপমহাদেশেব বাইরে বৌষ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন। সিরিয়া, মিশব, ম্যাসিডন, সিংহল প্রভৃতি জায়গায় অশোক দৃত পাঠিয়েছিলেন। রাজগৃহে পাওয়া একটি লেখ থেকে হর্ষবর্ধনের সময় চিনের সঞ্চো দৃত বিনিময়ের বিষয়ে জানা যায়।



्रेयाखा याथा

হুণ আক্ৰমণ

আনুমানিক খ্রিস্টাব্দে সম্ভবত উত্তব-পশ্চিম দিক দিয়ে ভারতীয় হুণরা উপমহাদেশে অভিযান ক্রেছিল। ক্ষুৰ্পান্তের শাসন কাল। তিনি অভিযানকে সফলভাবে আটকে দিতে পেরে ছিলেন। তাবপব অনেক দিন হুণ অভিযান উপমহাদেশে হয়নি পঞ্জম শতকেব শেষ ও ষষ্ঠ শতকেব গোড়ায় হুণবা আবার শক্তিশালী হয়। সেসময় তাদেব নেতা ছিলেন তোবমান মিহিরকুল এবং উপমহাদেশের কিছু অঞ্জলে তোরমানের শাসন ছিল তোরমানেব ছেলে মিহিরকুল (४२० ६०६चि) ছিলেন ক্ষমতাবান শাসক। হুণবা গুপ্ত শাসনেব পক্ষে সমস্যা र्य माफि सिहिल হুণশাসনের ফলে উত্তর পশ্চিম ভাবতেব সঙ্গে মধ্য এশিয়ার স্থল-বাণিজ্যে ভাটা দেখা দেয়

মনে রেখো

শক শাসক প্রথম অয়
একটি অব্দ চালু
করেছিলেন সেই
অব্দটি অয়অব্দ এবং
বিক্রমাব্দ দুই নামেই
পরিচিত। কান্দাহার
থেকে উত্তর -পশ্চিম
সীমান্তের এলাকায়
প্রথম অয়-ব অধিকার
ছিল আন্তে আন্তেশক
শাসন উত্তর ভারতে
এবং গদগা উপত্যকায়
ছিডিয়ে পডেছিল।

৯.১.২ অর্থনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যম

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে উপমহাদেশেব সঙ্গে বাইবেব দেশেব বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল খ্রিস্টপূর্ব ২০০ থেকে খ্রিস্টীয় ৩০০ অব্দেব মধ্যে সেই বাণিজ্যিক যোগাযোগ সবথেকে বেডেছিল দক্ষিণ এশিয়াব সঙ্গে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া এবং ভূমধ্যসাগবীয় অঞ্চলের লেনদেন চলত জিলপথ ও স্থলপথে ঐ যোগাযোগ হতো। রোম সাম্রাজ্যে ও ভূমধ্যসাগরেব পূর্বদিকে চিন ও ভারতেব নানা জিনিসেব চাহিদা ছিল। এদেব মধ্যে সবথেকে বেশি কদব ছিল চিনা রেশমেব। তাকলামাকান মবুভূমিকে এড়িয়ে দুটি পথে চিনা রেশম নিয়ে যাওয়া হতো। ঐ পথদুটি কাশগড়ে গিয়ে মিশত। সেখান থেকে বিভিন্ন পথ পেবিয়ে রেশম পৌছে যেত ভূমধ্যসাগরের পূর্বদিকের এলাকায়। রেশম ছিল ঐ স্থলপথগুলিব প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য তবে সেইসময়ে রেশম পথ বলে কোনো নাম ছিল না। অনেক পবে খ্রিস্টীয় উনিশ শতকে ঐ পথকে বেশম পথ বলা হতো। এই বিবাট অঞ্চলেব কিছু অংশ এক সময় পার্থীয়দেব দখলে ছিল। পবে কুষাণবা ব্যাকট্রিয়া দখল কবেন। তাব ফলে বেশম পথেব একটি শাখা দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় বেশম বাণিজ্য থেকে কুষাণ শাসকরা অনেক শৃক্ষ আদায় করতেন। ঐ ব্যবসাব সঙগে যুক্ত বিভিন্ন অঞ্জলেব মানুষ উপমহাদেশেব উত্তর ও উত্তব-পশ্চিম প্রান্তে জড়ো হতেন

> ছবি ৯ ৬ ইউমেন পাস, গোৰি মবুভূমি অঞ্চলে বেশম পথেব একটি শৃক্ক কেন্দ্ৰ

টুকন্ত্রে কথা পেরিপ্লাস ও মৌসুমি বায়ু

ভারত মহাসাগব, লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরকে প্রাচীন গ্রিক ও রোমান ভূগোলে ইরিপ্রিয়ান সাগর বলা হতো সেই ইরিপ্রিয়ান সাগরে যাতায়াত ও বাণিজ্য বিষয়ে একটি বই লেখা হয়েছিল। তার নাম পেরিপ্লাস অভ দ্য ইবিপ্রিয়ান সী। পেরিপ্লাস কথাটাব দুটো মানে হয় জলয়ানে করে ঘুরে বেড়ানো। আবাব জলপথে যাতায়াতেব বর্ণনা। সেভাবে ধবলে বইটির নামেব বাংলা মানে হতে পারে ইবিপ্রিয়ান সাগরে প্রমণ বইটিব লেখকের নাম জানা যায় না। বইটি গ্রিক ভাষায় লেখা। বইটিব লেখক একজন গ্রিক, যিনি মিশরে থাকতেন।

বইটি লেখক নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই লিখেছিলেন তাই বইটিতে ইরিথ্রিয়ান সাগরেব বন্দর ও ব্যবসাবাণিজ্যের নানা বিষয়ে খুঁটিনাটি বর্ণনা রয়েছে। বণিকদের সুবিধার জন্য লেখা হয়েছিল বইটি। থ্রিস্টীয় প্রথম শতকে মাঝামাঝি সময়ে বইটি লেখা হয়েছিল বলে মনে হয়। তার সঙ্গে বয়েছে বিভিন্ন অঞ্জলের মানুষজন, সমাজ, গাছপালা, পশু-পাখি বিষয়েও নানা কথা। এই বইটি থ্রিস্টীয় প্রথম শতক



সমুদ্র বাণিজ্যে ভারতীয় উপমহাদেশের দুই উপকৃলের বন্দরগুলি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। পশ্চিম উপকৃলের বন্দরগুলির সঙ্গে রোমের বাণিজ্য চলত। পশ্চিম উপকৃলের সেরা বন্দর ছিল নর্মদা নদীর মোহনায় ভূগুকছে। উত্তরের কোজ্বন উপকৃলে বেশ কয়েকটি বন্দর ছিল। তার মধ্যে বিখ্যাত ছিল কল্যাণ বন্দর। শক শাসক নহপান ঐ বন্দরটি অবরোধ করেছিলেন। মালাবার উপকৃলের বন্দরগুলি দিয়ে গোলমরিচ ও অন্যান্য মশলার বাণিজ্য চলত এখনকার তামিলনাড়ু উপকৃলেও ছিল বেশ কিছু বন্দর। কাবেরী ব-দ্বীপ এলাকায় বিখ্যাত বন্দর ছিল কাবেরীপট্টিনম অস্ত্র উপকৃলেও কয়েকটি বন্দরের কথা জানা যায়। সেখানে সম্ভবত জাহাজ ছাড়ার জায়গাও ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিযার সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে পুরো পূর্ব উপকৃলের গুরুত্ব ছিল।

<mark>१११</mark> ভেবে দেখো

এই পুরো বই জুডে
প্রাচীন বাংলাব কোন
কোন অঞ্চলের নাম
বয়েছে তার একটা
তালিকা বানাও ঐ
অঞ্চলগুলি কী কী
কারণে বিখ্যাত ছিল?

টুকান্ত্রে কথা বন্দর-নগর : তাম্রলিপ্ত

প্রাচীন ভাবতীয় উপমহাদেশের একটি পরিচিত বন্দব-নগব ছিল তাম্রলিপ্ত।
তাম্বলিপ্তি, দামলিপ্ত প্রভৃতি নামেও এই নগবের পবিচয় দেওয়া হতো বিদেশি
লেখকদের বর্ণনায় তামালিতেস (গ্রিক) নামও পাওয়া যায়। খ্রিস্টীয় সপ্তম-অস্টম
শতক পর্যন্ত এই সামুদ্রিক বন্দরের কাজকর্ম জারি ছিল। সুয়ান জাং বলেছেন,
তাম্রলিপ্ত সমুদ্রের একটি খাঁডিব উপরে বয়েছে। সেখানে স্থালপথ ও জলপথ
এসে মিশেছে। সম্ভবত, সেটি ছিল এখনকার পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকেব
কাছাকাছি ঐ বন্দর থেকেই ফাসিয়ান জাহাজে উঠেছিলেন। স্থালপথেও
তাম্রলিপ্ত যাতায়াত করা সহজ ছিল বাণিজ্য ছাডা তাম্রলিপ্ত নগর পডাশোনাব
কারণেও বিখ্যাত ছিল। তবে নদীখাত শুকিষে যাওয়াব ফলে বন্দর-নগরটির
গুরুত্ব কমতে থাকে। নগর হিসাবেও তার খ্যাতি নম্ভ হয়।

৯ ১.৩ সাংস্কৃতিক যোগাযোগের মাধ্যম

উপমহাদেশের সঞ্চো বাইরেব বিভিন্ন অঞ্চলেব যোগাযোগেব আরেক মাধ্যম ছিল সাংস্কৃতিক বিনিময়। বিভিন্ন জাতি-উপজাতিব মেলামেশাব মাধ্যমে ঐ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ হতো। এব ফলে উপমহাদেশেব সংস্কৃতিতে নানা বৈচিত্র্য তৈবি হয়েছিল। পাশাপাশি ঐ জাতি-উপজাতিগুলিব অনেকে মিশে গিয়েছিল উপমহাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে।

পাবসিক সাম্রাজ্যেব অধীন এলাকাগুলিতে আবামীয় ভাষা ও লিপি চলত। উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম অংশে ঐ ভাষা ও লিপি ব্যবহার ছিল। পরবর্তীকালে সম্রাট অশোকও ঐ অঞ্বলে আরামীয় ভাষা ও লিপি ব্যবহার কবেন। ঐ আবামীয় লিপি থেকে সম্ভবত খবোষ্ঠী লিপি তৈরি হয়েছিল। দুটি লিপিই ডানদিক থেকে বাঁ দিকে লেখা হতো। পাবসিক শাসকবা উঁচু পাথবের স্তম্ভ বানাতেন। সম্ভবত তাব প্রভাব পডেছিল মৌর্য শাসকদের উঁচু পাথরের স্তম্ভ বানানোর ভাবনায় আলেকজান্ডার পারসিক সাম্রাজ্যের পার্সিপোলিস নগরী ধ্বংস করে দেন। তার ফলে পারসিক শিল্পীরা অনেকেই উপমহাদেশে চলে আসতে বাধ্য হন ঐ শিল্পীদের হাতে ইন্দো-পাবসিক স্থাপত্য শিল্প শুরু হয়েছিল।

আলেকজান্ডাব ভাবতীয় উপমহাদেশে কয়েকটি নগর তৈরি করেছিলেন। মৌর্য সাম্রাজ্যের সময়ও সেই নগরগুলি ছিল। সেগুলিতে গ্রিকরা থাকত। ধীরে

431.324333

ধীবে ঐ গ্রিকরা উপমহাদেশের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির সঞ্চো মিশে যায়।
তারা বৌদ্ধধর্মের চর্চাও করতে থাকে। অন্যদিকে গ্রিকদের থেকে নতুন
ধরনের মুদ্রা তৈরি করতে শিখেছিল উপমহাদেশের মানুষ। ইন্দো-গ্রিকরা
উপমহাদেশে সোনার মুদ্রা চালু করেন। বিজ্ঞান বিশেষত গণিত ও
জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে গ্রিক ও ভারতীয় ভাবনাচিন্তার বিনিময় দেখা
যায় তাছাড়া ঐ সময় গ্রিক প্রভাবিত শিল্পের চর্চাও শুবু হয়েছিল। যার অন্যতম
উদাহরণ হলো গন্ধার শিল্প।

ুকান্ত্রা কথা গন্ধার শিল্প

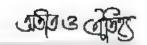
গাশার প্রদেশে নানা কারণে বিভিন্ন জাতিব মেলামেশার সুযোগ ছিল। সেই মেলামেশার ছাপ ঐ অঞ্চলের শিল্পেও পড়েছিল বৌন্ধ ধর্মকে ঘিরে গাখার শিল্প গড়ে উঠেছিল। আগে বৃন্ধের মূর্তি বানানো ও পুজো করা নিষিশ্ব ছিল। গাখারের শিল্পীবা নতুন ধরনের বৃন্ধ মূর্তি তৈরি করেন। নাক টিকালো, টানা ভুবু ও আধরোজা চোখ মূর্তিগুলির বৈশিষ্ট্য। মূর্তির পায়ের জুতোগুলিও রোমান জুতোর মতো দেখতে হতো। সোনালি বংযের ব্যবহাবও মূর্তিগুলিতে দেখা যায়। সবমিলিয়ে গাখার শিল্পে গ্রিক ও রোমান শিল্পের ছাপ দেখা যায়। যদিও গাখার মূর্তিগুলিব পিছনে ভারনাচিন্তা ছিল ভারতীয় বীতির। পাশাপাশি ইরানীয় ও মধ্য এশীয় শিল্পের ছাপও গাখার শিল্পে পড়েছিল গাখার অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থার কারণে নানান শিল্পের প্রভাব সেখানে মিলেমিশে গিয়েছিল।

শক শাসকবা নানাবকম বুপোর মুদ্রা চালু করেন কয়েকটি মুদ্রায় গ্রিক ও প্রাকৃত দুই লিপিতেই লেখা হতো। শক শাসক মোগ নিজের মুদ্রায় রাজাতিরাজ উপাধিও ব্যবহাব করেন। এই উপাধিটি খেয়াল রাখা দবকাব রাজাধিরাজ থেকেই উপাধিটি এসেছে। শক শাসক বুদ্রদামনেব জুনাগড প্রশস্তি সংস্কৃত ভাষায় রচিত প্রথম বড়ো লেখ তাব আগে সব লেখই প্রাকৃত ভাষায় রচিত

শক-পহুব ও কুষাণদের জীবনযাপনেব নানা উপাদান উপমহাদেশেব জীবনযাপনে ছাপ ফেলেছিল। আবাব তাবাও উপমহাদেশেব সমাজ-সংস্কৃতি, ধর্ম থেকে অনেক কিছু নিয়েছিল। যুষ্ধবীতি, পোশাক, ঘব-বাড়ি ও সংস্কৃতিব নানা কিছুতেই সেই বিনিময়েব নজির আছে।

শক-পহুবরা যুদ্ধে যোড়ার ব্যবহারকে উন্নত কবেছিল। পহুবরা চলস্ত যোড়ায় বসে পিছনে যুরে তিব ছোঁড়ার কাষদা চালু করে। উপমহাদেশে ঘোড়াব





्रेकाता कथा

জ্যোতির্বিজ্ঞান-চর্চায় বিনিময়

ভাবতীয়, গ্রিক, ব্যাবিলন ও বোমান জ্যোতি বিজ্ঞান চর্চা একে অন্যেব উপব প্রভাব ফেলেছিল জোতির্বিজ্ঞানচর্চার একটি বিখ্যাত বই ছিল যবনজাতক। বইটি আদতে গ্রিক ভাষায় লেখা। আনুমানিক ১৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সেটি সংস্কৃতে অনুবাদ করা হয়। তাই তার নামে যবন কথাটা পাওয়া যায়। এর খেকে গ্রিক ও ভারতীয় বিজ্ঞানের দেওয়া - নেওয়াব বিষয়টা বোঝা যায় বরাহমিহিরের পঞ্জ-**''সিন্ধান্তিকা** বইটিতেও সেই প্রভাবেব নজিব त्राष्ट्र. সেখানে ববাহমিহির জ্যোতি বিজ্ঞান বিষয়ে পৌলিশ ও রোমক সিন্ধান্তগুলি আলোচনা করেছেন পৌলিশ সিম্পান্তটি **থিস** ও বোমক সিন্ধান্তটি রোম থেকে এসেছিল।

লাগাম ও জিনের ব্যবহার শুরু করেছিল শক পহুবরা কুষাণবাও ঘোডায় চডে যুন্ধ কবতে খুব পটু ছিল।

শক-কুষাণবা উপমহাদেশে নানাবকম পোশাক চালু করেছিল যেমন, জামা, পাজামা, লম্বা জোব্বা, বেল্ট, জুতো প্রভৃতি।শকও কুষাণ আমলে নগবের পাঁচিলগুলি তৈবি হতো ইট দিয়ে। তাছাডা একধবনেব লাল মাটিব পাত্র কুষাণ আমলে বানানো হতো। ঐ মাটিব পাত্র বানাবার পশ্বতি মধ্য এশিয়া থেকে উপমহাদেশে এসেছিল।

মধ্য এশিয়া থেকে আসা এইসব শাসকবা অনেকেই বিষুৱ উপাসক হয়ে পড়েন আবার অনেকে বৌদ্ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। কুষাণরা শিব, বিষু ও বুদ্ধেব উপাসনা করেছিলেন। কুষাণদের মুদ্রায় গ্রিক, রোমান ও ভারতীয় বিভিন্ন দেব-দেবীর মুর্তি খোদিত ছিল। আগে গৌতমবুদ্ধের কোনো মূর্তি পুজো হতো না। বুদ্ধেব কোনো প্রতীক বা চিহ্নকে সামনে বেখে পুজো কবা হতো।

উপমহাদেশেব নাটকের চর্চার উপরেও গ্রিক প্রভাব পড়েছিল। নাটকের মঞ্চ বানানো, পর্দার ব্যবহার প্রভৃতি ক্ষেত্রে সেই প্রভাব দেখা গিয়েছিল নাটকের পর্দাকে সংস্কৃতে *যবনিকা* বলা হয়। গ্রিকরাই এই পর্দা ফেলার প্রথা চালু করেছিল। তাদের যবন নাম থেকেই যবনিকা শব্দটি তৈরি হয়েছিল। সাহিত্যচর্চার প্রতিও এই শাসকদের অনেকে উৎসাহী ছিলেন।

ধীরে ধীরে এইসব বিদেশি জাতি-উপজাতিগুলি উপমহাদেশেব সমাজে মিশে গিয়েছিল তাদেব ক্ষত্রিয় বা যোশ্বশ্রেণি বলে মনে কবা হতো। তবে ব্রায়ণদের চোখে তাবা ছিল নীচু শ্রেণির ক্ষত্রিয়।

বৌন্ধর্মম ভারতীয় উপমহাদেশের সঞ্চো বাইবেব জগতের যোগাযোগেব আরেকটি মাধ্যম ছিল অনেক পণ্ডিত শিক্ষক উপমহাদেশ থেকে বিভিন্ন দেশে যেতেন, শিক্ষা দিতেন। বৌন্ধধর্ম ও শিক্ষার চর্চা করতে বাইবে থেকে শিক্ষার্থীবাও আসতেন। ঐসব দেশের মধ্যে চিন দেশে বৌন্ধধর্ম ও শিক্ষার চর্চা সবথেকে জনপ্রিয় হয়েছিল। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক থেকে চিন দেশে বৌন্ধধর্মেব প্রচাব বেডেছিল

ভাবতীয় উপমহাদেশের কাশ্মীর অঞ্চলে বৌন্ধধর্ম ও শিক্ষার চর্চা হতো।
বৃন্ধয়শ ছিলেন তেমনই একজন কাশ্মীরি বৌন্ধ পণ্ডিত পড়াশোনা শেষে তিনি
মধ্য এশিয়াব কাশগড়ে চলে যান কুমারজীবের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল।
পণ্ডিত পবমার্থও চিনে গিয়েছিলেন পড়াশোনার কারণে। অনেক বৌন্ধ সাহিত্য
সঙ্গো নিয়ে ৫৪৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি চিনে পৌছোন বাকি জীবন সেখানেই থেকে
বৌন্ধধর্ম ও শিক্ষাচর্চা কবেন।

টুকন্ত্রে কথা কুমারজীব

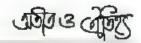
ছবি ৯৮ কুমাবজীবের মৃর্তি, কিজিল গৃহা, কৃচি প্রদেশ, চিন

কুমারজীবের বাবা কুমারায়ান কুচিতে চলে গিয়েছিলেন। কুচিব রাজা তাঁকে রাজগুরুর পদ দিয়েছিলেন। কুমারজীবের জন্মের পরে তাঁর মা জীব বৌন্ধ হয়ে যান। ফলে ন-বছরের কুমাবজীব (৩৪৩ খ্রিস্টান্দ- ৪১৩ খ্রিস্টান্দ) মায়ের সঙ্গো চলে যান কাশ্মীরে। সেখানে বন্ধুদন্তেব কাছে তিনি বৌন্ধ্বর্ম ও সাহিত্য বিষয়ে পড়াশোনা কবেন। পড়াশোনা শেষে মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘোরেন কুমারজীব ততদিনে পশুত হিসেবে তিনি বিখ্যাত হয়েছেন কিছু দিন পরে চিনের শাসক কুচি আক্রমণ করেন। কুমারজীব তখন কুচিতে ছিলেন। ৩৮৩ খ্রিস্টান্দে কুমারজীবকে কুচি থেকে কান-সু প্রদেশে নিয়ে যাওয়া হয়। চিন সম্রাটের অনুবোধে ৪০১ খ্রিস্টান্দে তিনি চিনেব রাজধানীতে যান। পরবর্তী এগারো বছর কুমাবজীব চিনেব রাজধানীতেই ছিলেন বৌন্ধ্বর্ম বিষয়ক পড়াশোনাতেই তাঁর জীবন কেটেছিল সংস্কৃত ও চিনা দু-ভাষাতেই কুমারজীব দক্ষ ছিলেন। ফলে অনুবাদের কাজ খুব সহজেই তিনি কবতে পারতেন। চিনে বৌন্ধ্বর্ম ও দর্শন প্রচারের ক্ষেত্রে কুমাবজীবের ভূমিকা বিখ্যাত।

ভাবত থেকে চিনে শিক্ষকদের যাতায়াতের ফলে ভাবতীয় সংস্কৃতি ও বৌল্ধর্ম বিষয়ে চিনের উৎসাহ তৈরি হয়। সেই উৎসাহের ফলেই চিন থেকে বেশ কিছু মানুষ ভাবতে আসতে থাকেন। তাঁবা ভাবতে পড়াশোনা করেছিলেন এবং বিভিন্ন বৌল্ধধর্মকেন্দ্রগুলি ঘুরেও দেখেছিলেন। তাও-নান নামেব এক চিনা পণ্ডিত বৌল্ধ সন্ম্যাসীদের ভাবতে আসাব উৎসাহ দিয়েছিলেন তার রেশ ধরেই ভাবতে এসেছিলেন ফাসিয়ান। ৩৯৯ খ্রিস্টাব্দে পাঁচজন সহসন্ম্যাসী সমেত ফাসিয়ান ভাবতে পৌছোন। তিনি কাশ্মীব হয়ে ভাবতীয় উপমহাদেশে এসেছিলেন। পরে উত্তর ভারতেব বহু অঞ্চল ঘুবে দেখেছিলেন তিনি। তিন বছর পাটলিপুত্রে থেকে বৌল্ধ ধর্ম ও সংস্কৃত সাহিত্যচর্চা করেছিলেন ফাসিয়ান। দু-বছব তিনি তাম্রলিপ্ততেও ছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা ফো-কুয়ো-কি বইতে তিনি লিখেছিলেন। দেশে ফেরাব সময় ভারত ও সিংহল থেকে অনেক বৌল্ধপুঁথি নিয়ে গিয়েছিলেন ফাসিয়ান।

ফাসিয়ানের পরে আরও অনেক পশুতই চিন থেকে উপমহাদেশে পড়াশোনাব জন্য এসেছিলেন। তাঁরা অনেকেই নালন্দা মহাবিহারে থেকে পড়াশোনা করতেন। বৌল্ধ ধর্ম ও সাহিত্যের পাশাপাশি ব্রাপ্মণ্য ধর্ম বিষয়েও চর্চা হতো। তাছাড়া বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিষয়ও শিক্ষা নিতেন তাঁবা।

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে প্রথম দিকে চিন থেকে উপমহাদেশে এসেছিলেন সুয়ান জাং ৬৩০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তিনি উপমহাদেশে পৌছোন। হর্ষবর্ষন ৩খন কনৌজ শাসন করছিলেন পরবর্তী চোদ্দো বছব বিভিন্ন অঞ্জল ঘুরে বেড়ান সুয়ান জাং। নালন্দা মহাবিহারে পণ্ডিত শীলভদ্রের কাছে পড়াশোনা করেন তিনি।



মানচিত্র ৯.২ : ফাসিয়ান ও সুয়ান জাং-এর ভারতীয় উপমহাদেশে ভ্রমণ পথ



ভেবে দেখো



>। বেমানান শব্দটি খুঁজে বের করো:

- ৯০০ ভূগুকছ, কল্যাণ, সোপারা, তাম্রলিপ্ত।
- বৃশ্বযশ, কুমারজীব, পরমার্থ, সুয়ান জাং।
- আলেকজান্ডার, সেলিউকাস, কনিষ্ক, মিনান্দার।

২। ক-স্তত্তের সভেগ খ-স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো:

ক-স্তম্ভ	খ-স্তম্ভ
নকস-ই রুস্তম	সিরিয়া
ভূগুকচ্ছ	প্রথম দরায়বৌষ
প্রথম অ্যান্টিওকস	নৰ্মদা নদী

সঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

- ৩.১) হেরোডোটাসের মতে ইন্দুস ছিল পারসিক সাম্রাজ্যের একটি (প্রদেশ /দেশ/ জেলা)।
- ৩.২) ইন্দো-গ্রিক বলা হতো (শকদের/ব্যাকট্রিয়ার অধিবাসীদের/ কৃষাণদের)।
- ৩.৩) সেন্ট থমাস খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য ভারতীয় উপমহাদেশে এসেছিলেন (আলেকজান্ডার/ মিনান্দার/ গন্ডোফারনেস)-এর আমলে।

8। নিজের ভাষায় ভেবে লেখো (তিন/চার লাইন):

- 8.১) আলেকজান্ডারের ভারতীয় উপমহাদেশে অভিযানের কি মৌর্য সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার উপরে কোনো প্রভাব ছিল ?
- ৪.২) শক-কুষাণরা আসার আগে ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে কী কী বিষয় খুঁজে
 পাওয়া যায় না।
- ৪.৩) প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের সঞ্চো অন্যান্য অঞ্চলের যোগাযোগের ক্ষেত্রে পড়াশোনার কী ভূমিকা ছিল বলে তোমার মনে হয়?

৫। হাতেকলমে করো:

- ৫.১) নবম অধ্যায়ের মুদ্রার ছবিগুলির সঙ্গে ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ের মুদ্রার ছবিগুলির মিল ও অমিলগুলি
 খুঁজে বার করো।
- ৫.২) ৯.২ মানচিত্রটি ভালো করে দেখো। ফাসিয়ান ও সয়য়ান জাং ভারতীয় উপমহাদেশের কোন কোন জায়গায় গিয়েছিলেন ? কোন কোন জায়গায় দুজনেই গিয়েছিলেন ? তার একটি তালিকা তৈরি করো।

তোমার পাতা



ইতিহাস পড়ার প্রথম অভিজ্ঞতা কেমন হলো? কতটা আনন্দ, কতটা মজা পেলে সেই পুরোনো দিনগুলোর কথা জেনে? আর কী কী থাকলে আরো মজায় ও আনন্দে ইতিহাস জানা যেত? তোমার সেসব ভাবনা এই পাতাটায় লিখে রাখো বছর শেষে

শিখন প্রাম্শ

- পশ্চিমবঙ্গা মধ্য শিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত বিদ্যালয়গুলির ষষ্ঠ শ্রেণিতে পৃথক বিষয় হিসাবে ইতিহাসচর্চা
 শুরু হবে। সেই মতো পঠন-পাঠনের জন্য অতীত ও ঐতিহ্য বইটি ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের
 সামনে উপস্থাপিত করা হলো।
- ২০০৫ সালে প্রণীত জাতীয় পাঠক্রমের র্পরেখা (ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক, ২০০৫)-র নির্দেশ
 অনুযায়ী এই বইয়ের বিষয়বস্তু প্রস্তুত করা হয়েছে। যথাসম্ভব সহজ ভাষায়, ছবি, তালিকা এবং মানচিত্রের
 সাহায্যে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন যুগের ইতিহাসের (প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আনুমানিক
 খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত) নানা দিক এই বইয়ে আলোচিত হয়েছে।
- এই বইটি ন-টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত। শিক্ষার্থীরা প্রথম থেকে নবম অধ্যায়ের দিকে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে যেতে পারে। অথবা বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অন্যভাবেও অধ্যায়গুলি সাজিয়ে নিতে পারে। বইতে মূল উচ্চারণের দিকে নজর রেখে নানা স্থান ও ব্যক্তিনাম এবং সিন্ধু নদের পাঁচটি নদীর নাম ব্যবহার করা হয়েছে। প্রয়োজনবােধে ছাত্রছাত্রীদের পরিচিত অন্য নামগুলিও বলা যেতে পারে য়েমন: ক) ইন্দাস / সিন্ধু, ঝিলাম/ বিতন্তা, চেনাব/ চন্দ্রভাগা, সাটলেজ/ শতদ্রু, রাভি/ ইরাবতী, বিয়াস/ বিপাশা। খ) মূল চিনা ভাষার উচ্চারণ বজায় রেখে নিস্নোক্ত নামগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। য়েমন-ফা হিয়েন /ফাসিয়ান, হিউয়েন সাঙ/সুয়ান জাং। গ) ছাত্র-ছাত্রীদের অসুবিধা যাতে না হয় তার জন্য প্রাক, ঋক্ প্রভৃতি শব্দে হসন্ত (্) চিক্ত ব্যবহার করা হয়ন।
- বইয়ের মূল ধারাবিবরণীর পাশাপাশি ৮৫টি 'টুকরো কথা' শীর্ষক অংশে আলাদা করে নানা বৈচিত্রাময়
 বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে। এসবই আগ্রহী শিক্ষার্থীকে বিষয়ের প্রতি আরো আকৃষ্ট করার জন্য রাখা
 হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা এগুলির সাহায়্যে শিক্ষার্থীকে বিষয়ের প্রতি মনোযোগী করে তুলতে পারবেন,
 তাদের কল্পনাশন্তিকে প্রসারিত করতে পারবেন। তবে নিরস্তর মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সাধারণত এগুলিকে
 পরিহার করে চলাই ভালো। এই অংশগুলি থেকে মূল্যায়নে প্রশ্ন রাখা যাবে না। শ্রেণিকক্ষে কল্পনাধর্মী
 ও তুলনামূলক আলোচনায় সেগুলি কাজে লাগানো য়েতে পারে। এর মধ্যে ২১, ৩৯, ৫২, ৫৬, ৭৪,
 ৯২, ১০৮, ১১২, ১২১ এবং ১৪৪ পৃষ্ঠার 'টুকরো কথা' অংশগুলিকে ব্যতিক্রমী বলে ধরতে হবে।
 এগুলি থেকে মূল্যায়নে প্রশ্ন রাখা য়েতে পারে।
- এই বইটির ছবিগুলি কোনো বিচ্ছিন্ন ছবি নয়। ছবিকে সব সময়েই বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে
 হবে। ছবিগুলি মূল পাঠ্যবিষয়বস্তুরই অঙ্গ।
- বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে মানচিত্রের ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলি দিয়ে এক-একটি য়ৄগের রাজনৈতিক,
 অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি বোঝা সহজ হবে।
- ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সাল-তারিখ। সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের (প্রথম অধ্যায়ে) প্রাথমিক
 কিন্তু বিস্তারিত ও সহজবোধ্য ধারণা দেওয়া হয়েছে। বইটিতে শিক্ষার্থীদের নীরস ভাবে সাল-তারিখ
 মুখস্থ করার উপর জাের দেওয়া হয়নি। রাজা-রাজড়াদের নামের তালিকা শিক্ষার্থীরা মুখস্থ করবে
 এমন কােনাে দাবিও আমাদের নেই। সাধারণভাবে শাসকবংশগুলির বিশদ এবং ধারাবাহিক ইতিহাসের

বিবরণ এখানে বাদ রাখা হয়েছে। তবে কালানুসারে ইতিহাসের পরিবর্তনের একটি ধারণা যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গড়ে ওঠে তার জন্য কোনো একটি কালপর্বের মূল দিকগুলিকে এখানে চিহ্নিত করা হয়েছে।

- অনেক পাতার এক পাশে শিক্ষার্থীদের জন্য জায়গা রইল। পাঠ্যবিষয়ে তাদের নিজস্ব ভাবনাচিন্তা
 তারা সেখানে লিখে রাখবে। আশা রইল প্রথম দিনেই শিক্ষক-শিক্ষিকারা সে বিষয়ে তাদের ওয়াকিবহাল
 করে দেবেন।
- দ্বিতীয় অধ্যায়ে আদিম মানুষের নানারকম শীর্ষক টুকরো কথায় মানুষের বিবর্তনের চারটি মূল পর্বের
 কথা বলা হয়েছে। যদিও ঐ পর্বগুলির মধ্যে মধ্যে আরও অনেকগুলি পর্ব রয়েছে। আগ্রহী শিক্ষার্থীদের
 প্রয়োজনে শিক্ষক/শিক্ষিকারা সেই পর্বগুলিও সহজ সাবলীলভাবে তুলে ধরতে পারেন।
- প্রয়োজনবোধে বিদ্যালয়ের কোনো নির্দিষ্ট স্থানে/শ্রেণিকক্ষে ইতিহাসের মানচিত্র, চার্ট ও তালিকা,
 মডেল, ছবি সংগ্রহ করে সেসব নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সুবিধা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদেরও
 বিভিন্ন সূত্র থেকে ছবি সংগ্রহ/বিবরণ প্রদর্শনে উৎসাহিত করা যেতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের মনে স্থাপত্য-ভাস্কর্য-শিল্প সম্পর্কে উৎসাহ তৈরির জন্য স্থানীয় ঐতিহাসিক স্থান ও প্রভুম্থল এবং প্রয়োজন বোধে সংগ্রহালয় (মিউজিয়ম) প্রভৃতি স্থানে নিয়ে যাওয়া য়েতে পারে।
- বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ের বিষয় নিয়ে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতর্ক প্রতিয়োগিতা, আলোচনা
 সভা করা য়েতে পারে।
- পঠন-পাঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অভগ বছরভর নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন (CCE)। এর জন্য প্রয়োজন নানা রকমের কৃত্যালি ও অভিনব তথা সৃজনশীল প্রশ্নের চয়ন। অধ্যায়ের ভিতরে ভেবে বলো শীর্বক এবং অধ্যায়ের শেষে ভেবে দেখো খুঁজে দেখো-র অন্তর্গত হাতেকলমে শীর্বক কৃত্যালিগুলি (Activities) শ্রেণিকক্ষে প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়ন (Formative Evaluation)-এর কাজে ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে নমুনা অনুশীলনী 'ভেবে দেখো খুঁজে দেখো' দেওয়া আছে, তার আদলে শিক্ষক/ শিক্ষিকাগণ নিজেরাই প্রশ্নসন্তার তৈরি করে নিতে পারবেন। এই অনুশীলনীগুলি সেই কাজে দিক নির্দেশ করছে মাত্র। মানচিত্র এবং ছবি দিয়েই সরাসরি প্রশ্ন রাখা যেতে পারে শিক্ষার্থীদের সামনে। প্রথম অধ্যায় থেকে কোনো প্রশ্ন অনুশীলনীতে রাখা হয়নি। মূল্যায়নের সময় এই অধ্যায় থেকে প্রশ্ন রাখা যাবে না।শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে বর্তমানের সৃত্র ধরে অতীতের কোনো বিষয় তুলে ধরা যেতে পারে।
- নীচে পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের নমুনা পাঠ্যসূচি দেওয়া হলো। প্রয়োজনে এই পাঠ্যসূচি শিক্ষক/শিক্ষিকারা
 নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সাপেক্ষে কিছুটা পরিবর্তন করতে পারেন। প্রতিটি পর্বের মধ্যে পাঠ্যবিষয় শিখন ও
 নিরবচ্ছিল্ল সার্বিক মূল্যায়নকে ধরে পর্ব বিভাজন করা হয়েছে : প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: প্রথম,
 দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়/দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়/তৃতীয়
 পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন: অন্তম ও নবম অধ্যায়/(এক্ষেত্রে পূর্বের পর্যায়ক্রমিক শিখন সামর্থ্যকে পরবর্তী
 পর্যায়ের মূল্যায়নে বিচার করতে হবে)। (বি.দ্র.: ১। প্রথম অধ্যায় থেকে পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নে কোনো
 প্রশ্ন রাখা ফাবে না। ২। সপ্তম অধ্যায়টির শিখন-শিক্ষণ দ্বিতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের মধ্যে করা যেতে
 পারে। কিন্তু ঐ অধ্যায় থেকে প্রশ্ন তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নে করতে হবে।